করুণাধারায় এসো

করুণাধারায় এসো

সাহিত্যম্ । ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশক : ১৯৫৯

প্রকাশক :
সাহিত্যম্
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক :
লোকনাথ বাইণ্ডিং অ্যাণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কাস
২৪বি, কলেজ রো
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

করুণাধারায় এসো

এতকাল পর বিজলীকে এভাবে এই পরিবেশে আবিষ্কার করব, ভাবি নি। এই পরিবেশে, অর্থাৎ ভোগবাদের এই চূড়ান্ত স্বর্গে।

সময়টা মাঘের শেষাশেষি। এরই মধ্যে আরব সাগরের নোনা জল থেকে দক্ষিণা বাতাস উঠে এসে বোম্বাই শহরে হানা দিতে শুরু করেছে। তার চলাফেরায় আর হঠাৎ হঠাৎ প্রমত্ত হয়ে ওঠায় ষষ্ঠ ঋতুর ঘোর মেশানো। শীতশেষের এই দিনটিতে ফাল্গুনের নেশা লেগেছে যেন।

দক্ষিণ বোম্বাইয়ের সেই সুবিশাল হোটেলটার তলায় লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটছিলাম।

প্রায় প্রতিদিনই আমি এখানে আসি। এখানে বলতে মেরিন ড্রাইভে। না এসে পারি না। বিকেল হলেই বিচিত্র কুহকমন্ত্রে আচ্ছন্ন করে মেরিন ড্রাইভ আমাকে টানতে থাকে। তার দুরন্ত আকর্ষণে কখন যে চলে আসি, নিজেই কি তা বুঝি!

এখানে এসে আমি শুধু হাঁটি, হাঁটি আর হাঁটি। স্বপ্নচালিতের মতো মানুষের স্রোতে শুধু ভাসতেই থাকি।

মেরিন ড্রাইভের একদিকে আরব সাগরের উদার বিস্তার। যতদূর দৃষ্টি যায়, একেবারে অবাধ দিগন্ত পর্যন্ত সমুদ্র শান্ত, গম্ভীর এবং ধ্যানস্থ হয়ে আছে। বিপরীত দিকে একই মাপের, একই উচ্চতার এবং প্রায় একই স্থাপত্যরীতির বিশাল বিশাল অগণিত বাড়ি। বাড়ি বললে ঠিক মর্যাদা দেওয়া হয় না। প্রাসাদ বলাই সঙ্গত।

একদিকে আরব সাগর, আরেক দিকে সারিবদ্ধ প্রাসাদ। মাঝখান দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার মসৃণ পথ।

সমুদ্রের প্রান্ত ছুঁয়ে পশ্চিম দিকের ফুটপাথ। এসেই আমি সেখানে চলে যাই। গিয়েই হাঁটতে শুরু করি। মেরিন ড্রাইভ পেছনে রেখে একসময় চৌপট্টির বালুকাবেলায় পৌঁছই। তারপর তারাপোরওয়ালা অ্যাকুয়েরিয়াম, উইলসন কলেজ পার হয়ে সোজা মালাবার হিলস। সেখান থেকে আবার মেরিন ড্রাইভ।

উত্তরে মালাবার হিলস, দক্ষিণে মেরিন ড্রাইভ—দুই মেরুর মাঝখানটা পায়ে পায়ে কতবার যে মেপে যাই, হিসেব থাকে না।

বিকেল হলেই নিশির ডাকে বোম্বাই শহরের এই প্রান্তে আসা আর মোহগ্রস্তের মতো অবিরত হাঁটতে থাকা, এটাই আমার প্রতিদিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এবং নিয়মেও।

নিয়ম অনুযায়ী আজও এসেছিলাম।

মেরিন ড্রাইভ থেকে মালাবার হিলস—পেন্ডুলামের দোলকের মতো বার দুই ঘুরে আসতেই দিনটা ফুরিয়ে গেল। ষষ্ঠ ঋতুর ঘোরলাগা শীতের বিকেলটাকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরব সাগরের নীল জলে রক্তের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দিনের আয়ু শেষ। লক্ষ ডানায় এখন অন্ধকার নামছে। এদিকে মেরিন ড্রাইভে, চৌপট্টিতে, মালাবার হিলসে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আলোগুলো একটি-দু'টি করে ঝলমলিয়ে উঠছে। ওভারব্রিজের গায়ে, দূরে উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় নিওনগুলো একবার জ্বলছে, পরমুহূর্তেই নিভছে। সারা রাত এই জ্বলা আর নেভার খেলা চলবে।

যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, শুধু আলোর ফোয়ারা। অর্ধবৃত্তাকার পথটা এখন আর পথ নেই, মুক্তোখচিত একখানা হার হয়ে গেছে। কাব্য করে এবং গর্ব করে বলা যায়, 'কুইনস নেকলস'।

মেরিন ড্রাইভ রাতের জাদুকরী হয়ে উঠেছে। ঠোঁটে তার অস্ফুট ফিসফিসানি, কটাক্ষে মদির সংকেত। অদৃশ্য হাতছানিতে সবাইকে ডাক দিয়েছে সে। এই শহরের যত নাগর আর নাগরী, যত বিলাসিনী আর মনোহারিণী, কেউ বাকি নেই। সকলে সে ডাকে সাড়া দিয়েছে।

দিনের বোম্বাইকে আমি চিনি। কিন্তু রাতের বোম্বাই আমার কাছে অজানা নগর। বহুবার-দেখা, বহুবার-হাঁটা, বহু-ব্যবহারে পুরনো, বিস্ময়-বর্জিত শহরটা এ সময় কেমন যেন দুর্জ্ঞেয় হয়ে যায়। তার অপার রহস্যময়তার বিন্দুমাত্রও বুঝি, সাধ্য কি।

যাই হোক, মানুষের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সেই সুবৃহৎ হোটেলটার সামনে এসে পড়েছিলাম।

অন্যমনস্কের মতো এদিকে সেদিকে তাকাতে চোখে পড়েছিল, পোর্টিকোর তলায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রথম বার মনে হয়েছিল সুরূপা পার্শি মেয়ে। মেরিন ড্রাইভে এমন রূপসী কোনো বিস্ময় নয়। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, কাশী-কাঞ্চী-মগধ, দাক্ষিণাত্য-আর্যাবর্ত—ভারতবর্ষের সব প্রান্তের মোহিনীরা ভিড় করেছে। শুধু কি ভারতীয়, ইরান-ইরাক-পারস্য, ইওরোপ-আমেরিকা—পৃথিবীর কোনো দেশই মেরিন ড্রাইভের এই মোহিনীমেলায় প্রতিনিধি পাঠাতে ভুল করেনি।

অতএব তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। এবং যথারীতি হেঁটেই যাচ্ছিলাম।

কিছুটা এগিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। স্মৃতিতে অস্পষ্ট ছায়া পড়েছে। যবনিকা তুলে অতি পরিচিত একটা মুখ চকিতের জন্য ফুটে উঠল। তবে কি—তবে কি—

আস্তে আস্তে পোর্টিকোর তলায় ফিরে এসে মেয়েটির মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যেন।

প্রথম বার দেখার মধ্যে কোনও বিশ্লেষণ বা মনোযোগ ছিল না। যেভাবে মানুষ গাছ-পাতা-ফুল-পাখি কিংবা অন্য কোনও দৃশ্য দেখে সেভাবেই দেখেছিলাম। ফলে চেতনার গভীরে সে রেখাপাত করতে পারে নি।

দ্বিতীয় বার দেখেই কিন্তু তাকে চিনতে পেরেছি। যবনিকা সরিয়ে একটু আগে যে মুখটা উঁকি দিয়েছে, এ তো সে-ই।

সমুদ্রের ধার ঘেঁষে যে ফুটপাত সেদিকে তার মুখটি ফেরানো। দূরমনস্কের মতো কী যেন দেখছিল সে। আর মাঝে মাঝেই চঞ্চল হয়ে হাতঘড়িটির দিকে তাকাচ্ছিল। খুব সম্ভব কেউ আসবে, তারই প্রতীক্ষা করছে।

মেয়েটি সুরূপা, সুদেহিনী। এবং সুমধ্যমা। ক্ষীণ কটিতটের নিচে তার শরীরের অংশটি বিশাল। কোমরের ওপর দিকে সে উদ্ধত।

কামশাস্ত্রে বিভিন্ন নায়িকার যে বর্ণনা আছে তার প্রায় সবগুলিই মেয়েটির দেহে আবিষ্কার করা যাবে।

মুখখানি তার লম্বাটে, অনেকটা ডিম্বাকৃতি। চোখ আয়ত। ভ্রূ দু'টি সরু তুলিতে টানা ধনুকের উপমা। হাত, হাতের আঙুল—সবই তার দীর্ঘ। বুক প্রতিমার মতো সুকঠিন আর গোল। মেয়েটি নিঃসংশয়ে সুস্তনী। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কুঞ্চিত নিবিড় চুল অতিরিক্ত শ্যাম্পুর ব্যবহারে ফুরফুরে এবং রুক্ষ। চিবুকের গড়নটি মনোরম। 'মরালগ্রীবা' বলে একটা শব্দ আছে। মেয়েটির গলার দিকে তাকালে তা মনে পড়ে যায়। গলাটি তার রাজহাঁসের মতো সুঠাম, নিরেখ এবং পেলব। গায়ের রংটি স্বর্ণাভ।

সুদেহিনী মেয়েটির সমস্ত বিস্ময় তার চোখে। ঘন পালকে-ঘেরা কালো চোখ দু'টির মধ্যে কী যেন এক প্রখরতা মেশানো রয়েছে। প্রখরতা, না কি অন্য কিছু ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে এটুকু বোঝা গেল, দৃষ্টি তার আশ্চর্য তীক্ষ্ণ আর দূরভেদী। এবং অস্থিরও। এত অস্থির, মনে হয়, দু'টি ছটফটে খাঁচার পাখি।

পরনে নীল রঙের স্বচ্ছ সিল্কের শাড়ি আর ওই একই রঙের ব্লাউজ। ব্লাউজটা এত ছোট মাপের যে কোমর পর্যন্ত নামে নি। কানে মুক্তোবসানো দক্ষিণী দুল, গলায় মুক্তোর চিক। ডান হাতের অনামিকায় কালো পাথরের আঙটি, বাঁ হাতের মণিবন্ধে সোনার ব্যান্ডে বাঁধা ছোট্ট ঘড়ি। পায়ে সাদা জয়পুরী চটি।

শরীরের অনেকখানিই তার উন্মুক্ত। যেটুকু নয় সেখানে অস্পষ্টতা বলতে বিশেষ কিছুই নেই। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে স্নায়ুগুলো কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে থাকে। ধমনীতে রক্তের চলাচল দ্রুততর হয়।

অনেক কাল আগে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই মাঝামাঝি সময়ে বর্ধমান জেলার সুদূর অভ্যন্তরে একটি গ্রাম্য মেয়েকে আমি জানতাম। এ তো সেই মেয়েই, সেই বিজলী।

বিজলী জেনেও সংশয়টা আমার কিছুতেই কাটছে না। কেন না বর্ধমানের সেই মেয়েটি ছিল ভীরু, কুণ্ঠিত, সঙ্কোচে জড়সড়। এক ধরনের লতা আছে ছুঁতে গেলেই যারা গুটিয়ে যায়, বিজলী ছিল তা-ই। মুখখানা সব সময় ছায়াছন্ন। অদ্ভুত এক বিষাদ আর শীতলতা দিয়ে তাকে বেষ্টন করে থাকত যেন।

মিলের কালোপাড় মোটা ধুতি পরত বিজলী। তার ওপর খদ্দরের গেরুয়া চাদর। হাতে দু'গাছি সোনার চুড়ি ভিন্ন দেহের কোথাও ধাতুর চিহ্নমাত্র ছিল না। পায়ের পাতা দু'টি, কনুই থেকে হাতের নিচের দিকের অবশিষ্ট অংশ আর মুখ— এ ছাড়া সমস্ত শরীর থাকত ভারী আচ্ছাদনের তলায় অদৃশ্য।

কে জানত, সেই মেয়েটিকে এমন সাজে, এমন রূপে মেরিন ড্রাইভের এই পটে আবিষ্কার করব! কে জানত, দেহের সবগুলি রেখাকে এমন প্রখরভাবে ফুটিয়ে বিজলী দাঁড়িয়ে থাকবে! কে জানত, বর্ধমানের সেই মেয়েটির এমন জন্মান্তর ঘটে গেছে! এ ছিল আমার সমস্ত কল্পনার বাইরে।

তা ছাড়া যে হোটেলটির তলায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোম্বাই শহরে তার ভূমিকা কী, আমার অজ্ঞাত নয়। যদিও এর ভেতরে যাদের যাতায়াত সেই ভাগ্যবানদের আমি কেউ নই এবং কোনো দিনই সেখানে প্রবেশের ছাড়পত্র পাব না, তবু জানি এই হোটেলটিতে একটি সুইমিং পুল আর বল্-রুম আছে। সেখানকার জলকেলি এবং নাচের কিংবদন্তি এই শহরের প্রতিটি নাগরিকের মুখে মুখে। পৃথিবীর এমন কোনো মত্ততা নেই যা এই হোটেলের মধ্যে সংঘটিত হয় না। ভারতবর্ষের সব দিগন্ত থেকে আনন্দসন্ধানীরা নিশিপালনের লোভে এখানে ছুটে আসে।

দীর্ঘকাল আগের যে ভীরু বিজলীকে আমি জানতাম তার সঙ্গে এই হোটেলটির প্রমত্ত সুর কখনই মিলতে পারে না।

বর্ধমানের সেই মেয়েটির কথা এখন থাক।

একদৃষ্টে, প্রায় নিষ্পলকে তার দিকে তাকিয়ে আছি। সে যে বিজলী—নির্ভুল জানা সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। হোটেল নামে চূড়ান্ত ভোগবিলাসের খাস তালুকের সামনে তাকে আবিষ্কার করেও কেমন যেন অভাবনীয় আর অবিশ্বাস্যই মনে হতে লাগল।

দু'পা এগিয়ে তাকে যে ডাকব, পারছি না। পা দু'টো পেরেক ঠুকে কেউ যেন রাস্তার সঙ্গে আটকে দিয়েছে। অতএব দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

এদিকে বিজলী আরো অস্থির হয়ে উঠেছে। বার বার তার চোখ দু'টি হাতঘড়ির ওপর গিয়ে পড়ছে। এবং পরক্ষণেই বিপরীত দিকের ফুটপাতে ফিরে যাচ্ছে। এই অস্থিরতার মধ্যে হঠাৎ তার নজর এসে পড়ল আমার ওপর। চোখ আর সরিয়ে নিতে পারল না সে। আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার। মনে হল, বহুকালের অনেকগুলো স্তর সরিয়ে কী যেন খুঁজছে।

আমার মুখে দৃষ্টি স্থির রেখে বিজলী কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল, বলতে পারব না। একসময় অগাধ বিস্ময়ে তার চোখ ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কাল বিস্মৃত হয়ে হুড়মুড় করে কাছে ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ললিতদা না!'

বিজলীও আমাকে চিনতে পেরেছে। একসঙ্গে অজস্র কথা গলায় ভিড় করে এসেছিল। কিন্তু দু'টি মাত্র শব্দ কোনোরকমে মুক্তি পেল, 'হ্যাঁ, আমিই।'

'কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম! আশ্চর্য, এমনভাবে যে আবার দেখা হবে, কোনোদিন ভাবতেই পারি নি।'

'আমিই কি পেরেছিলাম?'

কী একটু চিন্তা করে বিজলী এবার বলল, 'আচ্ছা, কত বছর পর আমাদের দেখা হল, বল তো?'

মনে মনে সময়ের মোটামুটি একটা হিসেব কষে বললাম, 'বছর এগার তো হবেই। সেই যুদ্ধের পর, মানে নাইনটিন ফরটি ফাইভে চাকরি নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে রাজস্থানে চলে গেলাম। আর এটা হল গিয়ে ফিফটি সিক্স। এর মধ্যে তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। হবেই বা কী করে? চাকরি নেবার পর আর কি আমি বাংলাদেশে ফিরতে পেরেছি? ওঃ, কত দিন হয়ে গেল!'

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল বিজলীর। ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'ভাল কথা, রাজস্থানে কিসের একটা খনিতে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ, তামার খনিতে।'

এর পর প্রশ্নের ঢল নামল। এক নিশ্বাসে বিজলী যা বলে গেল তা এইরকম। খনির সেই চাকরিটা এখনও আছে না ছেড়ে দিয়েছি? ছেড়ে দিলে কী করছি? আজকাল কোথায় থাকি? সংসার-টংসার করেছি কিনা? না এখনও জীবন পথে একলা চলো পথিক? ইত্যাদি—

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, বর্ধমানের সেই স্বল্পবাক, ভীরু মেয়েটি কি আশ্চর্য সপ্রতিভই না হয়ে উঠেছে।

যাই হোক, বিজলীর আগের প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিয়েছি। কিন্তু শেষগুলোর দিলাম না। কেননা তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহলও আমার মেটে নি। বরং যতই তাকে দেখছি, বিস্ময় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। উন্মুখ সুরে বললাম, 'আমার কথা পরে শুনো। আগে তোমার খবর বল।'

'আমার খবর—' বলেই থমকে গেল বিজলী। কী যেন ভেবে নতুন করে আবার শুরু করতে যাবে, ঠিক সেই সময় বিপরীত দিকের ফুটপাত ঘেঁষে প্রায় নিঃশব্দে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। আধুনিক ইতালিয়ান মডেলের ঝকঝকে একখানা প্রাইভেট কার। চমৎকার নীল রং গাড়িটার। তাকানোমাত্র দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যায়।

বিজলী আমার সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই। কিন্তু তার মনোযোগের অনেকখানিই ছিল রাস্তার ওপারে। সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম। গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ ঝলকে উঠল। হাত-পা-মুখ, সকল অবয়বে বিচিত্র এক চাঞ্চল্য খেলে গেল। বিব্রত, কিছুটা বা লজ্জামিশ্রিত সুরে সে বলল, 'ললিতদা, কিছু মনে করো না ভাই। এতদিন পর দেখা হল অথচ তোমার সঙ্গে যে খানিকটা গল্প করব তার উপায় নেই।'

কিছু বললাম না। বিমূঢ়ের মতো তার মুখের দিকে একবার শুধু তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলাম।

ইতিমধ্যে ও-প্রান্তের গাড়িটা থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে যে এধারে চলে এল তার বয়স জটিল এক অঙ্কের মতো। পঁয়তাল্লিশও হতে পারে, আটচল্লিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে এটুকু বলা যায় নিঃসন্দেহে যে চল্লিশোর্ধ্বে। চেহারায় আন্তর্জাতিক একটা ছাপ আছে। ফলে সে বাঙালি কি উত্তর ভারতীয় কিংবা কাশ্মিরি, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

শরীরটি বেশ ঋজু আর দীর্ঘ। অর্থাৎ ভদ্রলোক সুদেহী। এবং সুদর্শনও। গায়ের রং ফর্সা। তবে চোখ দু'টিতে কেমন একটা শিকারি ভাব রয়েছে। পরনে অক্ষরে অক্ষরে সমস্ত ব্যাকরণ মেনে বিলিতি ডিনার স্যুট।

তার দিকে চকিত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে অত্যন্ত দ্রুত আর ব্যস্তভাবে বিজলী আবার বলল, 'কাগজ-কলম সঙ্গে আছে?'

বললাম, 'আছে।'

'আমার ঠিকানাটা লিখে নাও। দাদারে পার্শি কলোনিতে আমি থাকি। —নম্বর বাড়ি। আসবে কিন্তু, প্লিজ ললিতদা। নইলে ভাবব, এখন কথা বলতে পারলাম না বলে তুমি রাগ করেছ। প্লিজ-প্লিজ, আসতেই হবে। বল, আসবে?'

ঠিকানা লিখে নিয়ে মন্ত্রাচ্ছন্নের মতো বললাম, 'যাব।'

'সকালের দিকে যেও কিন্তু। দুপুরের পর গেলে আমাকে না-ও পেতে পার।'

'সকালের দিকেই যাব।'

'হাতে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে যাবে। গিয়েই পালাই পালাই করতে পারবে না। এগার বছরের অনেক কথা জমা হয়ে রয়েছে। যেদিন যাবে সেদিন খেয়ে আসবে।'

এদিকে লোকটি কাছাকাছি এসে পড়েছিল। আমি যা অনুমান করেছিলাম তা-ই। এর জন্যই অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছিল বিজলী।

অপ্রতিভ হেসে লোকটি বিজলীর উদ্দেশে ইংরেজিতে বলল, 'রিয়ালি খুব দুঃখিত। আমার খুব দেরি হয়ে গেল। কোলাবার কাছে এমন ট্রাফিক জ্যাম হয়েছিল যে কিছুতেই গাড়িটা বার করতে পারছিলাম না। রাগ কর নি তো?'

আশ্চর্য, বিজলী প্রায় নির্ভুল উচ্চারণে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল, 'যত সব বাজে অজুহাত। ট্রাফিক জ্যাম না আর কিছু! আমাকে ভোগানোর মতলব শুধু। একটা ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি ডিনারে যাব না। না-না—' আদুরে অভিমানিনীর মতো জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে। গলায় স্বরে কপট রাগ মেশানো।

'ডোন্ট বি ক্রুয়েল বিজলী।' আমি যে তৃতীয় একটি মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেদিকে খেয়াল রইল না লোকটির। বিজলীর একটা হাত ধরে কাতর অনুনয়ের সুরে বলতে লাগল, 'এই তোমার নামে দিব্যি দিয়ে বলছি—'

আস্তে আস্তে নিজের হাতখানা মুক্ত করে বিজলী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'থাক, খুব হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর সীন করতে হবে না।' বলেই অপরূপ ভ্রূভঙ্গে লোকটিকে বিদ্ধ করল।

দেখতে দেখতে আমার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে দ্রুতবহ এক তরঙ্গ খেলে গেল যেন।

আজ কি শুধু মুহূর্তে মুহূর্তে চমকিত হবার দিন? প্রথমত, নির্ভুল ইরেজিতে অনর্গল কথা বলছে বিজলী। এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়। এগার বছর আগে বর্ধমানের যে মেয়েটিকে আমি জানতাম, হাই স্কুলে মাত্র কয়েকটি বছর তার নিয়মিত গতিবিধি ছিল। ক্লাস নাইনে উঠে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। সেই মেয়েটির পক্ষে এমন অনায়াসে ইংরেজি বলা—থাক, বর্ধমানের সেই মেয়েটির কথা যথাসময়ে।

শুধু ইংরেজি বলাই কি, লোকটির সঙ্গে যেভাবে বিজলী কথা বলছে, স্বরের সেই উত্থানপতন আর চোখের ভ্রূভঙ্গি, সব মিলিয়ে কী যেন একটা রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে অবশ্য দোষাবহ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যার সঙ্গে, অসঙ্কোচে তাকে ও-ভাবে বলা যায়। কিন্তু আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে যে নামহীন আরেকটি ইন্দ্রিয় রয়েছে সেখানে কিসের একটা ছায়া যেন পড়েছে।

এই লোকটি কে? তার সঙ্গে বিজলীর কী সম্পর্ক? প্রীতি? নিছক বন্ধুত্ব? না গভীরতর কিছু? যার নাম আমি জানি কিন্তু উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছি না। যদি সেই অনুচ্চারিত

সম্পর্কটাই তাদের মধ্যে থেকে থাকে? সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতো একটি মুখ মনে পড়ল—ধীরেশ।

আত্মগতের মতো মনে মনে বিজলীর আচরণ, কথা বলার ভঙ্গি, আর এই অভাবিত চমকপ্রদ পরিবর্তন বিশ্লেষণ করছিলাম। ধীরেশের মুখ মনে পড়তেই আমার স্নায়ুর গহন কেন্দ্রে দোলা লাগল।

ধীরেশের ভাবনাটা কিন্তু বেশিদূর এগলো না। তার আগেই বিজলী ডাকল, 'ললিতদা—'

চমকে সাড়া দিলাম, 'বল—'

'এখন যাই। সাড়ে আটটায় এই হোটেলে আমাদের ডিনার। অলরেডি ক'মিনিট লেট হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও।' ব্যস্তভাবে আমি বললাম।

বিজলীরা চলে গেল।

লক্ষ করলাম, লোকটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয় নি বিজলী। পোর্টিকো পেরিয়ে দু'জনে হোটেলের অভ্যন্তরে সবে পা দিয়েছে, সেই মুহূর্তে প্রায় আত্মবিস্মৃতের মতো ডেকে উঠলাম, 'বিজলী—' লোকটির পরিচয় আমার জানতেই হবে।

একাই ফিরে এল বিজলী, 'কী বলছ?'

'কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'কী কথা?'

মরিয়ার মতো বলে ফেললাম, 'তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকটি কে? মানে আগে আর কখনো—'

বিচিত্র একটু হাসল বিজলী। আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে চাপা ফিসফিস স্বরে বলল, 'আমার নতুন ঈশ্বর।'

বিহ্বলের মতো তার কথার প্রতিধ্বনি করলাম, 'নতুন ঈশ্বর!'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে—'

'আজ আর কোনো কথা নয়। দেখা যখন তোমার সঙ্গে হয়েছে, ধীরে ধীরে সব জানতে পারবে। আচ্ছা চলি।'

আর কিছু বলার অবকাশ পেলাম না। আমার কৌতূহল এবং বিস্ময়কে প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিয়ে বিজলী আবার ফিরে গেল। তারপর সেই লোকটির বাহুলগ্ন হয়ে মুহূর্তে হোটেলের ভেতর অদৃশ্য হল।

দুই

বিজলীরা চলে গেছে। বিশাল হোটেলটার তলায় আচ্ছন্নের মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই।

একসময় সচেতন হয়ে উঠলাম। উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় এখন নিওনের বর্ণচ্ছটা। সমস্ত রাত ওই মায়াবী, রঙিন আলোগুলো জ্বলতে থাকে। সন্ধের আগে আগে সূর্যটা যখন আরব সাগরের অথৈ অতলে ডুব দিচ্ছিল সেই সময় ভাসতে ভাসতে এসেছিলাম। আর এসেছিল গাড়ি এবং মানুষের ঢল। সেই ঢলটা চৌপট্টি আর চার্চগেটের অলিগলি বেয়ে এখন ফিরে যাচ্ছে। অর্থাৎ মেরিন ড্রাইভের উদ্দাম খরস্রোতে ভাটার টান ধরেছে।

রাত যত বাড়ছে, মেরিন ড্রাইভ ততই তার জলুস খোয়াচ্ছে। সেদিকে কিন্তু আমার লক্ষ্য নেই। এই জেল্লা-হারানো চমক-খোয়ানো জায়গাটা আমার চেতনায় একেবারেই রেখাপাত করতে পারছে না।

অন্যমনস্কের মতো হোটেলটার তলা থেকে এখন হেঁটে চলেছি। আপাতত যাব চার্চগেট স্টেশনে। সেখান থেকে সাবার্বন ট্রেন ধরব। তারপর পনের মাইল দূরে শহরতলির সেই বিবরে।

অন্যদিন মেরিন ড্রাইভ যখন প্রায় ফাঁকা হয়ে যায় তখন আমার ফেরার পালা।

আর আজ? আজ কিছুই ভাল লাগছে না। বিজলী নামে বর্ধমানের সেই মেয়েটি আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে তরঙ্গ তুলেছে। এতদিনের অভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাই ফিরে যাচ্ছি। শহরতলির ছোট্ট কুঠুরিতে বসে চুপচাপ আজ বিজলীর কথাই ভাবব।

কিন্তু শহরতলি পর্যন্ত যাবার তর সইল না। ভাবনাটা আমার পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল যেন।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্বে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম। এটা উনিশ শ' ছাপান্ন। অর্থাৎ এগার বছর। প্রায় একটা যুগ।

এক যুগ পর আজ বিজলীকে আরব সাগরের এই কূলে আবিষ্কার করেছি, তার সঙ্গে কথা বলছি, নিজের ঠিকানা দিয়ে সে আমাকে বার বার যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। অনুভব করছি সেই ঠিকানা-লেখা কাগজের টুকরোটা আমার জামার পকেটে রয়েছে। সবই ঠিক। তবু কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অর্ধসত্য একটা স্বপ্নের মধ্যে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি। ঘোর যেন কিছুতেই কাটছে না।

হাঁটতে হাঁটতে মেরিন ড্রাইভ পেছনে রেখে ডান দিকের রাস্তায় এসে পড়লাম। ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের বিশাল এলাকা আর এয়ারলাইনস হোটেল পার হয়ে অবশেষে চার্চগেট স্টেশন। টিকিট কেটে কখন যে ট্রেনে উঠেছিলাম, মনে নেই।

বোম্বাইয়ের শহরতলি-গামী ট্রেনগুলো প্রায় সমস্ত দিনই আকণ্ঠ ঠাসা। সবসময় যেন মেলা বসে থাকে সেগুলোতে। কিন্তু এই রাত্রিবেলা তার চেহারা বদলে যায়।

অন্য সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা ঝুলতে ঝুলতে যাওয়াই ললাটলিপি। কিন্তু এখন? ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। সামান্য ক'টি যাত্রী বিক্ষিপ্তভাবে কামরার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

জানালার ধারে ঘেঁষে পছন্দমতো একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে পড়লাম। আর বসবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা স্টার্ট দিল।

বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এখান থেকে আরব সাগর দেখা যায় না কিন্তু সীমাহীন, অবাধ আকাশ চোখে পড়ে। সেখানে তারাদের অতন্দ্র বাসর। মাঘের শেষাশেষি এই রাত্রিটিতে কিছু কুয়াশা জমেছে। আর সেই কুয়াশার আবরণের তলায় মহারাষ্ট্রের এই শহর যেন অবাস্তব জাদুনগরী হয়ে উঠেছে।

চার্চগেটের বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ট্রেনটা এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আমি তাকিয়েই ছিলাম। কিন্তু আকাশ, তারা বা কুয়াশা কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছি না।

এই ট্রেনটার মতো আমিও বুঝি ছুটছিলাম। সময়ের বিপরীত স্রোতে উজান ঠেলে এগার বছর আগের অনেকগুলো দিনের মধ্যে ফিরে যেতে লাগলাম।

বিজলীকে প্রথম কোথায় দেখেছিলাম? যতদূর মনে পড়ছে হুগলি নদীর কূলের সেই শহরটিতে নয়। সেই শহর যার নাম কলকাতা।

কলকাতা থেকে ট্রেনে বর্ধমান স্টেশন, সেখান থেকে সাইকেল রিকশায় দামোদর। অবশেষে গরুর গাড়িতে মাইল পনের পাড়ি দেবার পর বর্ধমান জেলার শেষ মেরুতে যে অখ্যাত, অশ্রুত গ্রামটিকে আবিষ্কার করা যাবে তার নাম শুশুরিয়া। ভূগোলের কোলাহল থেকে অনেক, অনেক দূরে এই শুরুরিয়াতেই বিজলীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্বে বাংলাদেশ ছেড়ে রাজস্থানে চলে গিয়েছিলাম। তারও দু'তিন বছর আগে—দুই গোলার্ধ জুড়ে তখন মহাযুদ্ধের রথ উন্মাদ, অন্ধ গতিতে ছুটে চলেছে। সম্ভবত সেটা উনিশ শ' বেয়াল্লিশের শেষাশেষি অথবা তেতাল্লিশের প্রথম দিক। সেই সময় বিজলীর সঙ্গে দেখা।

বিজলীর কথা পরে। তার আগে আমার কথা। আর আমার সূত্র ধরে সেই নিদারুণ সময় এবং বাংলাদেশের কিছু কিছু কথাও।

যদিও এ কাহিনী সম্পূর্ণ বিজলীরই এবং তাতে আমি নায়ক নই, উপনায়কও না—তার জীবনে প্রধান বা অপ্রধান কোনো ভূমিকাতেই আমাকে পাওয়া যাবে না, তবু আমার আর যুদ্ধকালীন সময়ের প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। কেন না আমি এবং সেই যুগটা বিজলীর জীবনে আবহ সঙ্গীতের মতো।

কলকাতা থেকে এক শ' মাইল দূরে, উত্তর-পশ্চিমের বায়ুকোণে শুশুরিয়া নামে বর্ধমানের সেই গ্রামটা ছিল আমার পূর্ব পুরুষের দেশ। উনিশ শ' বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশের আগে কদাচিৎ সেখানে গেছি। আদৌ গেছি কি না, আজ আর মনে করতে পারি না।

আমরা থাকতাম কলকাতায়। আমার বাবা তাঁর যৌবনে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন। সেটা উনিশ শ' পাঁচের মাঝামাঝি। অর্থাৎ দেশ জুড়ে তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছে। প্রথম মহাযুদ্ধ তখনও কল্পনার বাইরে।

কলকাতা শহরে বাবা এসেছিলেন জীবিকার সন্ধানে। জীবন শুরু করেছিলেন জুট মিলের সাধারণ একজন শ্রমিক হিসেবে। তাঁর নিষ্ঠা এবং সততার মধ্যে এতটুকু খাদ ছিল না। সেই সঙ্গে ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী। তা ছাড়া প্রাণটাও ছিল চাকুরিগত। অতএব দু'বছর পরই প্রোমোশন পেয়েছিলেন মেশিন ডিপার্টমেন্টে। সেখানে হাতের কাজে দক্ষ হয়ে ফিটার হয়েছিলেন। বুদ্ধি ছিল খুবই প্রখর। কাজেই ফিটার থেকে মেকানিকে পৌঁছুতে যুগ-যুগান্ত পার করতে হয় নি। তারও পর আরো কয়েকটি সিঁড়ি ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রমিককুলের শিরোমণি সুপারভাইজার হয়েছিলেন বাবা। সুপারভাইজারিই শ্রমিক জীবনের প্রায় শীর্ষবিন্দু। এর বেশি দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না।

প্রথম মহাযুদ্ধের অনেক আগে, খুব সম্ভব হেড মেকানিক হবার প্রোমোশন পেয়েই বাবা বিয়ে করেছিলেন।

কলকাতা শহরের এমন অকল্পনীয় বিস্তার তখনও ঘটে নি। ভবানীপুর পর্যন্ত এসেই শহরটা ভয়ে ভয়ে থমকে গিয়েছিল যেন। বালিগঞ্জ ছিল ধানখেত আর হোগলাবনের তলায় অদৃশ্য। টালিগঞ্জে ছিল সাপ আর বুনো শুয়োরের নিরঙ্কুশ রাজত্ব।

শহরের পরিধি তখন আর কতটুকু। হাতের মুঠোর ভেতর আমলকবৎ। শ্যামবাজার, বাগবাজার, বউবাজার, চিৎপুর এবং ডালহৌসি নিয়ে আদি কলকাতা। নতুন কলকাতা ভবানীপুরে। এই ভবানীপুরেই প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি ভাড়া করে বাবা সংসার পেতেছিলেন।

সেটা ছিল স্বর্ণযুগ। চালের মণ আড়াই টাকা, ঘি এক টাকা সের, একজোড়া মিহি ধুতি দেড় টাকা সাত সিকে। আমাদের সংসার রীতিমতো সচ্ছলই ছিল। এবং নিয়ত সুখের একটি স্রোত সবসময় সেখানে প্রবাহিত থাকত।

ধীরে ধীরে সংসার বড় হতে লাগল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই আমরা চার ভাই জন্মালাম। তিন ভাই বড়, আমি ছোট। আমাদের বোন নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই বাংলাদেশের সমাজ জীবনে তরঙ্গ উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীদের মতো যৌথ পরিবারগুলো তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মাথা তুলছে। আরেকটা লক্ষণও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ক্রমশ নাগরিক জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। কেননা কলকাতা নিজের সর্বাঙ্গে মোহিনীমায়া মেখে সারা দেশকে হাতছানি দিয়ে যাচ্ছিল।

অবশ্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই এ-দেশের নগর-যাত্রা শুরু হয়েছে। সে যাওয়া ছিল ধীরে ধীরে, মন্থর বেগে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হল। ফলে কলকাতা শহরে মানুষের ঢল নামল, ভিড় বাড়ল। ভবানীপুর পেরিয়ে নতুন কলকাতা বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

শুধু সমাজ জীবনেই না, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেও তখন ঝড় উঠেছে। ঈশান কোণে মেঘ জমেছিল উনিশ শ' পাঁচে। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে। সেই মেঘই এবার প্রলয় হয়ে ফেটে পড়ল। দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল সন্ত্রাসবাদ, ধরাপাকড়, জেল আর নির্বিচার অত্যাচার। স্বাধীনতা—এই একটি মাত্র শব্দ তখন সমস্ত দেশের জীবনমন্ত্র হয়ে গেছে।

এরও কিছুদিন পর সুদূর আফ্রিকা থেকে ক্ষীণদেহ সেই মানুষটি তাঁর স্বদেশে ফিরে এলেন। গান্ধিজি। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে আসমুদ্রহিমাচল উত্তাল হয়ে উঠল।

মোট কথা, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সব দিকেই তখন পরস্পরবিরোধী অসংখ্য স্রোত। তার আঘাতে বাংলাদেশের আত্মা কখনও অস্থির, কখনও মথিত, কখনও বা বিভ্রান্ত।

বাবা কিন্তু সময়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেন নি। দেশময় এত যে আলোড়ন সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিল। অবশ্য রাজনীতি এবং স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে যে পরিবর্তন আসছিল সেগুলো তাঁকে যুগপৎ চিন্তিত এবং বিচলিত করেছে।

অথচ নিজের দিকে চোখ ফেরালে বিচলিত হবার মতো কিছুই ছিল না। কেন না যে চাকরি তিনি করতেন তার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। এর বেশি উচ্চাশা তাঁর ছিল না। দ্বিতীয়ত, মা এবং আমরা চার ভাই সবসময় তাঁর অনুগত ছিলাম। ছোট আকাঙ্ক্ষার মাপে যে পৃথিবী তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত করেছিলেন বাবা।

অতএব কোনো দিক থেকেই অসুখী বা অতৃপ্ত হবার মতো কিছুই ছিল না তাঁর। নিজের সংসার এবং চাকরি নিয়ে যে জগৎ তার চারপাশের কক্ষে আত্মকেন্দ্রিক কোনো গ্রহের মতো ঘুরে বেড়াতে পারতেন তিনি। কিন্তু তা করেন নি।

জীবন সম্পর্কে বাবার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেটা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং দূরভেদী।

আমার তিন দাদার লেখাপড়ায় বিশেষ আগ্রহ বা মেধা ছিল না। বার দুই-তিন করে ফেল করার পর কোনোরকমে ম্যাট্রিকের গণ্ডিটা পার হয়েছিল। ম্যাট্রিক পাস করার পর বাবা আর তাদের পড়ান নি। নিজের ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

আমিও একই ঝাঁকের পাখি। সুতরাং বার দুই ফেল করে যখন ম্যাট্রিকটা সত্যিই পাস করে বসলাম, ভাবলাম এ জন্মের মতো বেঁচে গেছি। অভাবিত, আশ্চর্য ব্যাপার। বাঁচা আমার হল না। আমাকে কলেজে যেতে হল। সবার ছোট বলেই কি না জানি না, আমার প্রতি বাবার কিছুটা পক্ষপাতই বুঝি ছিল।

চাকরিতে তিনটে করে ইনক্রিমেন্ট পাবার পরই বাবা তিন দাদার বিয়ে দিয়েছিলেন। এবং বিয়ের পরই তাদের আলাদা সংসার করে দিয়েছেন। বড়দাকে বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিলেন শ্যামবাজারে, মেজদাকে আহিরীটোলার এক প্রান্তে, ছোটদাকে হাজরা রোডের কাছে।

এর ফলাফল হল বিষাদময়। মা দিনরাত কান্নাকাটি করতেন, নিয়মিত খেতেন না, রাতের পর রাত তাঁর বিনিদ্র কাটত। বাবা সান্ত্বনা দিতেন, 'কেঁদো না শোভা। যা করলাম

অনেক ভেবেচিন্তেই করলাম। যে কাল পড়েছে ছেলেরাই একদিন আলাদা হয়ে যেত
এমনি এমনি হত না, অনেক ঝগড়াঝাঁটি আর তিক্ততার পর হত। সে অশান্তির চে
অপ্রিয় কাজটা আগে ভাগেই সেরে রাখলাম। এতে আর যাই হোক সদ্ভাবটা বজায় থাকবে

মা কিন্তু বুঝতে চাইতেন না। অস্থির, অবুঝের মতো শুধু মাথা নাড়তেন। আর ফুঁপি
ফুঁপিয়ে বলতেন, 'ওগো না-না-না—'

আলাদা করে দিলেও ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি বাবা। রবিবার কি অ
ছুটিছাটার দিনে কোনো না কোনো ছেলের বাড়ি যেতেন। মা আর আমিও যেতাম।

এইভাবেই দিন কাটছিল। সময়ের স্রোতে সবাই ভেসে যাচ্ছিলাম। আর আ
ভাবছিলাম, লেখাপড়া তো আমার একদিন শেষ হবেই। তার পরেই চাকরিতে ঢুকি
সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন বাবা। রুদ্ধশ্বাসে সেই দিনটির প্রতীক্ষা করছিলাম যে
কিন্তু অতর্কিতে, প্রায় বিনা ভূমিকাতেই ছন্দপতন ঘটে গেল।

সেটা উনিশ শ' উনচল্লিশই হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও দিগন্তের ওপারে। ইউরো
তার করাল ছায়া পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু পূর্ব গোলার্ধে, বিশেষ করে এই বাংলাদে
তখনও সুপ্তিমগ্ন। নির্ভাবনায় নিরুদ্বেগে তার দিন কেটে যাচ্ছে। আর দু'তিন বছরের মধ্যে
সমস্ত পৃথিবী যে রক্তের সমুদ্র হয়ে যাবে, সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই তার নেই।

বাবা, মা এবং আমি যথারীতি ভবানীপুরের বাড়িতেই আছি। একদিন সকালবেলা ঘু
থেকে উঠতে গিয়ে বাবা খাট থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন।

মা কাছেই ছিলেন। চিৎকার করে উঠলেন, 'লালু—লালু—'

আমার ডাকনাম লালু। ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসেছিলাম। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। বাবা
ঘরে এসে আমার পায়ের তলায় পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল।

বাবা গোঙাচ্ছিলেন। ঘাড়টা একদিকে বেঁকে ভেঙে গেছে। গালের কষে ফেনা
শরীরের বাঁ দিকটা অসহ্য কাঁপুনির বেগে থরথর করছে। ডান দিকটা কিন্তু আশ্চর্য স্থি
একেবারেই স্পন্দনহীন।

সঙ্গে সঙ্গে দাদাদের খবর দিলাম। বৌদি এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে তারা ছুটে এল
তারপর ডাক্তার ডাকা হল। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর জানা গেল, বাবার প্যারালিসি
হয়েছে।

প্যারালিসিস অর্থাৎ পক্ষাঘাত। ছেলেবেলা থেকেই বাবার স্নায়বিক দুর্বলতা ছিল
প্রায়ই বাঁ দিকের হাত-পা কাঁপত। বাবা গ্রাহ্য করতেন না।

স্নায়ুঘটিত সেই রোগই যে চোরা বানের মতো অলক্ষিতে দেহের অভ্যন্তরে ছড়ি
পড়েছিল, আগে টের পাওয়া যায় নি।

চিকিৎসা শুরু হল। সঞ্চয় প্রায় কিছুই ছিল না। ওদিকে দাদাদের হাতও নিজের নিজে
সংসার চালিয়ে একেবারেই শূন্য। অতএব একমাত্র ভরসা বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড। ধা
নিয়ে নিয়ে সেটা একেবারেই নিঃস্ব করে ফেলা হল। কিন্তু তাতেও যদি কিছু সুফল হত!
দিকটা অবশ, নিস্পন্দ হয়েই রইল। আর অসাড় প্রত্যঙ্গ নিয়ে চিরকালের জন্য বিছানা
আবদ্ধ হয়ে রইলেন বাবা।

ততদিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাংলাদেশের দুয়ারে এসে কড়া নাড়তে শুরু করেছে।

কে জানত, পূর্ব সমুদ্রের ওপারে জাপান এত দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে! দুর্বার গতিতে সে টে আসছিল। দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুর ফল করল। মিত্রপক্ষের প্রতিরোধ বালির বাঁধের তো ভেসে গেল। বার্মার দিকে এবার তার থাবা প্রসারিত হয়েছে। পঙ্গপালের মতো াকে ঝাঁকে রোমারু বিমান রেঙ্গুনের ওপর হানা দিতে শুরু করেছে। অন্তরীক্ষে ড়োজাহাজ আর ভারত মহাসাগরের অতলে অগণিত সাবমেরিন হিংস্র হাঙরের মতো রে বেড়াচ্ছে। বার্মার পরেই তো ভারতবর্ষ। মেশিন গান হাতে, পায়ে হেঁটে অনায়াসেই াসাম উপত্যকায় ঢোকা যাবে।

কলকাতা আর কতদূর? আকাশপথে ছ' ঘণ্টা, জলপথে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিলে মাত্র ন চার দিনের ব্যাপার। সুতরাং হাত বাড়ালেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী।

এদিকে মিত্রপক্ষ একের পর এক ফ্রন্ট শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে সগৌরবে পশ্চাৎ াপসরণ করছে। পৃথিবীব্যাপী যে রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, এতদিনে তার রাহুগ্রাস শুরু ল বুঝি!

মিত্রপক্ষের মনোগত বাসনা ছিল ভারতবর্ষের নিরাপদ ভূমিতে দাঁড়িয়ে পূর্ব গোলার্ধের শষ লড়াইটা লড়বে। কাজেই আসাম সীমান্ত এবং কলকাতাকে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

সাত সমুদ্রের ওপার থেকে আমেরিকান আর নিগ্রো টমি এসে জব চার্নকের শহর ছেয়ে ফেলল। পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, কলকাতার সব দিগন্ত জুড়ে মিলিটারি ছাউনি পড়ল। াদের রসদ যোগাতে বাংলাদেশের ভাঁড়ারে টান পড়ে গেল। নেই নেই, কোথাও একমুষ্টি াদ্য নেই। যুদ্ধের অতল গহ্বরে প্রায় সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে। যে কয়েক দানা অবশিষ্ট াছে তাই নিয়ে রেশনিং চালু হল। মাথা পিছু সপ্তাহান্তে এক সের পাঁচ ছটাক চাল, দেড় পায়া চিনি, তিন পোয়া গম। রাতের অন্ধকারে চাল অবশ্য পাওয়া যায়, তার মণ পঞ্চাশ াকা। কাপড়ও কন্ট্রোলের আওতায় চলে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মে তা পেতে হলে এক ীবনে তা কুলোবে না। জন্মান্তরে যদি মেলে। সারা দেশ আদি পিতা আদমের যুগে ফিরে যতে শুরু করেছে। অবশ্য তিরিশ পঁয়তিরিশ টাকা দিলে চালের মতো এক জোড়া ধুতিও ন্ধকারে পাওয়া যেত।

বাংলাদেশ যে নামমন্ত্র আগে আর কখনও শোনে নি, যা ছিল অজ্ঞাত অশ্রুত, যুদ্ধের দীলতে তা শুনতে পেল। তার নাম কালোবাজার।

বাবা যে স্বর্ণযুগ দেখেছিলেন এবং আমাদের শৈশবেও যার ছিটোফোঁটা আভাস পয়েছি, তা যেন অবাস্তব কোনো রূপকথা।

এ হল এক দিক। আরেক দিকে কলকাতার পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে। প্রতি াড়ির সামনে ব্যাফল ওয়াল উঠেছে। ছাদের মাথায় বালির বস্তা স্তূপীকৃত। দিন নেই রাত নই, অতর্কিতে সাইরেন বেজে ওঠে। নিরাপদ আশ্রয়ে সবাই অদৃশ্য হয়। এ আর পি'র াকেরা রাস্তার রাস্তায় মহড়া দেয়। তার ওপর আছে ব্ল্যাক আউট। সন্ধে নামার সঙ্গে

সঙ্গে কলকাতা অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তার হৃৎস্পন্দন তখন স্তব্ধ। মনে হয়, এ যেন বিংশ শতাব্দীর কোনো শহর নয়। প্রাগৈতিহাসিক কোনো পরিত্যক্ত, মৃত নগরী।

এ-সবই বাইরের দিক। বাংলাদেশের ভেতর দিকেও তখন মন্থন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের নিজেদের দিকে চোখ ফেরালেই তা অনুভব করা যাবে।

যতদিন বাবা সক্ষম ছিলেন ততদিন কোনো প্রশ্নই ছিল না। সংসারটা অনায়াস মসৃণ গতিতে চলছিল। বাবা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসার থমকে দাঁড়াল। শুধু থমকেই না, অচল অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল।

আসল সমস্যাটা হল জীবন ধারণের। কেন না বছর খানেক ধরে বাবা বিছানায় বন্দি। কোনো দিন আর যে তিনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন না, এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। ডাক্তাররাও এ সম্বন্ধে তাদের শেষ মর্মান্তিক রায় দিয়ে গেছে। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর চাকরিটা গেছে। কোনো দিক থেকেই অর্থাগমের পথ খোলা নেই।

অতএব নিতান্ত নিরুপায় হয়ে দাদাদের ডেকে পাঠালেন মা। অবশ্য বাবা অসুস্থ হবার পর থেকে দাদারা প্রায়ই দেখাশোনা করতে আসত।

যতদূর মনে পড়ে, দাদারা সবাই অফিস ছুটির পর এক সন্ধেবেলা এসেছিল। মা তাদের নিয়ে দোতলার একটা ঘরে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'শ্যামু, টোকন, হারু—সংসারে কী হাল তোদের তো অজানা নয়। কর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ড ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে এতদিন চিকিৎসা চলেছে। তাতে অসুখও সারল না, মাঝখান থেকে জমানো পয়সা ক'টা শেষ হল। যাক গে, এখন যে জন্যে তোমাদের ডাকিয়েছি, তাই বলি। সংসার তো মুখ থুবড়ে পড়েছে। তোমরা উপযুক্ত ছেলে। যা ভাল বোঝ, কর।'

দাদারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না।

অনেক পরামর্শের পর মা, বাবা এবং আমাকে বাঁচাবার জন্য তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রথমত, ভবানীপুরের এতবড় বাড়িটার ভাড়া গোনা নিরর্থক। আমাদের এই অবস্থায় তা অপব্যয়ের পর্যায়ে পড়ে। কাজেই স্থির হল, অর্ধেকটা আমাদের রেখে বাকি অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, দাদারা আলাদা হয়ে যাবার পর মা, বাবা এবং আমাকে নিয়ে সংসারের যে অবশিষ্ট অংশটা রয়েছে এ বাজারে তা সচল রাখা দুরূহ। দাদাদের কারও একার পক্ষে নিজের সংসার চালিয়ে সে দায় নেওয়া অসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং ঠিক হল, বড়দা বাবার ভার নেবে। শ্যামবাজারের বাসা ছেড়ে দিয়ে বৌদিদের নিয়ে ভবানীপুরের এই বাড়িতে এসে থাকবে সে। মেজদা নেবে মায়ের দায়িত্ব। আর আমি পড়লাম ছোটদার ভাগে।

আমাদের সংসারের শেষ অংশটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ছোটদা হাজরা রোডের কাছাকাছি এক গলিতে থাকত। দু'খানি মাঝারি ঘর। ঘরের সংলগ্ন বারান্দাতেই রান্নার বন্দোবস্ত। বাড়িটায় অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের আরো সাত-আটটি ভাড়াটে রয়েছে। একেবারে আন্তর্জাতিক পরিবেশ। কল-জল-পায়খানা, সবই এখানে এজমালি।

আজন্মের চেনা পরিবেশ ছেড়ে ছোটদার কাছে চলে এলাম। দু'টি মেয়ে এবং সুতিকারোগী বউদিকে নিয়ে তার সংসার। যাওয়ামাত্র অনুভব করলাম, সেখানে আমি অবাঞ্ছিত।

ছোট বউদি বারান্দায় বসে ছিল। আমাকে দেখেই নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এই মুখ ঘোরানোর মধ্যেই সম্ভবত ছোটদার সংসারে আমার স্থানটি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বুকের অতলে স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম একটা তারে অতর্কিতে নিদারুণ ধাক্কা লেগেছিল। সেই আঘাতে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার একুশ বছরের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা সেই প্রথম।

আগেই বলেছি, এ কাহিনী বিজলীর। তবু আমার নিজের সম্বন্ধে এত কথা মনে পড়ছে কেন?

চার্চগেট থেকে যখন শহরতলির ট্রেন ধরেছিলাম, তখন বিজলী আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সে ছাড়া অন্য কোনোদিকে মনটাকে ফেরাতে পারি নি। সাবার্বন ট্রেনটা এখন যত ছুটছে ততই মনে হচ্ছে, এ-কাহিনী কোনো ব্যক্তির নয়। এই কাহিনী যুদ্ধকালীন সেই ভয়াবহ যুগের যার একটা দিক বিজলী দেখেছে, আরেকটা দিক দেখেছি আমি। আমার দিকের কথা না বললে এ-কাহিনী অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। অতএব অনিবার্য এবং বিস্তৃতভাবেই সে কথা এসে পড়ছে।

মাসখানেক পর লক্ষ করলাম, ছোটদা এবং ছোট বউদি আমার সঙ্গ বর্জন করেছে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ কথা বলে না।

দু'মাস পর আরো একটা ব্যাপার আবিষ্কার করলাম। কলেজে তখনও আমার নামটা ছিল। ছোটদার বাড়ি এসেও দু'চার দিন ক্লাস করেছি। তারপর কবে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম, মনে নেই। তার বদলে চালের জন্য ভোর রাত থেকে রেশনের দোকানে লাইন দিই। বউদির মেয়ে দু'টোকে আগলাই। সুতিকারোগী বউদি প্রায়ই বিছানায় পড়ে থাকে আর শাণিত নাকি সুরে চেঁচায়, 'হে ভগবান, হাঁড়ি ঠেলে ঠেলেই আমার হাড় কালি হয়ে গেল। আর পারি না, আর পারি না।'

বিছানায় পড়ে থাকাটা কতখানি রোগজনিত আর কতখানি বউদির নষ্টামি, জানতাম না। জানবার চেষ্টা না করে নিঃশব্দে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতাম। এবং উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়ে দিতাম।

মাঝে মাঝে আহিরীটোলায় মেজদার বাড়ি যেতাম। সেখানে মা থাকতেন।

ছোটদার সংসারে কিভাবে কোন ভূমিকায় আছি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মা সব জিজ্ঞেস করতেন। কিছুই গোপন করতাম না। অকপটে সব বলে যেতাম। শুনতে শুনতে মা'র চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে থাকত।

মাকে জিজ্ঞেস করতাম, 'মেজদার এখানে কেমন আছ? মেজ বউদি ভাল ব্যবহার করছে তো? না কি আমার মতোই—'

প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে যেতেন মা। নতচোখে ব্যস্তভাবে বলে উঠতেন, 'বেশ আছি বাবা, এখানে বেশ আছি।'

স্বরের উত্থান পতনের মধ্যে এমন কিছু থাকত যাতে চকিত হয়ে উঠতাম। স্থির, নিবদ্ধ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় কী যেন অনুভব করতাম। মা যে কথাগুলো বলেছেন তার কয়েক স্তর নিচে একটা অনুচ্চারিত দিক রয়েছে। নিষ্ঠুর সত্যটা বুঝি সেখানেই ছিল। মা'র না-বলা কথার অন্ধকার থেকে সেই সত্যটাকে খুঁজে পেয়ে হৃৎপিণ্ড আমার ফেটে যেত যেন। বুঝতে পারছিলাম, ছোটদার সংসারে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, মেজদার সংসারে মায়ের জন্য সেই একই জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছে।

কয়েক মাস আগেও এত কথা বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার ছিল না। তখন মা যদি বলতেন, 'বেশ আছি', তাঁর মুখের সেই কথাটাই বিশ্বাস করে ফিরে আসতাম। কিন্তু বাবা অসুস্থ হবার পর থেকেই জীবনের সমস্ত রূপটাই ইতিমধ্যে কবে যেন আমার কাছে বদলে গেছে।

ছোটদার বাড়ি থেকে ভবানীপুরে আমাদের সেই আদি বাড়ি খুব কাছেই। প্রায় রোজই সেখানে বাবাকে দেখতে যেতাম। আগেই বাঁ দিকটা অসাড় হয়ে গিয়েছিল। অবস্থার আর উন্নতি হয় নি। যত দিন যাচ্ছিল, বাঁ পাশের সেই অসাড়ত্ব ডান দিকেও সংক্রামিত হচ্ছিল।

এইভাবেই দিনগুলো কাটছিল। ছোটদার সংসারে গ্লানির অন্নে আরো কতকাল দেহ পুষ্ট করতে হত, জানি না। আচমকা কলকাতার হৃৎস্পন্দনকে স্তব্ধ করে দিয়ে খিদিরপুর আর হাতিবাগানে জাপানি বোমা পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা স্রোতের মতো এই শহরের মানুষেরা উর্ধ্বশ্বাসে বাইরের দিকে ছুটল। ইভাকুয়েশন! ইভাকুয়েশন! কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতা নামে প্রাচ্যের সর্বাধিক জীবন্ত, চঞ্চল আর দুরন্ত নগরীর ধমনী নিশ্চল হয়ে গেল।

বাইরে যাবার সেই স্রোতটা আমাদের ভাসিয়ে নেবার জন্যও হাত বাড়াল। সেই দুর্বার আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখব, সাধ্য কী।

প্রথমে পালাল বড়দা। বাবা এবং তার সংসার নিয়ে দেওঘর চলে গেল। তারপর এল মেজদার পালা।

একদিন খুব সকালে মাকে নিয়ে মেজদা ছোটদার বাসায় এল। ছোটদা বাড়িতেই ছিল।

মেজদা বলল, 'হারু, আমার বড় সম্বন্ধী মধুপুরে একটা বাড়ির ব্যবস্থা করেছে। আজই আমরা ওখানে চলে যাচ্ছি। সম্বন্ধী আমাদেরই যেতে লিখেছে। মা'র কথা কিছু লেখে নি। এ-অবস্থায় মাকে নিয়ে যাওয়াটা ভারি খারাপ দেখায়। মধুপুর গিয়ে সম্বন্ধীকে বলে সপ্তাখানেকের মধ্যেই মাকে নিয়ে যাব। এই ক'টা দিন মাকে কিন্তু তোর কাছেই রাখতে হবে। কেমন?'

অপ্রসন্ন, গম্ভীর মুখে হারু অর্থাৎ ছোটদা বলল, 'আচ্ছা।'

মেজদা সেই যে মধুপুরে চলে গেল তারপর একে একে দু'টি সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে না একটা খবর, না একটা চিঠি। দেখতে দেখতে তৃতীয় সপ্তাহটিও শেষ হল। চতুর্থ সপ্তাহে পড়েই নিশ্চিত হওয়া গেল, মেজদা কোনোদিনই মাকে নিয়ে যাবে না। তার চলে যাবার পেছনে এমন একটা জঘন্য চাতুরি আছে, কে ভেবেছিল।

এদিকে ছোটদা অস্থির হয়ে উঠেছে। তার পালাবার বন্দোবস্তও পাকা। মার্টিন রেলের সর্বশেষ নগণ্য স্টেশনটির কাছে তার শ্বশুরবাড়ি। আপাতত সেখানেই যাবে সে।

মা এবং আমার জন্য ছোটদার পালানো হয়ে উঠছে না। আমাদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ওঠায় তার নিদারুণ অনিচ্ছা।

মেজদা যাবার পর তিনটি সপ্তাহ ধৈর্য ধরে ছিল ছোটদা। চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতেই সমস্ত আবরণ খসিয়ে ধীরে ধীরে তার নিষ্ঠুর, অকৃত্রিম স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। আরম্ভ হয়েছিল অনুচ্চ চাপা গজগজানির মধ্যে, 'আমি মরে যাব, মরে যাব। এই রাবণের গুষ্ঠীর পিণ্ডি যোগাতে যোগাতে নির্ঘাৎ কেওড়াতলায় গিয়ে উঠব।' কখনও বলত, 'হে ভগবান, সব দায় কি আমারই? কী পাপ যে করেছিলাম!' কখনও বলত, 'কবে, যে এ-আপদ ঘাড় থেকে নাববে!'

ছোটদার এই অসন্তোষ এবং বিরক্তির লক্ষ্য কারা, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তূণ থেকে বাছা বাছা এক-একটি তীর তুলে আমাদের উদ্দেশে সে ছুঁড়ত। মা আর আমি শরবিদ্ধ, রক্তাক্ত অবস্থায় নিরুপায়ের মতো মুখ বুজে থাকতাম।

দু'চার দিন যেতে না যেতেই স্বরগ্রাম আর চাপা রইল না, চড়া হয়ে উঠল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল ছোটদা। ক্রমশ আরো অসহিষ্ণু, আরো উত্তেজিত, আরো বিস্ফোরক হয়ে উঠল সে। মা এবং আমি যথারীতি চোরের মতো মুখ বুজেই রইলাম।

একদিন ছোটদার উত্তেজনা শীর্ষবিন্দুতে পৌছল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সে শুরু করে দিল, 'হে ভগবান, এই বোঝা কোনোদিন নাববে না। ছেলেপুলে নিয়ে এই কলকাতাতেই আমাকে বোমা খেয়ে মরতে হবে। সব বুঝি। সকলে মিলে আমায় মেরে ফেলার মতলব করেছে।'

মা কিংবা আমি এতদিন একটা কথাও বলি নি। নিঃশব্দে সব সহ্য করে গেছি। সেদিন মা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে বাবা, ছেলেদের দোরে দোরে মাথা কুটে খুব শিক্ষাই পেলাম। আর নয়। আমাদের জন্যে তোরা মরবি কেন? বালাই ষাট, যেখানে যেতে চাস, চলে যা। আমরা আজই তোদের মুক্তি দিয়ে যাব। শুধু—'

'কী?'

'আমাদের জন্য ঢের করেছিস। এখন শেষবারের মতো দশটা টাকা ভিক্ষে চাইছি।'

ছোটদা প্রথমটা বিমূঢ় হয়েই গিয়েছিল বুঝি। এত সহজে মুক্তির সনদ পেয়ে যাবে, এ ছিল তার পক্ষে অকল্পনীয়। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল সে। এবং তৎক্ষণাৎ দশটি টাকা এনে মায়ের দিকে প্রায় ছুঁড়েই দিয়েছিল।

পাশের ঘরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। টাকা নিয়ে মা সেখানে এসে বলেছিলেন, 'জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নে। আজই, এখনই আমরা এখান থেকে চলে যাব।'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোথায় যাব?'

'দেশে।'

'শুশুরিয়ায়?'

'হ্যাঁ।'

জিনিসপত্র আর কি! মা এবং আমার সামান্য ক'খানা জামাকাপড় আর সংক্ষিপ্ত একটি বিছানা। সেগুলো বেঁধে ছেঁদে গুছিয়ে নিতে নিতে আমার সংশয় এবং ভয় বেড়েই যাচ্ছিল। শুশুরিয়ায় গিয়ে চলবে কী করে? প্রাণ-ধারণের স্থূল প্রশ্নটা স্থূলতর, স্ফীততর হয়ে আমার সমস্ত অস্তিত্বকেই বুঝি ছেয়ে ফেলছিল। মা'র দিকে তাকিয়ে আধফোটা ভীত সুরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সেখানে গিয়ে খাব কী?'

উদাসীন গলায় মা বলেছিলেন, 'দেখা যাক কী খাই। না যদি কিছু জোটে, না খেয়ে মরব।' বলতে বলতে মায়ের চোখেমুখে উত্তেজনা দেখা দিচ্ছিল। উদাসীনতার আবরণ ছিঁড়ে স্বরটা পর্দায় পর্দায় চড়ছিল, 'এভাবে লোকের দোরে দোরে লাথি খাওয়ার চাইতে না খেয়ে মরা ভাল।'

সেই দিনই, তখনই ছোটদাকে মুক্তি দিয়ে আমরা চলে গিয়েছিলাম। জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে বহির্মুখী যে স্রোতগুলো দিশ্বিদিকে ছুটছিল তারই একটায় ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত কিভাবে যে শুশুরিয়ায় পৌঁছেছিলাম, তার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক।

শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে. ট্রেনে যেতে যেতে মা আমাকে চমকপ্রদ একটা খবর দিয়েছিলেন। শুশুরিয়ায় আমাদের পূর্বপুরুষের কিছু ধান জমি আর একখানা বাড়ি আছে। ধানের জমিগুলো আছে এক ভাগ-চাষীর জিম্মায়। বাড়িটার কী অবস্থা, তা অবশ্য মা বলতে পারেন নি।

এ-সব তথ্য আমার অজানা ছিল। যখন জানলাম যুগপৎ আশ্বস্ত এবং উৎসুক হয়ে উঠলাম। আশ্বস্ত, কেন না এই খবরটার মধ্যে আমাদের বাঁচবার মতো একটা ইঙ্গিত রয়েছে। উৎসুক, কেন না বাড়িঘর জমিজমা কী অবস্থায় কীভাবে রয়েছে, আদৌ সেগুলো ফেরত পাওয়া যাবে কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই।

শুশুরিয়ায় পৌঁছে কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়তে হল। যদিও এ গ্রাম আমার পূর্বপুরুষেব জন্মভূমি, তবু আগে আর কখনও এখানে এসেছি কি না, মনে করতে পারলাম না। মা তাঁর কৈশোরে অর্থাৎ বিয়ের পর বার তিনেক মাত্র এসেছিলেন। এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে এ-গ্রামের পথঘাট কিংবা শ্বশুরবাড়ির অবস্থান, সবই তাঁর স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

রাস্তার লোকের কাছে ঠাকুরদার নাম করে করে যখন বাড়িটার সামনে এসে পড়লাম, বিকেলের আয়ু প্রায় নিঃশেষ। আতিপাতি করে খুঁজেও বর্ধমান জেলার আকাশে সূর্যকে তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে মা আর আমি প্রথমে হকচকিয়ে গেলাম। তারপর শঙ্কিত এবং বিচলিত। আত্মরক্ষার জন্য এ আমরা কোথায় এসেছি!

বাড়ি!

বাড়ি কোথায়? অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশাল এক ধ্বংসস্তূপ। সেটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন করে রয়েছে জটিল নিবিড় এক অরণ্য। এ বাড়ি যে কয়েক যুগ ধরে পরিত্যক্ত, তা অনুমান করতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না।

দু'জনে এই অবস্থায় কী করব, কিছুই যখন স্থির করতে পারছি না ঠিক সেই সময় গলাটা শুনতে পেলাম। দুর্বল, ক্ষীণ স্বরে টেনে টেনে কে যেন বলে উঠল, 'এদিকে আসুন।'

অবিশ্বাস্যই মনে হয়েছিল। এই ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে মানুষের কণ্ঠ শোনা যাবে, এ ছিল অকল্পনীয়। মা আর আমি চমকেই উঠলাম। চমকটা থিতোলে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, বাড়িটার দক্ষিণ প্রান্তের সামনের দিকটা বেশ পরিচ্ছন্ন। সেখানে জঙ্গল নেই। ও-ধারের শেষ ঘর দু'খানিও বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

সেখানে বারান্দার ওপর শীর্ণ চেহারার এক বৃদ্ধ বসে ছিলেন। ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। একটি মেয়ে তাঁর পিঠে কী যেন মেখে দিচ্ছিল। খুব সম্ভব মালিশ জাতীয় কোনো ওষুধ। মেয়েটির মুখ অন্য দিকে ফেরানো। তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

চোখাচোখি হতেই বৃদ্ধ হাত নেড়ে ইশারা করলেন। সজ্ঞানে নয়, নিজেদের অজ্ঞাতসারে বুঝিবা মন্ত্রচালিতের মতোই পায়ে পায়ে মা আর আমি ওঁদের কাছে চলে এলাম।

দূর থেকে লোকটিকে বৃদ্ধ মনে হয়েছিল। কাছে এসে অনুমান করলাম তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে, কিন্তু ষাটের অনেক নিচে। রীতি অনুযায়ী তাঁকে প্রৌঢ় বলাই সঙ্গত। কিন্তু দুরারোগ্য কোনো অসুখ তাঁর মধ্যে সম্ভবত স্থায়ী বাসা বেঁধেছে এবং শরীরের সব সার চুষে নিয়ে ছিবড়েটুকু ফেলে রেখেছে। ফলে রুগ্‌ণ দেহের সব ক'টি হাড় প্রকট, চোখ কোটরে প্রবিষ্ট, হাতে-পায়ে-বুকে মেদের লেশমাত্র নেই। প্রত্যেক বার শ্বাস ফেলতে এবং শ্বাস টানতে হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যাচ্ছে তাঁর।

প্রৌঢ়টি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা?'

বিস্ময়ের ঘোর ইতিমধ্যে অনেকখানিই কাটিয়ে উঠেছিলেন মা। আস্তে আস্তে আমাদের পরিচয় দিলেন।

প্রৌঢ়র চোখদু'টো চকচক করে উঠল। আমার বাবার নাম করে বললেন, 'ও, আপনি ভুবনের স্ত্রী! এটি আপনার ছোট ছেলে! আসুন—আসুন—' বলতে বলতেই পেছন ফিরলেন। সেই মেয়েটির উদ্দেশে বললেন, 'এঁদের বসতে দে।'

মেয়েটি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘর থেকে একখানা পাটি বার করে এনে বারান্দায় বিছিয়ে দিল। আমরা বসলাম। মেয়েটি প্রৌঢ়ের ও-পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রৌঢ় এবার বললেন, 'একটা বড় আপসোস ছিল, ভুবনের বউকে দেখব। বিয়েতে অবিশ্যি নেমন্তন্ন করেছিল সে। যেতে পারি নি। ভবানীপুরে ওর বাসার ঠিকানা জানতাম। গিয়ে দেখে আসা হাজার বার উচিত ছিল। যাব যাব করে কত বছর কেটে গেল। যাওয়া আর হয়ে উঠল না। যাক, এতদিনে আপনাকে না দেখার খেদটা ঘুচল।' একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন, 'হঠাৎ এতকাল পর ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন যে? আপনারা তো দেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেন না। তা এলেনই যখন, ভুবনকে সঙ্গে আনলেন না কেন? সে এখন কোথায়? কেমন আছে?'

দাদাদের মনোভাব, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক—সংসারের তিক্ত অংশগুলি বাদ দিয়ে সংক্ষেপে মা সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। অবশেষে ঝাপসা গলায় বাবার প্রসঙ্গে এলেন, 'কী করে উনি আসবেন বলুন।'

'কেন?'

'বছর দুই ধরে উনি বিছানায় পড়ে আছেন। ডান দিকে পক্ষাঘাত হয়েছে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'উনি পড়েছেন আমার বড় ছেলের ভাগে।'

'মানে—' বিমূঢ়ের মতো প্রৌঢ়টি মায়ের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

আর মা কেমন যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। আমাদের পারিবারিক ইতিহাস, যা একটু আগে গোপন করে রেখেছিলেন, হঠাৎ বলে ফেললেন। আজই, এইমাত্র প্রৌঢ়টিকে আমরা দেখছি কিন্তু তাঁর পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। একজন অপরিচিতের কাছে নিজের সংসারের কথা এমন অকপটে উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত কি অনুচিত সে সম্বন্ধে মায়ের কিছুমাত্র খেয়াল রইল না।

শুধু কি পারিবারিক ইতিহাসই, বাবা শয্যাশায়ী হবার পর ছেলেরা রাতারাতি কীভাবে বদলে গেল, তাদের সংসারে কী অসহনীয় গ্লানি আর অপমানের মধ্যে দিন কেটেছে, সে-কথাও লুকিয়ে রাখলেন না মা।

চিরদিনই জানি মা আমার শান্ত, সহিষ্ণু আর অতিরিক্ত চাপা স্বভাবের। শেষের দিকে ছোটদার বাড়িতে সামান্য উত্তেজিত হওয়া ছাড়া কোনোদিন কোনো বিষয়ে তাঁকে অভিযোগ করতে দেখিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে একজন অচেনা প্রৌঢ়ের কাছে প্রাণের সবটুকু ক্ষোভ আর তিক্ততা মেলে ধরতে দেখে প্রায় বিস্মিতই হয়ে গেলাম। বহুদিনের চাপা দুঃখ সম্ভবত নিজের অজান্তে এমনভাবেই কখনও কখনও সময়ের সমস্ত বাধা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সব শুনে প্রৌঢ়ের মুখেচোখে বিষণ্ণ একটা ছায়া নেমে এল। আচ্ছন্ন, ব্যথিত সুরে বললেন, 'আপনাদের সংসারের এই অবস্থা, ভুবনের অসুখ—কই আগে তো শুনিনি। অবিশ্যি আমিও অসুস্থ। যুদ্ধের আগে থেকেই একরকম বিছানায় পড়ে আছি। অনেক দিন কারও কোনো খোঁজখবর নিতে পারি না।' বলতে বলতে রুগ্‌ণ বুকটাকে মথিত করে দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তাঁর।

অস্ফুট গলায় ফিস ফিস করে মা কী উত্তর দিলেন, বোঝা গেল না।

কী ভেবে প্রৌঢ় এবার বলেছিলেন, 'তা হলে ছোট ছেলেকে নিয়ে এখন থেকে এখানেই থাকবেন তো?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন মা, 'সবই তো বললাম। এখানে না থেকে উপায় কী? দেশের এই বাড়িখানা আর কিছু জমিজমা, ঠিক কী আছে জানি না—যা-ই থাক, সেটুকু ভরসা করেই এসেছি।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

একসময় মা-ই আবার স্তব্ধতা ভেঙেছিলেন। প্রৌঢ়ের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠতাই আছে। আপনি—' বাক্যটি অসম্পূর্ণ রেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি।

উত্তর দিতে গিয়ে প্রৌঢ় হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, 'আমার কথা পরে শুনবেন। অনেক দূর থেকে আসছেন। কথায় কথায় আমার একেবারে খেয়ালই ছিল না। স্নান টান সেরে সুস্থ হন। আমরা ব্রাহ্মণ। যদি আপত্তি না থাকে চাট্টি ভাত চাপিয়ে দিতে বলি?'

সেই সকালবেলা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম। সারা দিনের ক্লান্তি তো ছিলই। তার ওপর খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড। লক্ষ করেছিলাম প্রৌঢ়ের প্রস্তাবে মা কিছু বলেন নি। নতমুখে নিঃশব্দে বসে ছিলেন।

মায়ের নীরবতা যে সম্মতি, তা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি প্রৌঢ়র। সেই মেয়েটি তাঁর বাঁ পাশে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে ফিরে প্রৌঢ় বলেছিলেন, 'যা তো মা, এঁদের স্নানের ব্যবস্থা করে দে। সেই সঙ্গে রান্নাটাও চাপিয়ে দিস।'

মেয়েটি মুখে কিছু বলে নি। শুধু মাথা হেলিয়ে চলে গিয়েছিল।

স্নান সেরে খাওয়ার পালা চুকিয়ে চারজনে আবার বারান্দায় এসে বসেছিলাম। আমাদের সঙ্গেই প্রৌঢ় আর সেই মেয়েটি খেয়ে নিয়েছিল।

সেদিন কী তিথি ছিল, মনে নেই। খুব সম্ভব শুক্লপক্ষই চলছিল। সন্ধের পর চাঁদের আলোর ঢল নেমেছিল যেন। আর অজস্র জ্যোৎস্নায় বর্ধমান জেলার দূর প্রান্তের সেই অখ্যাত নগণ্য গ্রামটা ভেসে যাচ্ছিল।

যতদূর মনে পড়ে, একটু ইতস্তত করে মা নতুন পর্যায়ে আবার আলাপ শুরু করেছিলেন, 'এবার কিন্তু আপনার কথা শুনব।'

'বেশ শুনুন।' প্রৌঢ় ঈষৎ হেসেছিলেন। হাসতে হাসতেই টান উঠেছিল। প্রাণপণে সেটা সামলে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমার নাম অনাদি মুখুজ্জে। ভুবন আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এক স্কুল থেকে এক বছরেই আমরা ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম।'

'আপনি, আপনিই অনাদিবাবু!' মায়ের চোখদু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই কী যেন ভেবে সংশয়ের সুরে বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি যেন শুনেছিলাম আপনাদের বাড়ি পাশের কোন একটা গ্রামে—'

'ঠিকই শুনেছিলেন।'

'তা হলে এখানে, আমাদের এই বাড়িতে—' বক্তব্য শেষ না করে মা হঠাৎ থমকে গেছেন। তাঁর অসম্পূর্ণ কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল।

প্রৌঢ় অর্থাৎ অনাদিবাবু ইঙ্গিতটা বুঝেছিলেন। বলেছেন, 'আপনাদের বাড়িতে আমরা নেহাতই উড়ো পাখি।'

'মানে?' মায়ের চোখেমুখে যুগপৎ বিস্ময় এবং কৌতূহল।

অনাদিবাবু এরপর যা বলেছেন, সংক্ষেপে এইরকম।

এই শুশুরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে যে গ্রামখানি, তার নাম নোরপুর। নোরপুর তাঁর পূর্বপুরুষের দেশ—জন্মভূমি। সেখানে এম. ই স্কুলে মাস্টারি করতেন অনাদিবাবু।

নোরপুরের ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই আজন্ম কাটিয়ে দিয়েছেন। নিজের গ্রামের সীমানা পেরিয়ে কদাচিৎ বাইরে পা রেখেছেন।

সংসারটি ছিল নিতান্তই ছোট মাপের। নিজে, স্ত্রী এবং একটা ভাইঝি। বছর কয়েক আগে স্ত্রী মারা গেছেন। ভাইঝি ছাড়া রক্তের সম্পর্কে আপন বলতে আর কেউ নেই।

অনুমান করেছিলাম, এখানে পৌঁছে যে মেয়েটিকে অনাদিবাবুর পিঠে মালিশ করতে দেখেছি, যে আমাদের স্নান-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং এখন নিঃশব্দে অনাদিবাবুর পাশে বসে আছে সে-ই তাঁর ভাইঝি।

নোরপুরে পৈতৃক সূত্রে একখানা একতলা বাড়ি পেয়েছিলেন অনাদিবাবু। বাড়িটা অবশ্য বহুকালের প্রাচীন। ফলে জরাগ্রস্ত।

উচ্চাশা খুব একটা ছিল না। পুরনো ভাঙা বাড়ি, ভাইঝি এবং এম. ই স্কুলের মাস্টারি—এই নিয়েই পরিতৃপ্ত ছিলেন অনাদিবাবু। জীবনটা খুব সচ্ছলভাবে না হলেও ভালোই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তেই তাল কাটল।

অসুস্থ হয়েছেন পাঁচ ছ' বছর। সঞ্চয় প্রায় কিছুই ছিল না। এই বছর ক'টা কীভাবে যে চলেছে, শুধু তিনিই জানেন। আর এখনকার দিনগুলো কীভাবে কাটছে, তা ভাবতে সাহস হয় না অনাদিবাবুর।

যা-ই ঘটুক, যত অভাবই হোক, এতকাল নোরপুরে পৈতৃক বাড়িতে থাকার সান্ত্বনাটুকু অন্তত ছিল। কিন্তু গত বর্ষায় একটানা দিন দশেক এমন বৃষ্টি হয়েছে যার ধাক্কা সামলাতে পারেনি বাড়িটা। ভিতে নোনা ধরেছিল অনেক আগেই। সেই নিদারুণ বর্ষায় জীর্ণ একতলাটা দুর্বল কাঠামো নিয়ে হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

আর যা-ই হোক, ধ্বংসস্তূপে বাস করা চলে না। অতএব নতুন একটা আশ্রয় চাই। দু'দিন এর বাড়ি, দশ দিন ওর বাড়ি, এমন করে ভাসতে ভাসতে অবশেষে শুশুরিয়ায় আমাদের বাড়িতে এসেছেন অনাদিবাবুরা।

আমাদের বাড়িটা দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত। চার দিক থেকে হাজারটা হাত বার করে অরণ্য তার টুঁটি চেপে ধরেছিল। কোনোরকমে দু'খানা ঘর পরিষ্কার করিয়ে মাস ছয়েকের মতো এখানে আছেন অনাদিবাবুরা।

সংক্ষেপে নিজেদের ইতিহাস শেষ করে অনাদিবাবু বলেছিলেন, 'শরীরের যা অবস্থা, কখন আছি কখন নেই। নিজে মরব, সেজন্যে তো দুঃখ নেই। কিন্তু বিজলীর জন্যে মরতে সাহস পাই না। আমি মরলে কে যে ওকে দেখবে!'

এতক্ষণে জেনেছিলাম সেই মেয়েটি অর্থাৎ অনাদিবাবুর ভাইঝির নাম বিজলী।

থেমে থেমে অনাদিবাবু বলে গিয়েছিলেন, 'মেয়েটা বড় দুঃখী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ওর মা মরল। বাপ মরল পাঁচ বছর বয়েসে। সেই থেকে আমার কাছেই আছে। নিজের ভাইঝি বলে বলছি না, ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে। হাই স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েও ছিল। আরেকটা বছর পড়তে পারলে ম্যাট্রিকটা পাস করে যেত। কিন্তু তা ওর কপালে নেই।'

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন?'

'কেন আর। একটু বেশি বয়েসে পড়াশোনা আরম্ভ করেছিল। ক্লাস নাইনে যখন উঠল তখন বেশ বড়সড়ই হয়ে উঠেছে। বোঝেনই তো, এ কলকাতা শহর নয়। নেহাতই গ্রাম দেশ। জগৎটা বড় ছোট এখানে। চারপাশে গুঞ্জন উঠল, আমি কাকা বলেই নাকি খরচের ভয়ে ওর বিয়ে দিচ্ছি না। বাপ হলে এতদিনে মেয়েটা তরে যেত। লোকনিন্দার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি আমার নেই। তাই পড়া ছাড়িয়ে ওর বিয়ে দিলাম। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট—'

কথাটা শেষ করতে পারেন নি অনাদিবাবু। তার আগেই ও-পাশ থেকে অস্ফুট, মৃদু গলায় বিজলী বলে উঠেছিল, 'আঃ কাকু—'

বিজলীর স্বরে এমন একটা অনুচ্চারিত নিষেধ ছিল যাতে থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন অনাদিবাবু। বিব্রত সুরে বলেছিলেন, 'থাক, থাক—এখন ওসব কথা থাক।'

আমি চকিত হয়ে উঠেছিলাম। অনাদিবাবুর ডান পাশে বিজলী নতচোখে বসে ছিল। আমার দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্ঘাতিক চমক লেগেছিল।

বিকেলে শুশুরিয়া পৌঁছবার পর অনেকবার বিজলীকে দেখেছি। কিন্তু সে দেখার পেছনে মনোযোগ বা বিশ্লেষণ ছিল না। এই মুহূর্তে তাকে যেন প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম।

পরনে কালো-পাড় ধুতি আর সাদা ব্লাউজ। হাতাদু'টো এত দীর্ঘ যে কনুই পর্যন্ত নেমে এসেছে। সর্বাঙ্গ প্রায় ঢাকা। মুখখানি, কনুই থেকে হাতের অবশিষ্টাংশ আর পায়ের পাতা—এ ছাড়া দেহের কোনো অংশই উন্মুক্ত নেই। গলায় কানে বা হাতে, কোথাও ধাতুর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

বিজলীর পোশাক এবং নিরাভরণ দেহটি ঘিরে অদ্ভুত এক বৈরাগ্য যেন বেষ্টন করে ছিল। বয়স কত মেয়েটির? আঠার কি উনিশের মধ্যেই। এরই ভেতর বিবাগী সেজেছে সে। বুঝিবা পার্থিব সমস্ত কিছু সম্বন্ধেই নিস্পৃহ, সম্পূর্ণ উদাসীন।

প্রথমটা লক্ষ করিনি। তারপরেই হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, বিজলী খুবই রূপসী। আর তার রূপ শান্ত, স্তিমিত ধরনের নয়। কেমন যেন উত্তেজক। নাক-মুখ-চোখ-ঠোঁট-হাতের আঙুল এবং শরীরের দীপ্ত বর্ণ, যেটুকু দেখেছি তাতেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছিল, নিজের অভ্যন্তরে অনেকখানি বিস্ফোরক লুকিয়ে রেখে মেয়েটা যোগিনী সেজেছে। মনে হচ্ছিল, এই বৈরাগ্য তার ছদ্মবেশ মাত্র, আর এর ভেতর আত্মগোপন করে আছে সে। যে কোনো মুহূর্তে বাইরের কপট আবরণটা ছিঁড়ে তার ভেতরের দুর্জ্ঞেয় অন্য একটা চেহারা বেরিয়ে পড়বে যেন।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম। অনাদিবাবু বলেছিলেন, বিজলীর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তার সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্নমাত্র নেই। তবে কি মেয়েটা বিধবা? প্রশ্নটা নিজের মনেই কিছুক্ষণ আবর্তিত হয়েছিল। আর যাই হোক, এ প্রশ্ন কারওকে করা যায় না।

মনে আছে, বিজলী প্রসঙ্গে সেদিন আর কোনো কথা হয় নি। অনাদিবাবু শুধু করুণ সুরে বলেছিলেন, 'এতকাল পর আপনারা নিজেদের বাড়ি ফিরে এসেছেন। এ খুব আনন্দের কথা। তবে আমাদের একটা ভিক্ষে আছে।'

'কী?' মা উন্মুখ হয়েছিলেন।

'আমাদের চলে যেতে বলবেন না। কোথাও যাবার জায়গা আমাদের নেই।'

মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, 'ছি ছি, যেতে বলব কেন? আপনি আমার স্বামীর বাল্যবন্ধু তার ওপর অসুস্থ। না না, কোথাও আপনাদের যেতে হবে না। আপনারা যেমন আছে তেমনই থাকবেন।'

জঙ্গলাকীর্ণ বাড়িটার দু'খানা ঘর পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন অনাদিবাবুরা। ব্যবস্থ হয়েছিল, আপাতত একখানা ঘর নিয়ে তাঁরা থাকবেন। বাকিটা আমাদের ছেড়ে দেবেন।

আশ্রয় সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা কেটেছিল। কিন্তু প্রাণ ধারণের ব্যবস্থা কী হবে? খাব কী? সেই দুরূহ সমস্যাটার মোটামুটি একটা সমাধান পরের দিনই হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের পূর্বপুরুষের কয়েক বিঘে ধানজমি স্থানীয় একজন চাষীর জিম্মায় ছিল। সে কথা মায়ের মুখে আগেই শুনেছিলাম। খুঁজে খুঁজে তাকে বার করলাম। নাম তার গোকুল দাস। গোকুল বয়স্ক, প্রবীণ লোক। মানুষ হিসেবে প্রত্যাশার অতিরিক্ত সৎ। আমাদের পরিচয় পেয়ে এবং তার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য শুনে সসম্ভ্রমে বলে উঠেছিল, 'কী সুভাগ্যি আপনারা এতকাল পর দেশের বাড়ি এলেন! তা মিছে কইব না, আপনাদের ঢের নুন খেইচি। আপনাদের সাড়ে সাত বিঘে চাষের জমিন কতকাল ধরে আমার কাছে রয়েচে তবে এট্টা কথা—'

রুদ্ধশ্বাসে মা বলেছিলেন, 'কী?'

'য্যাত বচ্ছর জমিন আমার কাছে রয়েচে ত্যাত বচ্ছরের ফসল যদি হিসেব করে চান সোজা কথা কইচি, দিতে পারব না।' নিজের পেট দেখিয়ে গোকুল বলেছিল, 'সব এই গভ্ভে দিয়ে বসে আছি। আর হাতেও জমা কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আপনাদের ঠকাবো না জমিন ফেরত লিতে যদি চান দিয়ে দেব। সেই সন্‌গে পনের বিশ মণ ধানও দেব।'

'জমি নিয়ে কী করব, বল। আমরা কি চাষবাসের কিছু জানি?'

'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। জমিন ফেরত লিয়ে কী করবেন। তার চাইতে য্যামন আছে জমিনটা আমার কাছে ত্যামনই থাক। এক শ'টা টাকা লেন। আর য্যাদ্দিন এখেনে রইবেন দেড় মণ চাল আর তিরিশটা করে টাকা মাসে মাসে দোব। এর বেশি কিন্তুন দিতে পারব না। কি, রাজি?'

এ ছিল আমাদের পক্ষে আশাতীত। অনেকখানি সংশয় নিয়ে গোকুলের কাছে এসেছিলাম। আশঙ্কা ছিল, জমির কথা সে অস্বীকার করে বসবে। কিন্তু এই নিদারুণ শঠতার যুগে গোকুলের সততা আমাদের প্রায় অভিভূত করে ফেলেছিল। কৃতজ্ঞ সুরে মা শুধু বলেছিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, রাজি।'

খাদ্য এবং আশ্রয়, জীবনের স্থূল দু'টি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। হয়েছে একান্ত অনায়াসে, প্রায় মসৃণভাবেই।

জীবন ধারণের জন্য অতএব কোনো দুর্ভাবনা নেই। দু'বেলা অনায়াসের অন্ন মুখে তুলতে তুলতে ভাবতাম এখানে সময় কাটাব কী নিয়ে? এই গ্রামের এমন কিছু আকর্ষণ নেই যা মহানগর থেকে পালিয়ে-আসা একটি যুবককে বিস্মিত, মুগ্ধ বা চমৎকৃত করতে,

পারে। এই শুশুরিয়ায় যেদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু মাঠ, মাঠ আর মাঠ। ফাঁকে ফাঁকে ইতস্তত খড়ের চালা। জায়গাটা বিরাট। তুলনায় মানুষ বড় কম।

যুদ্ধের কল্যাণে লোকজন যদিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তবু মনে হত শুশুরিয়ার মাঠ-প্রান্তর জুড়ে অবাধ, অপার শূন্যতা। কলকাতার ভিড়ের জগতের মানুষ বলেই বুঝি আমার এ-কথা মনে হত।

কে এক মনীষী বলেছিলেন, 'সুযোগ পেলেই প্রকৃতির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িও, আত্মানুসন্ধান হবে।' নিজেকে খোঁজার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এত সুযোগ পেয়েও তাই সুবিশাল আকাশের নিচে দূরবিসারী মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে ভাল লাগত না। তা ছাড়া সেই সব প্রকৃতিপ্রেমী, যারা পাহাড়ে-প্রান্তরে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায় আমি সে দলের নই। অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুতে আমি নিখাদ নাগরিক। কদাচিৎ হাট-বাজারের জন্য আমি বাড়ি থেকে বার হতাম। নতুবা সমস্ত দিনই পূর্বপুরুষের ভাঙাচোরা বাড়িটার মধ্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে থাকতাম।

সেই বাড়িটার মধ্যে এমন কী-ই বা আকর্ষণ ছিল যা নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়! সত্যিই কি কিছু নেই? সেখানে আমি ছাড়া আরো তিনজন ছিল। মা, অনাদিবাবু এবং বিজলী। অবশ্য মা আমার আজন্মের পরিচিত। তাঁর এমন কোনো দিক নেই যা আমার অজ্ঞাত। অনাদিবাবু রোগ, নৈরাশ্য আর পাহাড়-প্রমাণ দুর্ভাবনা নিয়ে পড়ে থাকতেন। তাঁর কাছে বেশিক্ষণ বসলে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যেত না। ভুগে ভুগে রোগ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে চাইতেন না। রোগচর্চা তাঁর অভ্যাস এবং বিলাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই বলতেন, 'বুঝলে বাবা, হাঁপানির টান আর পেটে আলসার তো ছিলই। মাসখানেক ধরে দেখছি, বাতেও ধরেছে আমাকে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় হাত-পায়ের গাঁটগুলো শুলোতে থাকে, ফুলে ওঠে। কার লেখায় যেন পড়েছিলাম, দেহ নাকি মন্দির। মন্দির ঠিকই, তবে রোগের মন্দির। ব্যাধি মন্দিরম্। তোমার আমার—সবার চারপাশে কোটি কোটি জীবাণু কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ডিসেন্ট্রি, থাইসিস, কলেরা, সমস্ত রোগের জার্ম মহানন্দে নাচছে, লাফাচ্ছে। সুযোগ একবার পেলেই হয়, একেবারে ঘাড়ে চেপে বসবে।' জীবাণুরা কীভাবে আক্রমণ করবে, নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি করে দেখিয়ে দিতেন।

কোনোদিন বা বলতেন, 'পঞ্চান্ন বছর বয়েস হল। কী করলাম? কী পেলাম? কিচ্ছু না। একেবারে টুঁটু। শেষ বয়েসে পরের বাড়িতে হাঁটু ভেঙে দ হয়ে আছি। এখানেই ফট করে একদিন প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে পালাবে। জানো বাবা, ছেলেবেলায় যখন জি. টি স্কুলে পড়তাম থার্ড পণ্ডিত মশায় একটা কথা প্রায়ই বলতেন, 'জগতে এসেছিস। ক'দিনের জন্যেই বা এখানে থাকা। যে ক'টা দিনই থাকিস একটা দাগ রেখে যাবি। যেন মরার পরেও লোকে নামটা মনে রাখে।' পণ্ডিত মশায়ের কথাটা ভারি ভাল লেগেছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দাগ আর রেখে যেতে পারলাম কই? শ্যাল-কুকুরের মতো জন্মালাম। আবার শ্যাল-কুকুরের মতোই পট করে একদিন ভবলীলা সাঙ্গ হবে। কেউ টেরও পাবে না।'

অধিকাংশ দিনই অনাদিবাবু বিজলীর প্রসঙ্গ তুলতেন। চিন্তাগ্রস্তের মতো বলতে 'আমার তো এই হাল দেখছ। মরে গেলে মেয়েটার কী গতি যে হবে! এই কাঁচা বয়ে আর ওই রূপ! রুগ্ণ হই, বিছানায় পড়ে থাকি, তবু তো ওকে আগলে আগলে রেখেছি ভাবি, যেদিন থাকব না—' বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসত।

অনাদিবাবু আমার পিতৃবন্ধু। তা ছাড়া একই ছাদের তলায় পাশাপাশি ঘরে থাকতাম সম্বোধনের সুবিধের জন্য তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকতাম।

লক্ষ করে দেখেছি, তাঁর চেতনা এবং অবচেতনার সকল দিককে গ্রাস করে রেখেছে তিনটি দুর্ভাবনা। তাঁর রোগ, জীবন সম্পর্কে তাঁর নিদারুণ নৈরাশ্য আর বিজলী। অবশ বিজলীকে নিয়েই তাঁর সর্বাধিক চিন্তা। বলতাম, 'অত ভাবেন কেন কাকাবাবু? অসুস্থ মানু আপনি। দুশ্চিন্তা আপনার পক্ষে ভাল নয়। মরেই যে যাবেন, এমন কথা কে বললে? ত ছাড়া সত্যিই যদি তেমন কিছু ঘটে, হাজার চিন্তা করেও তো কিছু করতে পারবেন না ভগবান আছেন, যা হোক একটা উপায় হয়ে যাবেই।'

সজ্ঞানে আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী নই। আজন্মের সংস্কার বশেই 'ভগবান' শব্দটা উচ্চার করেছি। যখন দুরূহ সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে পাই না, ভগবানের নাম আপন থেকেই মুখে এসে যায় বোধ হয়।

কিন্তু কে জানত, যার নামটা নিতান্ত সংস্কারের বশে উচ্চারণ করেছি, বিজলীর জীবে সেই ঈশ্বরের গুরুত্ব এত! কে জানত, মেয়েটার ভেতর আর বাইরের সমস্ত দিকে ঈশ্বরে সিংহাসন পাতা!

অনাদিবাবু অবাক সুরে বলতেন, 'কী আশ্চর্য, বিজলীও যে ওই কথাই বলে। একেবারে ভয়-ভাবনা নেই মেয়েটার। পরম নিশ্চিন্তে আছে সে। বলে, 'আমি ভেবে মরতে যাই কেন? আমার ভাবনা ভগবান ভাববে।' ভগবানের ওপর বিজলীর অগাধ আস্থা। জানে বাবা, এই গ্রামের পশ্চিম দিকে একটা মঠ আছে। রোজ বিজলী সেখানে যায়। আমার কী মনে হয় জানো, আমি মরলে ও মঠেই চলে যাবে।'

শুনতে শুনতে যত না বিস্মিত হয়েছি, তার বহুগুণ হয়েছি স্তম্ভিত। একটা আঠার উনিশ বছরের তরুণী জীবনকে আদৌ ভোগ না করে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে, ভাবতেই যেন কেমন লেগেছে। আমার অভিজ্ঞতায় এ একেবারে অভিনব। বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা মনে পড়েছে আমার। নিজের অজ্ঞাতসারে বলে ফেলেছি, 'আচ্ছা কাকাবাবু, প্রথম যেদিন আমরা এখানে আসি, বলেছিলেন, বিজলীর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু—' বলতে বলতে থমকে গিয়েছিলাম। আমার থমকানোর মধ্যে অনুচ্চারিত একটা প্রশ্ন ছিল।

প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছিলেন অনাদিবাবু। মুহূর্তে তাঁর মুখটা করুণ, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। চোখ নামিয়ে ঝাপসা গলায় বলেছিলেন, 'বিয়ে ওর দিয়েছিলাম ঠিকই। তবে সইল না। জন্মে থেকেই মেয়েটা দুঃখী। বাপ খেয়েছে, মা খেয়েছে। ভেবেছিলাম বিয়ের কল্যাণে বুঝি কপাল ফিরবে। একটু সুখের মুখ দেখবে মেয়েটা। কিন্তু দু'মাস পরই শ্বশুরবাড়ি থেকে চিরকালের মতো ফিরে এল।'

রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেন?'

বিচিত্র একটু হেসেছিলেন অনাদিবাবু, 'কেন আর, স্বামীর ঘর করা ওর পক্ষে সম্ভব হল না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী হয়েছিল, জানি না। যতবার জিজ্ঞেস করেছি, বিজলী বলেছে, 'জানতে চেও না। কষ্ট পাবে।' আরে বাপু, জানতে না পেরেও যে বুকের মধ্যে কী অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে, সেটা বুঝল না মেয়েটা। নিজে ওর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যে খবর নেব, অসুস্থ শরীরের জন্যে পারি নি। তা ছাড়া বিজলীই যেতে দেয় নি। যাক গে, শ্বশুরবাড়ি থেকে শেষ বারের মতো ফিরে এসে বিজলী কী করল জানো? যত রঙিন শাড়ি আর ব্লাউজ ছিল, পুড়িয়ে ফেলল। শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে থান কাপড় পরে যোগিনী সাজল। তারপর মঠে যাতায়াত শুরু করল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বলেছিলাম, 'এ-সব কী হচ্ছে!' অদ্ভুত হাসল মেয়েটা। বলল, 'দুঃখ পেও না কাকু, একটা কথা বলি। বুকে পিঠে করে বাপ-মা'র মতো মানুষ করেছ। তুমি আমার বাপ-মা'র মতোই শুধু। কিন্তু বাপ-মা নও। বাপ-মায়ের স্বাদ এ-জীবনে জানলাম না। সে যে কী কষ্ট! ভেবেছিলাম, বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে সব বঞ্চনা ভুলব। হায় রে দুরাশা! যে-মেয়ের জীবনে বাপ-মা'র স্পর্শ নেই, স্বামীর আশ্রয় নেই, তার আছে কী? আত্মহত্যা তো করতে পারব না। তাই ভাবছি, ঈশ্বরের কাছেই আশ্রয় নেব।' অনেক বুঝিয়েছিলাম কিন্তু মেয়েটা শুনল না। নিজে যা স্থির করেছে তা-ই করল।'

যত শুনছিলাম ততই যেন ভেসে যাচ্ছিলাম। বিজলী নামে সেই মেয়েটা দুর্বার স্রোতে ক্রমাগত তার দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল যেন।

এরপর আমার সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়েছিল বিজলীর ওপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার প্রত্যহের চলাফেরা, ওঠাবসা, কথা বলার ভঙ্গি—খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু লক্ষ করতে লাগলাম। এ-সবের মধ্যেই তার প্রাণের দুয়ার খোলার চাবিকাঠিটি লুকোনো ছিল। সেটি আবিষ্কার করা আমার সর্বক্ষণের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন।

মেয়েটি স্বল্পভাষিণী। সর্বক্ষণই প্রায় মুখ বুজে থাকত। নিতান্ত প্রশ্ন না করলে যেচে কোনো কথা বলত না।

দেখেছি, খুব ভোরে, প্রায় রাত থাকতেই উঠে পড়ত সে। বাড়ির পেছন দিকে বাগানের ঘন ছায়ায় প্রকাণ্ড একখানা পুকুর। উঠেই সেখান থেকে স্নান করে আসত। তারপর বারান্দার একধারে বসে খুব নিবিষ্ট হয়ে কী যেন পড়ত। বইটা যে কী, প্রথম প্রথম জানতে পারি নি। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, 'গীতা'। সূর্য ওঠার আগেই গীতাপাঠ সেরে অনাদিবাবুর ঘুম ভাঙাত বিজলী। তাঁর বুকে-পিঠে মালিশ লাগিয়ে মুখ ধুইয়ে দুধ খাইয়ে সোজা মঠে চলে যেত। ফিরে আসত দুপুরের আগেই। এসেই রান্নাবান্না সেরে ফেলত। রান্না আর কী! নিরামিষ একটা তরকারি আর ভাত। কোনোদিন বা একটু ডাল। তবে বেশির ভাগ দিনই ভাতের সঙ্গে আলু বেগুন সেদ্ধ করে নিত। প্রায় হবিষ্যান্নই বলা চলে। মাছ-মাংসের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক ছিল না ওদের। অসুস্থতার জন্য স্নান নিষেধ অনাদিবাবুর। অতএব তাঁর গা মুছিয়ে, মাথা ধুইয়ে, খাইয়ে এবং নিজে খেয়ে আবার মঠে

চলে যেত বিজলী। এবার ফিরত সন্ধের পর। ফিরে আবার রান্না, আবার অনাদিবাবুকে খাওয়ানো। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, অধিকাংশ রাত্রেই কিছু খেত না বিজলী। একেবারে নির্জলা উপোস করত।

একই পরিবেশে, জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্যে থাকতাম। স্বাভাবিক নিয়মেই বিজলীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। প্রথম প্রথম তাকে 'আপনি' বলতাম। সে-ও 'আপনি' বলত।

ধীরে ধীরে অপরিচয়ের দূরত্ব যত ঘুচতে লাগল, 'তুমি' শুরু করলাম। নাম ধরেই ডাকতাম বিজলীকে। সে-ও 'আপনি' ছাড়ল। তবে নাম ধরে আমাকে ডাকত না। দাদা বলত, ললিতদা।

তার সম্বন্ধে প্রথম দিন থেকেই উৎসুক ছিলাম। পরিচয়টা যত নিবিড় হচ্ছিল, বিজলী সম্পর্কে ততই আমার আগ্রহ বাড়ছিল। মেয়েটা স্বল্পবাক। কাজেই উপযাচক হয়ে আমাকেই এগিয়ে যেতে হয়েছিল। প্রায়ই তার জীবন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতাম। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিত সে, কোনোটার বেলায় নীরব থাকত।

একদিন তাকে বলেছিলাম, 'তোমায় একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?'

'মনে করার মতো কিছু বলবে না তো?' তীক্ষ্ণ, খরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল বিজলী।

থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম, মানে এই আর কি—'

কী একটু ভেবে স্বাভাবিক সুরে বিজলী বলেছিল, 'আচ্ছা বল। নির্ভয়ে বল।'

অভয় পেয়েও কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলাম। তারপর বলেছিলাম, 'কাকাবাবুর কাছে তোমার বিয়ের কথা শুনেছি। বেশিদিন নাকি শ্বশুরবাড়ি থাকোনি। আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে তোমার কী নিয়ে গোলমাল হয়েছিল, সেটা জানতে চাই না। শুধু একটা অনুরোধ করব।

'কী?'

'কোনো মতেই কি মিটিয়ে নেওয়া যায় না?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়নি বিজলী। মুখটা প্রথমে কঠিন হয়ে পরক্ষণেই উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। চোখের তারা দু'টো নিষ্পলক এবং ভাবলেশবর্জিত। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে সে। মৃদু, অস্ফুট সুরে বলেছে, 'সেদিকে কোনো পথই খোলা নেই

বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করেছি, 'তা হলে কী করবে? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কী?'

'কেন, কাকুর কাছে শোননি?'

'শুনেছি, তবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি। বিশ্বাস ঠিক না, বরং বলতে পার ভরসা ভরসা করতে পারিনি।'

'কেন?'

'তোমার কত আর বয়েস! এখনই মঠে যাওয়া-আসা করছ, সন্ন্যাসিনী সাজছ, তাতে—'

বিচিত্র হেসেছে বিজলী, 'দেখ ললিতদা, আমার মতো মেয়ের সামনে দু'টো রাস্তা খোলা রয়েছে! এক, অতল পাঁকে ডুবে যাওয়া। নয়তো কোনো মঠে বা আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। দুইয়ের মাঝখানে অন্য কিছু নেই। নরকে হারিয়ে যাওয়ার চাইতে মঠে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছি।' একটু ভেবে গভীর সুরে আবার বলেছে, 'ঈশ্বর ছাড়া বাঁচবার আমার আর কোনো উপায় নেই। পৃথিবীতে একটাই মাত্র বন্ধন আমার আছে। সে ওই কাকু। ওটুকুর পাট চুকলেই আমার মুক্তি। সন্ন্যাসিনী আমাকে হতেই হবে।'

বয়সের তুলনায় বিজলীর কথাগুলোর ওজন অনেক বেশি। প্রায় পাকামির পর্যায়েই পড়ে।

একটু আগে বিজলীকে বলেছিলাম, তার সঙ্গে তার স্বামীর বিরোধ কোথায়, সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করব না। কিন্তু পরে সে-কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আত্মবিস্মৃত এক ঘোরের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য কৌতূহলে জিজ্ঞেস করেছি, 'আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে কী এমন হয়েছিল যাতে মঠে যাওয়া ছাড়া তোমার কোনোদিকে কোনো পথ খোলা থাকতে পারে না?'

উদাসীন সুরে বিজলী বলেছে, 'কী হবে সে-কথা জেনে? না, লাভ নেই।' ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছে সে।

'পৃথিবীর সব জানা কি লাভ-লোকসানের হিসেবের মধ্যে পড়ে বিজলী? কিছু জানা আছে, যেগুলো সেই হিসেবটার বাইরে থাকে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'যা তুমি জানতে চাও, আমি যে তা ভুলে থাকতে চাই ললিতদা। জীবনের সেই অংশটার দিকে আমি পিঠ ফিরিয়ে রেখেছি।'

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছি, 'কেন?'

আমার 'কেন'র জবাবটা সেদিন পাই নি। তবে পরে বিজলীর সেই অজ্ঞাত জীবনের দুয়ার ধীরে ধীরে আমার কাছে খুলে গেছে। সেই দুয়ারটা যত খুলেছে ততই স্তম্ভিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছি।

বিজলীর সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সেই সুশান্ত ছিল উন্মাদ। প্রায় সর্বক্ষণই একটা ঘরে তাকে লোহার শেকলে বেঁধে রাখা হত। জামাকাপড় পরত না সে; দিলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলত। উলঙ্গ সুশান্ত দিনরাত হি হি করে হাসত, অশ্লীল গালাগাল দিত, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করত আর ভাঙা ভাঙা নখ দিয়ে দেওয়াল আঁচড়াত। আরেকটা লক্ষণ ছিল, মেয়েমানুষ দেখলে চিৎকার করত, শেকল ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে চাইত।

আশ্চর্য! এই সুশান্তই মাঝে মাঝে স্বাভাবিক হয়ে যেত। তখন আর দশটা ভদ্রলোকের মতোই সে শান্ত এবং নিরুপদ্রব। কিন্তু সেটা আর ক'দিন? দু-একটা সপ্তাহ মাত্র। তারপরেই আবার সে তার উন্মত্ততার পরিধিতে ফিরে যেত।

সুশান্তর বাবার বিরাট গালার ব্যবসা, কলকাতায় ছ-সাত খানা বাড়ি। ব্যাঙ্কে জমার খাতায় টাকার অঙ্কগুলো ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠছিল। ছেলের রোগমুক্তির জন্য অঢেল টাকা খরচ করেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি।

অবশেষে বিদেশি এক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছিলেন, স্ত্রীলোকের শারীরিক সংস্পর্শে যেতে পারলে সুশান্তর মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা সেরে যেতে পারে।

অতএব সুশান্তর বাবা শেষ চেষ্টা করেছিলেন। দেহ নিয়ে যাদের বিকিকিনি প্রথম প্রথম বাজারের সেই মেয়েমানুষদের চড়া দামে কিনে এনে সুশান্তের ঘরে ছুঁড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলিত উন্মত্ত সুশান্তকে দেখামাত্র তারা ভেতরে তো ঢোকেই নি, আতঙ্কে পালিয়ে গেছে।

অবশ্য সব সময় উন্মাদ থাকত না সুশান্ত। মাঝে মাঝে সুস্থ, প্রকৃতিস্থও হয়ে যেত। সে সময় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অপরিসীম সঙ্কোচ ছাড়া তার প্রাণে আর কোনো অনুভূতিই থাকত না। লজ্জায় কুণ্ঠায় তাদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারত না সে।

সহজলভ্যরা যখন দুর্লভ হয়ে গেল সেই সময় সুশান্তর বাবা স্থির করেছিলেন, ছেলের বিয়ে দেবেন। বিজলীর সঙ্গে সুশান্তর বিয়ে তিনি দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন কৌশলে। প্রথমত ছেলে যে উন্মাদ, সে কথা গোপন করে গেছেন। দ্বিতীয়ত, বিয়ের সময় সুশান্তর পাগলামি ছিল না। সেই সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন তিনি।

সুশান্তরা থাকত কলকাতায়। বর্ধমানের দূর প্রান্তে তার বাবা কিভাবে বিজলীর খবর পেয়েছিলেন, সে তথ্য অনাবশ্যক। স্বয়ং একদিন অনাদিবাবুর কাছে এসে বিজলীকে দেখে সেদিনই আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। দু'দিন পর বিয়ের তারিখও ঠিক করেছিলেন। এবং এটাও জানিয়েছিলেন, শুধুমাত্র শাঁখা-সিঁদুর ছাড়া আর কিছু নেবেন না। দান আর যৌতুক নিয়ে ছেলে বিক্রি করা নাকি তাঁদের বংশের রীতিবিরুদ্ধ। কথাগুলোর মধ্যে কতখানি ছলনা আর ধূর্ততা মিশে ছিল, সেদিন বোঝার উপায় ছিল না।

সঙ্গে করে সুশান্তকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সে-ও একটা চতুর দাবার চাল। কেন না অনাদিবাবু যদি ছেলে দেখতে চান তা হলে দু'চার দিন দেরিও হয়ে যেতে পারে। তার মধ্যে সুশান্ত যদি আবার উন্মাদ হয়ে যায়? অতএব কৌশলে ছেলেকেও তিনি দেখিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় সুশান্ত স্বাভাবিক মানুষ। তা ছাড়া এমনিতে সে সুদর্শন। তার দিকে তাকিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই ছিল না।

উপযাচক হয়ে এত বড় ধনী ব্যবসায়ী তাঁর একমাত্র ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তাঁর অমায়িকত্বে, উদারতায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন অনাদিবাবু। বুদ্ধিটা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে কোনো কিছু খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

বিয়ের পর মাত্র দু'টো দিন ভাল ছিল সুশান্ত। তারপরেই যথারীতি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। শেকলে বাঁধা হয়েছিল তাকে। জামাকাপড় ছিঁড়ে হি-হি হাসতে শুরু করেছিল সে। সেই সঙ্গে ছিল দেওয়াল আঁচড়ানো আর গালাগাল।

দেখেশুনে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিজলীর। অপরিসীম ভয়ে শাশুড়ির কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার ছেলে এমন হল কেন?'

শাশুড়ি উত্তর দেন নি। শুধু তাকে টানতে টানতে সুশান্তর ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছিলেন।

সুশান্ত তখন পশু। বিবেকহীন, বিচারহীন, ভয়ঙ্কর, প্রবল পশু। শাশুড়ি ঘরে ঠেলে দেওয়া মাত্র দু'হাতে প্রচণ্ড শক্তিতে বিজলীকে জাপটে ধরেছিল সে। ঘরের জানালাগুলো ছিল হাট করে খোলা। সময়টা ছিল সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থমকানো। সেই প্রকাশ্য দিবালোকে শুরু হয়েছিল নরকলীলা।

মাত্র দু'টো মাস শ্বশুরবাড়ি ছিল বিজলী। দিন নেই, রাত্রি নেই, প্রায় সর্বক্ষণই সুশান্তর ঘরে তাকে আবদ্ধ থাকতে হত। পাছে সে পালিয়ে যায়, তাই দরজার বাইরে শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, কেউ না কেউ পাহারায় থাকত। শুধু স্নানের সময় একবার আর খাবার জন্য বার তিনেক তাকে বার করা হত। সে-সময় শ্বশুর থাকতেন কাছে। আর থাকত দু'টো হিন্দুস্থানী চাকর। কোনোক্রমে বেরিয়ে এলেই আবার সেই মৃত্যুর গুহায় বিজলীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

এসব খবর চিঠি লিখে অনাদিবাবুকে যে জানাবে তার উপায় ছিল না। অতগুলো লোকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে চিঠি সে লিখবেই বা কখন, আর ডাকেই বা দেবে কীভাবে?

দু'টো মাস। মাস নয়, দু'টো বছর। নাকি দু'টো যুগ কিংবা শতাব্দী। দু'টো মাসের প্রতিটি মুহূর্ত শারীরিক এবং মানসিক মৃত্যুকে তিলে তিলে অনুভব করেছে বিজলী। এতকাল পরও সেই উৎপীড়নের কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠেছিল সে।

তার দেহমনের সমস্ত স্নায়ু ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, সেই কারাগার থেকে কোনোদিনই মুক্তি নেই। এইভাবে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ মৃত্যুর আস্বাদ নিতে নিতে তার আয়ু নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এই যখন অবস্থা, সেই সময় একদিন পাহারাটা কিঞ্চিৎ শিথিল ছিল। স্নান করতে যখন তাকে বার করা হয়েছিল, শাশুড়ি ছাড়া আর কেউ ছিল না। হঠাৎ যেন কী হয়ে গিয়েছিল বিজলীর, বাথরুম পর্যন্ত না গিয়ে অন্ধের মতো মরিয়া হয়ে সদরের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল সে। বাতের রোগী শাশুড়ি চিৎকার করতে করতে পেছন পেছন এসেছিলেন। তার একটা হাতও ধরে ফেলেছিলেন। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে সে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তারপর কলকাতার জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে কীভাবে সে হাওড়া এসেছিল এবং কীভাবে বর্ধমান পৌঁছেছিল, সে কথা মনে নেই বিজলীর।

নিজের জীবনের সেই গ্লানিকর অধ্যায়টার ওপর থেকে যবনিকা তুলতে তুলতে উত্তেজিত, অস্থির সুরে বিজলী বলেছিল, 'শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে আসবার পর দেখলাম, কাকুর শরীর খুব খারাপ। স্কুলের চাকরিটা গেছে। জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি, এমন কিছুই আমাদের ছিল না যার ওপর ভরসা করতে পারি। আমাদের বাঁচবার জন্য দু'টো মাত্র পথ

তখন খোলা ছিল। এক আমার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো। নতুবা মঠে যাওয়া। মঠে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছি। শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই নয়, কাকুর যা অবস্থা দেখেছি তাতে বেশিদিন সে বাঁচবে বলে মনে হয়নি। কাকু মরলে আমায় কে দেখবে? প্রাণের চাইতে যা বড়, আমার সেই সম্ভ্রম কে রক্ষা করবে? অনেক ভেবে আমি সন্ন্যাসিনী হওয়াই স্থির করেছি। মঠ, মঠ—মঠ ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই ললিতদা।'

অভিভূতের মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'শ্বশুরবাড়িতে তুমি কীভাবে ছিলে, কাকাকে বলেছ?'

'না।'

'কেন?'

'শুধু শুধু রুগ্‌ণ মানুষটাকে সে কথা বলে আর দুঃখ দেওয়া কেন?'

'আচ্ছা—'

'বল—'

'তুমি চলে আসার পর সুশান্তর বাবা তোমার খোঁজ নেয় নি?'

'কোন মুখে নেবে? এখানে এলে তার অবস্থা কী করতাম, নিজেই ভেবে দেখ না।'

এরপর আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

মঠ, মঠ আর মঠ। মঠই বিজলীর একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সান্ত্বনা। ওই একটি শব্দের মধ্যেই তার জীবনের চাবিকাঠিটি লুকনো ছিল।

বুঝি সন্ন্যাসই ছিল তার জীবনের নিয়তি-নির্দিষ্ট পথ। সেদিকে যাবার জন্য সকল রকমে প্রস্তুত হচ্ছিল বিজলী।

তার ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে কতখানি গভীরতা ছিল, জানি না। তবে এটুকু বুঝেছি, নিরুপায়তা ছিল। সমস্ত জীবন সে বঞ্চিত। বাপ-মা থেকে শুরু করে স্বামী পর্যন্ত, কারওকে দিয়েই সে সুখী নয়। এদিকে অসুস্থ জরাজীর্ণ কাকা ছাড়া আর কেউ নেই তার, এবং এই কাকা ভদ্রলোক পৃথিবীতে কতদিন টিকে থাকবেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দুরূহ। মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তিনি যুঝছেন। যুঝবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে।

অনাদিবাবুর মতো একটা ভঙ্গুর, অনিশ্চিত আশ্রয়কে ভরসা করা যায় না। অতএব নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছে বিজলী। যত ভেবেছে, একটু একটু করে ততই ঈশ্বরের দিকে সরে গেছে। ঈশ্বর ছাড়া জীবনের সব দিকের সব পথই তার কাছে রুদ্ধ।

অনাদিবাবুর মৃত্যুর পর বিজলী সন্ন্যাসিনী হবে, এ একরকম নিশ্চিতই ছিল। নিজের জীবনে তার ভূমিকাও করে রেখেছিল সে।

কিন্তু নিতান্ত অভাবিতভাবে সমস্ত পরিকল্পনা তছনছ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মঠে আর যাওয়া হল না তার।

যতদূর মনে আছে, একদিন বিজলী আমাকে বলেছিল, 'একটা উপকার করবে ললিতদা?'

আগেই লক্ষ করেছি, যেচে কোনো কথা বলত না মেয়েটা। তবে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দিত। সেদিন নিজের থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে কথা বলতে দেখে প্রায় অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। সবিস্ময়ে বলেছিলাম, 'উপকার!'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। একা-একা যেতে কেমন যেন লাগছে।'

'কোথায় যেতে হবে?'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিল বিজলী। তাদের মঠটা সাধারণত নানা লোকের দান আর মুষ্টিভিক্ষের ওপর চলে। অবশ্য হস্তশিল্পের একটা বিভাগও আছে। ডালা-কুলো-পাটি বুনে আর সুতো কেটেও কিছু আয় হয়। সেই আয়ের ওপর মঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীর জীবন নির্ভরশীল। বিজলীর নামেও মঠ থেকে কিছু বরাদ্দ আছে। তাই দিয়ে তার এবং অনাদিবাবুর প্রাণধারণ চলে।

লোকের কাছ থেকে যত দান সংগ্রহ করা যাবে, আর্থিক সচ্ছলতা ততই বাড়বে। জীবনরক্ষার প্রশ্ন যখন আছে তখন এই স্থূল বৈষয়িক দিকটা উপেক্ষণীয় নয়।

মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বিজলীর ওপর একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। সেটা এই রকম।

যুদ্ধের কল্যাণে বর্ধমানের দূর প্রান্তের অখ্যাত শুশুরিয়ায় লোক বেড়ে গেছে। যারা কোনোদিন পূর্বপুরুষের গ্রাম দেখে নি, জাপানি বোমার ভয়ে অকস্মাৎ তাদের দেশপ্রীতি উথলে উঠেছে।

এই নবাগতদের মধ্যে শিশির বাসুও ছিলেন। ভদ্রলোক কলকাতার মস্ত চাকুরে। মাসের শেষে বিরাট অঙ্কে মাইনে পান। অলঙ্কার দিয়ে বলা যায়, আড়াই হাজারি মনসবদার। তা ছাড়া নানা ছদ্মবেশে ঘুষের ব্যবস্থাও আছে।

শিশির বাসুর দিব্যদৃষ্টি ছিল। কেননা রেঙ্গুনে যেদিন প্রথম বোমা পড়ল সেদিনই প্রপিতামহের দেশ শুশুরিয়ার কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় সিট রিজার্ভ করে সপরিবারে শুশুরিয়ায় চলে আসেন তিনি।

প্রায় একশ' বছর আগে শিশির বাসুর প্রপিতামহ এই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। প্রায় আশি নব্বই বছর পর চতুর্থ পুরুষের এখানে পদার্পণ ঘটল।

এ-সব ইতিহাস আমার জানবার কথা নয়। বিজলীর মুখেই শুনেছি। তার ওপর ভার পড়েছে, এ-হেন শিশির বাসুর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কিছু দান আদায় করার।

একা-একা শিশির বাসুর কাছে যেতে সাহস হচ্ছিল না বিজলীর। তাই আমাকে তার সঙ্গী হতে অনুরোধ করেছে।

সব শুনে বলেছিলাম, 'বেশ তো, যাব।'

পরের দিনই বিজলী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।

শুশুরিয়ার যে-দিকে আমরা থাকি তার বিপরীত প্রান্তে শিশির বাসুদের বাড়ি। বাড়িটি একতলা হলেও বিশাল। প্রায় বিঘে দেড়েক এলাকা জুড়ে তার বিস্তার। সামনের দিকে প্রকাণ্ড বাগান, শানবাঁধানো বিরাট পুকুর। পুকুরের একপাশে ভাঙা একটা দোলমঞ্চও চোখে পড়েছিল।

দেখেই অনুমান করা গিয়েছিল, বাড়িটা বহুকাল পরিত্যক্ত ছিল। খুব সম্প্রতি সারানো হয়েছে।

বাড়ি পর্যন্ত যেতে হয় নি। পুকুর পাড়ে, বাগানের ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যেই শিশির বাসুকে পাওয়া গিয়েছিল।

সময়টা ছিল সকাল।

বাগানে, ডালপালাওলা ঝাড়ালো একটা আমগাছের তলায় পরিচ্ছন্ন ঘাসের জমির ওপর একটি বেতের টেবিল পাতা। সেটা ঘিরে ক'টি বেতের চেয়ার চমৎকারভাবে সাজানো। সেখানে চায়ের আসর বসেছিল।

দু'টি কিশোরী—মেমসাহেবদের অনুকরণে চুল যুগপৎ শ্যাম্পু এবং বব্ করা, পরনে স্কার্ট আর ব্লাউজ—বসে ছিল। তাদের এক পাশে একজন প্রৌঢ়া। মেয়েদু'টির মতো তাঁর চুলও বব্ করা। পরনে স্বচ্ছ সিল্ক আর দুঃসাহসী একটা ব্লাউজ যার হাতা কাঁধ পর্যন্ত গিয়ে থমকে গেছে। আর ঝুলটা বুকের নিম্নাংশের অন্ধকার পর্যন্ত গেছে কি যায় নি। হাত-কাটা মুক্তোদর সেই ব্লাউজটার দিকে তাকালে স্তম্ভিত হতে হয়। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশক সে-সময় সবেমাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে। গ্রামগুলি তখনও সংস্কারাচ্ছন্ন। সেগুলোর ধমনীতে ধমনীতে রক্ষণশীলতার শীতল রক্ত তখনও প্রবাহিত। সেই যুগে শুশুরিয়ার মতো গ্রামে ভদ্রমহিলা অসহনীয় রকমের আধুনিকা।

প্রৌঢ়ার ডান দিকে সাতাশ আটাশ বছরের সুদর্শন একটি তরুণ বসে ছিল। চুল ব্যাক-ব্রাশ করা, পরনে আমেরিকান-সুলভ ফুল প্যান্ট আর বুশ শার্ট।

তরুণ ছেলেটির বাঁ দিকে যিনি ছিলেন তিনিই যে চায়ের আসরের মধ্যমণি, তথা শিশির বাসু তা না বলে দিলেও চলে। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। ভদ্রলোক পাক্কা সাহেব। ঢোলা পা-জামার ওপর সিল্কের স্লিপিং গাউন চাপানো। পায়ে রবার ফোমের চটি, মুখে লম্বা বর্মী চুরুট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চওড়া কপাল সাফল্যের প্রতীক যেন।

চায়ের এই আসরেই পরিবারটার রুচি, মানসিক গঠন এবং জীবনদর্শনের কিছুটা ছাপ ছিল।

আমাদের দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন শিশির বাসু। ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমরা এই গ্রামেরই বাসিন্দা শুনে কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করেছিলেন তিনি। তারপর একটা চাকরকে ডেকে দু'খানা চেয়ার আনিয়ে বসতে বলেছিলেন। নির্দেশমতো বিজলী এবং আমি নিঃশব্দে বসে পড়েছিলাম।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কেটে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে আমাদের বক্তব্য প্রায় গুছিয়ে নিয়েছি। বলতে যাব, তার আগেই আচমকা শিশির বাসু প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিস্ফোরণ শুশুরিয়ার বিরুদ্ধে। এই গ্রামটা যে ভদ্রলোকের বাসযোগ্য নয়, এখানে সোসাইটি নেই, কথা বলার মতো একটা লোক নেই, সিনেমা নেই, বার নেই, রাস্তাগুলো মোটোরেবল নয়, এমন কি পায়ে হাঁটার পক্ষেও অযোগ্য—এই কথাগুলো সবিস্তার উদাহরণসহ আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিলেন।

প্রথমটা আমরা প্রায় বিমূঢ়ই হয়ে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক বুঝিবা আমাদের দু'জনকে এই গ্রামের প্রতিনিধি ধরে নিয়েছেন। তাই শুশুরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর পুঞ্জীভূত যত অভিযোগ প্রথম দর্শনেই উগরে দিয়েছিলেন।

ঝুলির ভেতর থেকে সমস্ত বিরাগ আর আক্রোশ বার করে অবশেষে আমাদের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন শিশির বাসু। চুরুটের আগুন নিভে গিয়েছিল। সেটি ধরিয়ে যথাস্থানে স্থাপিত করে বলেছিলেন, 'তারপর আমাদের কাছে কী মনে করে?'

বিজলী আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে একটা ইঙ্গিত ছিল। সেটা বুঝেছিলাম। অর্থাৎ তার আসার উদ্দেশ্য আমাকেই বুঝিয়ে বলতে হবে। সংক্ষেপে সবিনয়ে বলেও ছিলাম।

সব শুনে শিশির বাসুর মোটা রোমশ ভ্রূ দু'টো প্রসারিত হয়েই পরমুহূর্তে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। পুরু লেন্সের পেছনে অতিরিক্ত উজ্জ্বল চোখদু'টিতে কী যে ফুটে উঠেছিল, বিদ্রূপ অথবা শ্লেষ, সেই মুহূর্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ঠোঁটের ফাঁক থেকে চুরুটটা বার করে ছাই ঝেড়েছিলেন শিশির বাসু। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী—আই সী! এ পেয়ার অব ব্লাডসাকারস— বেগারস। ভিক্ষে চাইতে এসেছ?'

তাঁর বলার ভঙ্গিতে এবং উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের মধ্যে স্পষ্ট, নগ্ন একটা তাচ্ছিল্য আর আক্রমণের ভাব মিশ্রিত ছিল।

লক্ষ করেছিলাম, বিজলীর মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। হাই স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে সে। কাজেই শিশির বাসু যে ইংরেজি শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন সেগুলো তার জানাশোনার সীমার মধ্যেই পড়ে।

যদিও মঠে কোনোদিন যাই নি এবং সেখানকার আমি কেউ নই, নিতান্তই সহচর হিসেবে এখানে এসেছি, তথাপি শিশির বাসুর অপমানের কিছু কিছু হলকা আমার গায়েও এসে যেন লাগছিল। কিছু একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলাম। গলায় স্বর ফোটে নি।

অনেকটা সময় অসহনীয় এক স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গিয়েছিল।

হঠাৎ আমার নজর পড়েছিল সেই তরুণটির দিকে। বিজলীর প্রায় মুখোমুখি বসে ছিল সে। দেখেছিলাম, কেমন যেন আচ্ছন্ন, নিষ্পলক দৃষ্টিতে বিজলীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও তার তাকিয়ে থাকাটা সেই মুহূর্তে আমার চোখে পড়েছিল তবু মনে হয়েছে, আমাদের আসার পর থেকেই তার দৃষ্টি বিজলীর ওপর নিবদ্ধ। সজ্ঞানে না হলেও অবচেতনে তা টের পেয়েছিলাম।

শিশির বাসুই একসময় স্তব্ধতা ভেঙেছিলেন, 'অল রাইট, কিছু আমি দেব। তবে আজ নয়, কাল বিকেলে এস।'

নীরবে উঠে পড়েছিলাম। তারপর বাগান পেরিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় সবেমাত্র পা দিয়েছি, হঠাৎ পেছন থেকে ডাকটা কানে এসেছিল, 'শুনুন—'

মুখ ফিরিয়েই অবাক হয়েছিলাম। সেই তরুণটি। কাছাকাছি এগিয়ে এসে সে বলেছিল 'আমার নাম ধীরেশ বাসু। শিশির বাসু আমার বাবা। আপনাদের একটা অনুরোধ করব।'

কথা সে বলছিল আমাদের দু'জনের উদ্দেশে কিন্তু সেই আগের মতোই তন্ময় নির্নিমেষ দৃষ্টিটা ছিল বিজলীর ওপরেই। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী অনুরোধ?'

'কিছু মনে করবেন না, বাবার মেজাজটা ওই রকমই। বিশেষ করে সাধু-সন্ন্যাসী-মঠ-আশ্রমের ওপর উনি ভয়ানক চটা। ওঁর ব্যবহারে আপনারা দুঃখ পেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। দয়া করে বাবার কথাগুলো মনে রাখবেন না।'

ছেলেটির ভদ্র, শোভন ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আরো দু-একটা সাধারণ কথার পর আমরা বিদায় নিয়েছিলাম।

ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে পেছন ফিরে একবার তাকিয়েছিলাম বাগানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখনও বিজলীকে দেখছিল ধীরেশ। কেন জানি, আমার চেতনার অজানা স্তরে সেই মুহূর্তে কিসের একটা ছায়া পড়েছিল।

পরের দিনও বিজলীর সঙ্গে যেতে হয়েছিল। আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না। ধীরেশের অনুরোধ সত্ত্বেও আগের দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নি। মেজাজ বিরূপ হয়ে ছিল। কিন্তু আমাকে সঙ্গী না করে ছাড়ে নি বিজলী।

সেদিনও শিশির বাসুকে পুকুর পাড়ে আবিষ্কার করেছিলাম। বিকেলের রক্তিম আলোয় ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন তিনি। অবশ্য সেই আধুনিকা প্রৌঢ়া বা কিশোরী দু'টিকে কোথাও দেখতে পাই নি। তবে বাঁধানো ঘাটের উঁচু সিঁড়িতে ধীরেশ দাঁড়িয়ে ছিল।

আমার অনুমান হয়তো ঠিক নয়। তবু মনে হয়েছিল, আমাদের, বিশেষ করে বিজলীর জন্যই সে প্রতীক্ষা করছে। কেন না, বিজলীকে দেখামাত্র তার চোখদু'টি ঝকমকিয়ে উঠেছিল।

এদিকে শিশির বাসুও আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। হাতের সংকেতে বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসতে বলেছিলেন তিনি। আমরা বসলে একসময় ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, 'যাক, তা হলে এসে গেছ।'

বিজলী এবং আমি উন্মুখ হয়েছিলাম। কী যেন ভেবে তিনি আবার বলেছিলেন, 'এ একটা চমৎকার বিজনেস। ক্যাপিটালের দরকার নেই। শুধু ভগবানের নাম করে সুপারস্টিসাস ভীরুগুলোর মাথায় চাঁটি মেরে যাওয়া। তাই না হে?'

ভদ্রলোক কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে ছিলাম। আমার দৃষ্টিতে কিছুটা বিমূঢ়তা ছিল।

শিশির বাসু আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন সম্ভবত। বলেছিলেন, 'হোয়াট আই সে ইউ কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড—তাই না?'

'আজ্ঞে—' আমার গলার ভেতর থেকে একটাই মাত্র শব্দ উঠে এসেছিল।

শিশির বাসু এবার তাঁর বক্তব্যটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতে মঠ-আশ্রমগুলো ভণ্ডামির দুর্গ। সাধুর ছদ্মবেশে ধূর্ত শয়তানেরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

এ-দেশের মানুষ সংস্কারচ্ছন্ন, অশিক্ষিত এবং দুর্বল। ঈশ্বরের নাম করে কেউ হাত পাতলে ভয়েই তারা সাধ্যের অতিরিক্ত দিয়ে দেয়। মঠ-আশ্রমগুলো এই দুর্বলতার চরম সুযোগ নিচ্ছে।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন শিশির বাসু, 'জানো, তেমন উইকেনস আমার নেই। আগে সাধু-সন্ন্যাসীরা আমার বাড়িতে ঢুকতে পেত না। চাকরবাকরদের বলা ছিল, ঢুকলেই ঘাড় ধরে কুকুর লেলিয়ে যেন তাড়িয়ে দেয়। আমার কী নাম ছিল জানো, কালাপাহাড়।'

ভদ্রলোক একটু বেশি মাত্রায় বকবকায়মান। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ থেকে কখন যে নিজের জীবনদর্শনে পৌঁছে গিয়েছিলেন, খেয়াল করিনি। তাঁর বাবা-মা ছিলেন হিন্দু। তিনি কিছুই নন। কোনো ধর্মের প্রতিই তাঁর আসক্তি নেই। তাঁর ধর্মাধর্ম নেই, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই। বিয়ে করেছেন খ্রিস্টান বাপ-মায়ের মেয়েকে। তা-ও বাঙালি নয়, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান খ্রিস্টান। আর এই বিয়ের ব্যাপারে নিজের বাবা-মা'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

ধর্মের প্রতি অনুরাগ তাঁর নেই, এ-কথা অবশ্য যথার্থ নয়। শিশির বাসু একটু আগের কথাটা সংশোধন করে নিয়ে যা বলেছিলেন, সংক্ষেপে এইরকম। ধর্ম একটা তাঁরও আছে এবং পরম নিষ্ঠাভরে তিনি তা পালনও করে থাকেন। তবে সে ধর্ম মঠ বা আশ্রমের ঈশ্বরকে ঘিরে নয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে পুরনো ভগবানের সিংহাসনটিকে দখল করার জন্য ভোগবাদের যে নতুন ঈশ্বরটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে, তিনি তার ভজনা করে থাকেন।

নিজের কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়েছিলেন শিশির বাসু। বিনা ভূমিকায় হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন, 'কখনও কলকাতায় গেছ?'

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলাম, 'আজ্ঞে, কলকাতাতেই আমরা থাকতাম। জাপানি বোমার ভয়ে এখানে চলে এসেছি।'

শিশির বাসুর চোখদু'টি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, 'গুড, ভেরি গুড। তা হলে তো চৌরঙ্গির বড় বড় হোটেলগুলো দেখেছই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ভেতরে ঢুকবার সুযোগ কোনোদিনই হয় নি।'

'হবে কোত্থেকে? এই বয়েসে মঠে গিয়ে নাম লিখিয়েছ, লাইফকে আর দেখলে কোথায়!'

আমি যে বিজলীর দলের কেউ নই, মঠের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, এই কথাটা বলতে গিয়েও বলি নি। নিঃশব্দে বসেই ছিলাম।

'সেখানে না ঢুকে থাক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার কাছ থেকেই শুনে নাও কী হয় হোটেলগুলোতে।' শিশির বাসু বলে যাচ্ছিলেন, 'সেখানে প্রত্যেক রাতে পার্টি, ড্যান্স, ক্যাবারে। সেই সঙ্গে আছে 'বার'। ওহ্ হোয়াট আ সুইট হেভেন। জানো ইয়াং ম্যান, আমার ঈশ্বর সেখানেই আছেন।'

এবারও আমি নিরুত্তর।

শিশির বাসু থামেন নি, 'আসল কথাটা কি জানো, চূড়ান্তভাবে লাইফকে এনজয় করব, বেস্ট খাবার খাব, বেস্ট ড্রিঙ্ক করব, বেস্ট ড্রেস পরব—এ-ই হচ্ছে মানুষের আসল ধর্ম।

এই ধর্ম পালনের জন্যে অনেক টাকা দরকার। যেভাবে পারা যায়, আনস্ক্রুপুলাসলি সেই টাকা যোগাড় করতে হবে। চাকরি করে, ব্যবসা করে, ঘুষ খেয়ে, ঠকিয়ে—যেমন করে হোক ভাল ভাবে বাঁচতে হবে। একদল অপদার্থ আছে যারা ত্যাগের কথা, গাল-ভরা সেই শব্দটা কী যেন—কৃচ্ছ্রসাধন—তার কথা বলে থাকে। আই হেট দেম।'

প্রায় এক নিশ্বাসে নিজের কথা শেষ করে শিশির বাসু একসময় থেমেছিলেন। সামান্য কিছু দানের জন্য এত গভীর তত্ত্বকথা শুনে যেতে হবে, কে ভেবেছিল।

একটু চাপচাপ। জিরিয়ে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক, 'আমার কথা আর নয়। একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম সাধু-সন্ন্যাসী আমার বাড়ি ঢুকতে পেত না, কথাটা মনে আছে?'

অস্ফুট সুরে উত্তর দিয়েছিলাম, 'আছে।'

'আজকাল তাদের আমি বাড়িতে ঢুকতে দিই। টাকাপয়সাও দিয়ে থাকি। কেন বল তো?'

'আজ্ঞে—'

'বলতে পারবে না, কেমন? বেশ আমিই বলছি। বুঝতেই পেরেছ, তোমাদের হিসেবে আমি মস্ত এক পাষণ্ড। কিন্তু আমার মতো পাষণ্ডের পয়সা ঈশ্বরওলা ত্যাগবীররা পরমানন্দে হাত পেতে নেয়।' তীব্র শাণিত বিদ্রূপে ঠোঁটদু'টো বেঁকে গিয়েছিল শিশির বাসুর। শ্লেষভরা গলায় বলেছিলেন, 'নাস্তিকের অর্থে প্রাণ বাঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে যখন তারা ঈশ্বর ঈশ্বর করে, আমার কী মজা যে লাগে! আই হেট দোজ পিপল, হেট মার্সিলেসলি। যাক গে, এখন বল কত পেলে তোমরা খুশি হও?'

'আপনি দয়া করে যা দেবেন।' আমি বলেছিলাম।

'আপাতত দু'শ টাকা দিচ্ছি।'

আমাদের পক্ষে টাকার অঙ্কটা প্রায় অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। ভেবেছিলাম, বড় জোর দশ বিশ টাকা ছুড়ে দিয়ে তিনি আমাদের বিদায় করবেন। বিস্ময়ের সুরে বলেছি, 'দু'শ টাকা!'

'হ্যাঁ।' শিশির বাসু বলেছিলেন, 'আপাতত এ-ই দিচ্ছি। পরে আবার দেব। সপ্তাহ দুয়েক পরে এস। আর খবর দিয়ে যেও আমার টাকায় অধ্যাত্মবাদের কতখানি প্রোগ্রেস হল।'

টাকাটা নিয়ে বিজলী আর আমি উঠে পড়েছিলাম। সেদিনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ধীরেশ ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা অব্দি এসেছিল। এবং আগের দিনের মতোই বাগানের প্রান্তে যতক্ষণ আমাদের—আমাদের নয়, বিজলীকে দেখা যায়, তাকিয়ে ছিল। লক্ষ করেছি, যতটা সময় আমরা শিশির বাসুর কাছে বসে ছিলাম, বিজলীর দিক থেকে সে চোখ ফেরায় নি।

এরপর আমি আর কোনোদিন শিশির বাসুদের বাড়ি যাই নি। যাবার আকর্ষণ বা প্রয়োজন, কোনোটাই অনুভব করি নি।

দু'বার তাঁর বাড়ি গেছি। তার মধ্যেই ভদ্রলোকের কোনো রহস্যই আর অনাবিষ্কৃত নেই। তাঁর চরিত্রের সমস্ত দিকের সব দুয়ারই আমার সামনে একে একে খুলে গেছে।

চারটি বিশেষণ দিয়ে শিশির বাসুকে চিহ্নিত করা যায়। ভদ্রলোক উদ্ধত, অবিনয়ী, নিদারুণ ভোগী এবং ঈশ্বরবর্জিত। ঈশ্বর বলতে আমি অলৌকিক কিছু মানি না। শুভ আস্তিক্য বুদ্ধিকেই বুঝি। এই শুভবোধের লেশমাত্র নেই তাঁর মধ্যে। ভদ্রলোক স্বমুখেই স্বীকার করেছেন, ভোগবাদী জীবনের জন্য জালিয়াতি, প্রতারণা বা শঠতা, কোনো পথই কুপথ নয়।

দু'বার আমাকে সঙ্গী করে আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে গিয়েছিল বিজলীর। এর পর থেকে সে একা-একাই শিশির বাসুদের বাড়ি যেত। প্রায়ই কিছু কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন ভদ্রলোক। এ-খবর অবশ্য বিজলীর কাছে আমি শুনেছি।

বিজলীর সঙ্গে যেদিন প্রথম শিশির বাসুদের বাড়ি যাই, মনে আছে, সেটা ছিল মাঘের শেষাশেষি একটা সময়। তার পর ছ'টি মাস পার হয়ে গেছে। তখন শ্রাবণ মাস।

শুশুরিয়ায় ভাল বাজার নেই। মাইল পাঁচেক দূরের একটা গঞ্জে সপ্তাহের শেষে যে হাট বসে সেটা আশপাশে পঁচিশ মাইল ব্যাসের সবগুলো গ্রামের একমাত্র ভরসা। প্রায় পুরো সপ্তাহের আনাজ-মশলা এবং অন্য টুকিটাকি রসদ হাটের দিনে কিনে আনতে হয়।

একদিন হাট সেরে সন্ধের ঠিক মুখে মুখে শুশুরিয়ায় ফিরে আসছিলাম। গ্রামের প্রান্তে এসেও পড়েছিলাম।

শুশুরিয়ার মাটি রুক্ষ, রক্তাভ। আমাদের গ্রামটার কিছু দূরেই বিহারের সীমান্ত। বাংলা দেশের শ্যামল সরসতা নয়, বিহারের নির্মম রুক্ষতার দিকেই যেন জায়গাটার প্রবল অনুরাগ।

শ্রাবণ মাস। অর্থাৎ ঋতু হিসেবে বর্ষা। ক'দিন আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। তাব জের তখনও কাটেনি। রক্তাভ মাটি ভিজে গলিত মাংসের মতো হয়ে আছে। রাস্তার অবস্থা শোচনীয়।

সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হাসির কলকলানিতে চকিত হয়ে উঠতে হয়েছিল।

এদিক সেদিক তাকিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়েছিল তা যেমন অভাবিত তেমনি চমকপ্রদ। স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার ডান পাশে একটা উঁচু টিলা। সেখানে ইতস্তত কতকগুলো শালগাছের মাঝখানে বিজলী আর ধীরেশ হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে। নিজের চোখে দেখেও প্রথমটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি। স্তম্ভিত বিস্ময়ে মনে হয়েছিল, একটা অবিশ্বাস্য ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। ধীরেশ কী যেন বলছিল। দূর থেকে তা বুঝতে পারছিলাম না। সম্ভবত কোনো মজার কথাই হচ্ছিল, নইলে বাঁধনছাড়া খুশিতে ধীরেশের গায়ে ঢলে ঢলে পড়বে কেন বিজলী?

ঈশ্বর-সন্ধানী মঠযাত্রিণী মেয়েটিকে এভাবে দেখব, কল্পনাও করিনি। কতক্ষণ বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই। বিহ্বলতা যখন কেটেছিল, টিলার শালবন থেকে বিজলীরা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেই দৃশ্যটি সম্বন্ধে বিজলীর কাছে কোনোদিন কৌতূহল প্রকাশ করিনি। কিন্তু দিনে দিনে তার অভাবিত কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। পরিবর্তনটা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, জানি না। তবে শালবনের সেই দৃশ্যটি দেখার পর থেকেই আমার তীক্ষ্ণ মনোযোগী দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল তার ওপর।

বিজলী স্বল্পভাষিণী। আগে যেচে কারও সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই মেয়েই প্রগলভ হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, চতুরা নায়িকার সমস্ত লক্ষণই তার মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। এমন সব ঠাট্টা সে আমার সঙ্গে করত যা তার মতো মেয়ের কাছে প্রত্যাশিত নয়। ঠাট্টাগুলোর কোনো কোনোটা আদিরসের প্রান্ত-ঘেঁষা।

এদিকে তাকে নিয়ে শুশুরিয়ায় গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে-সব আমার কানে আসত। মঠে যাওয়া একরকম নাকি ছেড়েই দিয়েছে বিজলী। ধীরেশের সঙ্গে প্রায়ই তাকে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত।

মোট কথা. বিজলীকে ঘিরে শুশুরিয়ার ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বৃত্তের মধ্যে তরঙ্গ উঠেছিল।

বিজলীর পরিবর্তন অতি দ্রুত প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল। এতদিন তার পোশাক আশাক বলতে ছিল সরু পাড়ওলা ধুতি আর গেরুয়া চাদর। গয়না বা সাজসজ্জার সব উপকরণই সে বর্জন করেছিল।

আশ্চর্য, সেই বিজলীকে একদিন দেখলাম নীলাভ সিল্কের একটা শাড়ি পরেছে। সেই সঙ্গে হলদে রঙের একটা ব্লাউজ আর নতুন ব্রাউন রঙের ফ্যাশনেবল চটি। এতকাল চুলগুলো নিতান্ত অবহেলায় আর অযত্নে প্রকাণ্ড একটা খোঁপায় আবদ্ধ থাকত। সেদিন দেখলাম দু'টি দীর্ঘ বেণীতে তাদের শোভন করা হয়েছে। ফলে যোগিনীর ছদ্মবেশের ভেতর থেকে একটি মোহময়ী জাদুকরী বেরিয়ে এসেছিল।

প্রথম যেদিন শুশুরিয়া আসি সেদিনই মনে হয়েছিল. মেয়েটির মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা বিস্ফোরক রয়েছে। সেই বিস্ফোরককে কি আগুনের স্ফুলিঙ্গ এসে লেগেছে!

বিজলীর পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার কৌতূহলটা অদম্য হয়ে উঠেছিল। কিছুতেই আর সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি। একদিন বলেছিলাম, 'তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনছি বিজলী—'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে বিজলী। তারপর পালটা প্রশ্ন করেছে, 'কী শুনেছ ললিতদা?'

আমি থতমত খেয়ে গেছি। বিব্রতমুখে বলেছি, 'মানে সবাই বলাবলি করছে—'

'কী বলাবলি করছে?'

'তোমার কানে কি কিছুই আসে নি?'

এবার যেন বিরক্তই হয়েছে বিজলী। বলেছে, 'কী আশ্চর্য, অত প্যাঁচ কষছ কেন! লোকে কী বলছে, তুমি কী শুনেছ, স্পষ্ট করে বলে ফেল না। ভয় নেই, আমি তোমার গর্দান নেব না।'

একটু চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই বলে ফেলেছি, 'তোমাকে আর ধীরেশকে প্রায়ই—মানে তুমি নাকি ঢের বদলে গেছ। আজকাল নাকি মঠে যাচ্ছ না—'

বিজলীর চোখ দুটো দপদপিয়ে উঠেছে। মৃদু হেসে সে বলেছে, 'ঠিকই শুনেছ ললিতদা। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে ঈশ্বর ছাড়া, মঠ ছাড়া, এতদিন কোনো পথই সামনে খুঁজে পাই নি। একটা কথা কি জানো ভাই, আমার পুরনো ধারণাটা বোধ হয় বদলে যেতে শুরু করেছে। মঠ আর ঈশ্বর ছাড়াও জগতে আমার মতো মেয়ের পক্ষে বাঁচবার আরো কিছু রাস্তা ছিল। এতদিন তা জানতাম না। তবে—'

নতুন করে বাঁচবার মতো হঠাৎ যে-পথটা বিজলী আবিষ্কার করেছে, তার কিছু আভাস আমি পাচ্ছিলাম। যতটুকু পেয়েছিলাম তাতেই আমার সমস্ত স্নায়ু সচকিত হয়ে উঠেছে। অবচেতনের অতল থেকে কে যেন নিয়ত আমার কানে ফিস ফিস করতে শুরু করেছিল, বিজলীর এই বদলে-যাওয়া ভাল নয়, ভাল নয়।'

সেই যে সাজ শুরু হয়েছিল সেটা অতি দ্রুত চরম পর্যায়ে পৌঁছল। প্রচুর শাড়ি-ব্লাউজ-জুতো এবং উগ্র প্রসাধনের নানা উপাদান তার ঘরে স্তূপীকৃত হতে লাগল। বিজলীদের যা অবস্থা তাতে এ-সব স্বপ্নেও দুর্লভ। এগুলোর যোগানদার যে কে, তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। চাক্ষুষ প্রমাণ না পেলেও আমার মন বলছে, ধীরেশই দিচ্ছে।

মঠের চারপাশের কক্ষপথে এতকাল একাগ্র হয়ে ঘুরেছে বিজলী। এখন অন্ধ, দুর্বার গতিতে উল্কার মতো তার বিপরীত দিকে ছুটতে লাগল।

বিজলীর পরিবর্তনটা অনাদিবাবুও লক্ষ করেছিলেন। প্রায়ই বলতেন, 'এ সব কী হচ্ছে বিজু! তুই কি সংসারী হতে চাস?'

বিজলী ভাসা-ভাসা উত্তর দিত, 'দেখি—'

'না, দেখি বললে চলবে না। আমাকে স্পষ্ট করে বল, এত জামা-কাপড় তুই পাচ্ছিস কোথায়?'

'তুমি অসুস্থ মানুষ, অত সব তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'আমি ছাড়া কে ভাববে, বল। আর কে আছে তোর?'

এবার বিরক্ত হয়ে উঠত বিজলী। বলত, 'আঃ, বকবক না করে চুপ কর তো কাকু। রুগী মানুষ, কোথায় চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকবে, তা নয়। খালি বকর বকর।'

একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন অনাদিবাবু। ভাইঝিকে আর কিছু বলতেন না। বিয়ের পর ক'টা দিন বাদ দিলে আশৈশব বিজলীকে একরকম বুকে করেই রেখেছেন তিনি। তা ছাড়া চিরদিনই জানেন, মেয়েটা শান্ত, সহিষ্ণু। অকারণে সে কারওকে আঘাত দেয় না। বিশেষত অসুস্থ, পঙ্গু অনাদিবাবুর প্রতি তার মমতা অপরিসীম। সেই মেয়ে কেন যে তাঁর প্রতি হঠাৎ এত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তার যথাযথ কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে একেবারে মূক হয়ে যেতেন অনাদিবাবু।

ভাইঝিকে কিছু না বললেও অনাদিবাবু প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'বিজুর এ কী মতিগতি হল, বল তো ললিত!'

আমি চুপ করে থাকতাম।

'মেয়েটা সারাজীবন বিলাস কাকে বলে জানত না। সাজগোজের দিকে কোনোরকম লক্ষ্যই ছিল না তার। হঠাৎ এমন বিলাসিনী হয়ে উঠল কেমন করে, বুঝতে পারছি না।

এত দামি দামি জামা-কাপড় কোত্থেকে আসছে, কে দিচ্ছে—' বলতে বলতে থেমে যেতেন অনাদিবাবু। একটু চুপ করে থেকে আবার বলে উঠতেন, 'শুনতে পাচ্ছি আজকাল নাকি মঠে যাচ্ছে না বিজু। অথচ বাড়িতেও তো থাকে না। সারাদিন কোথায়, কীভাবে কাটায়, তুমি কিছু জানো ললিত? রোগ আমাকে এমনভাবে মেরে রেখেছে যে উঠে গিয়ে একটু খোঁজখবর নেব, তারও উপায় নেই।'

বলব কি বলব না, এই দুইয়ের মাঝখানে দ্বিধান্বিতের মতো কিছুক্ষণ দোল খেয়ে অবশেষে বলেই ফেলেছি, 'দেখুন ধীরেশ নামে একটি ছেলের—'

এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধীরেশ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন করেছেন অনাদিবাবু। আমার যা-যা জানা ছিল, উত্তরে সবই বলেছি।

সমস্ত শুনে বিহ্বলের মতো অনাদিবাবু বলেছেন, 'আমার মন বড় কু গাইছে ললিত। কী যে হবে!'

মনে আছে, আমার মুখে অনাদিবাবু যেদিন ধীরেশের কথা জানলেন তার পরের দিনই বিজলীকে ডেকে কাছে বসতে বলেছিলেন। বিজলী অবশ্য বসে নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিছু বলবে?'

আমি একটু দূরে উঠোনের এক প্রান্তে বসে ছিলাম। অনাদিবাবু ভাইঝিকে বলেছিলেন, 'তুই নাকি, তুই নাকি—'

'আমি কী?' বিজলী প্রশ্ন করেছিল।

কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নেড়ে গিয়েছিলেন অনাদিবাবু, 'এ ভাল নয় মা, এর ফল ভাল হতে পারে না।'

'তুমি কী বলছ, বুঝতে পারছি না।' বিজলী বলেছিল।

বিজলীর কথা যেন শুনতেই পাননি, এমনভাবে অনাদিবাবু বলেছিলেন, 'তুই যদি সংসারী হতে চাস, বল। মরতে মরতেও একবার চেষ্টা করি। কিন্তু এভাবে ওই ছেলেটার সঙ্গে—না মা, এ ভাল নয়।'

স্থির নিষ্পলকে কিছুক্ষণ কাকার দিকে তাকিয়ে থেকে বিজলী বলেছে, 'দেখ কাকু, আমি কচি খুকি নই। ভাল-মন্দ বোঝার বয়েস আমার হয়েছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

'কিন্তু মা, আমি স্থির জানি তুই মোহে পড়েছিস। মোহ যেদিন কাটবে সেদিন অনুতাপের কিন্তু অন্ত থাকবে না। তাই আগে থেকে—'

অনাদিবাবুর কথা শেষ হবার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল বিজলী।

আমার মা-ও বিজলীকে অনেক বুঝিয়েছেন। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। বরং প্রকারান্তরে বিজলী বুঝিয়ে দিয়েছে, তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো কথা বলতে যাওয়া আমার মায়ের অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেখতে দেখতে আরো কয়েকটা মাস কেটে গেছে। এদিকে অনাদিবাবুর অসুস্থতা আরো বেড়েছে। আমরা যখন শুশুরিয়ায় আসি তখনও উঠে বসতে পারতেন তিনি। এমন কি একটু আধটু হাঁটা-চলাও করতে পারতেন। ইদানীং একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন।

আমাদের পরিবারেও নিদারুণ ওলটপালট হয়ে গেছে। একমাত্র বড়দা ছাড়া অন্য ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তাদের নতুন ঠিকানাই জানতাম না।

একদিন দেওঘর থেকে বড়দার একটা চিঠিতে জানতে পারলাম, বাবা মারা গেছেন। বাবার মৃত্যু অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক ছিল না। তবু এই প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক ঘটনাটিকে মেনে নিতে হৃৎপিণ্ড বুঝি ফেটেই গিয়েছিল। দিনকয়েক পর আমি তবু অনেকটা সামলে উঠেছিলাম। মা কিন্তু পারেন নি। সেই দুঃসহ শোকের আঘাতে প্রথমে অভিভূত, পরে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। খেতেন না, ঘুমোতেন না, কথা বললে উত্তর দিতেন না। আচ্ছন্নের মতো ঘরের এককোণে বসে দিবারাত্রি কাঁদতেন।

অনিয়ম, অনাহার এবং অনিদ্রার যা স্বাভাবিক পরিণতি, তা-ই হল। মাসখানেকের মধ্যেই মা বিছানায় পড়লেন। এবং তারও কিছুদিন পর বাবার পথের যাত্রী হলেন।

এদিকে দুই গোলার্ধের জীবনমঞ্চে অনেক পটক্ষেপ ঘটে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর যবনিকা নেমে আসছিল ধীরে ধীরে।

সেটা উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সাল। সম্ভবত এপ্রিল কি মে মাস। এই সময় অকস্মাৎ ধীরেশ-বিজলী নাটকের শেষ অঙ্ক এসে গেল। সবার অজান্তে দু'জনে একদিন কলকাতায় পালাল।

ধীরেশ-বিজলীকে নিয়ে শুশুরিয়ার ছোট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আগেই তরঙ্গ উঠেছিল। এবার সারা অঞ্চল তোলপাড় হতে লাগল। আগেকার সেই গুঞ্জনটা আর মৃদু রইল না। সর্বক্ষণের সরস উপাদেয় একটা খোরাক পেয়ে গ্রামটা উদ্দাম হয়ে উঠল।

বিজলী পালিয়ে যাবার পর একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন অনাদিবাবু। সেই সঙ্গে স্তব্ধও। মঠযাত্রিণী সেই মেয়েটির এমন স্খলন হবে, এ ছিল তাঁর সুদূর কল্পনার বাইরে। তা ছাড়া তাঁর শেষ বয়সের বেঁচে থাকার প্রশ্নটাও ছিল বিজলীর সঙ্গে জড়িত। বিজলী চলে যাবার পর কে তাঁকে দেখবে, খাওয়াবে, সে চিন্তাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সব চাইতে ভয়ঙ্কর।

আমার মা মারা গিয়েছিলেন। কাজেই নিজের রান্না নিজেকেই করে নিতে হত। বিজলী পালিয়ে যাবার পর অনাদিবাবুর দায়িত্ব আমিই নিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর জন্যও চাট্টি ফুটিয়ে নিতাম। তাঁকে খাওয়াতাম, সাধ্যমতো পরিচর্যাও করতাম।

এদিকে বিজলী সম্বন্ধে প্রতিদিনই নতুন নতুন রটনা শোনা যেতে লাগল। কলকাতায় গিয়ে নাকি ধীরেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে সে। তার বদলে কে একজন কন্ট্রাক্টরের আনাগোনা শুরু হয়েছে তার জীবনে।

ভাইঝির এভাবে পালিয়ে যাওয়াটা ছিল নিতান্ত গ্লানিকর, কলঙ্কজনক। আগেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অনাদিবাবু। অতি দ্রুত মানসিক ভারসাম্য যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তা টের পাই নি। একদিন সকালে উঠে ত্রস্ত বিস্ময়ে দেখলাম, ভদ্রলোক গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিলাম। তারা এসে মৃতদেহের সঙ্গে একটা চিঠি আবিষ্কার করল। চিঠিতে এইটুকু শুধু লিখে গেছেন অনাদিবাবু, 'আমার আত্মহত্যার জন্যে কেউ দায়ী নয়।'

বাবা এবং মায়ের মৃত্যু, বিজলীর অন্তর্ধান, সব কিছুই দ্রুত এবং নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘটে গেল। তবু গুগুরিয়ার মাটি আঁকড়ে পড়ে ছিলাম। কিন্তু অনাদিবাবুর মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একা-একা থাকতে ভয়ে আতঙ্কে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসত। অবশেষে একদিন আমি কলকাতায় চলে এলাম। আসার আগে আমাদের রক্ষক সেই প্রবীণ চাষী গোকুল দাস একশ' টাকা দিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন অন্তিম পর্ব। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তার বিসর্জনের বাজনা বাজতে শুরু করেছে। জাপানি বোমার ভয়ে বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে যারা কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তারা গুটি গুটি ফিরে আসতে শুরু করেছে।

কলকাতায় এসে খবর পেলাম, বড়দা মেজদা ছোটদা—তিন ভাই-ই ফিরে এসেছে। কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা করার মতো উৎসাহ বোধ করলাম না। গোকুল দাসের একশ' টাকা সঙ্গে ছিল। সেটুকুর ভরসায় মির্জাপুরের একটা মেসে উঠলাম। তারপর শুরু হল অন্ধের মতো, মরিয়ার মতো একটা চাকরির সন্ধানে ছুটে বেড়ানো।

কিন্তু আমি সেই যুদ্ধোত্তর কালের যুবক, যে যুগে যৌবনের সামনে নৈরাশ্য আর অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই। অনেক ঘুরেও বাংলাদেশে বাঁচবার মতো একটা জীবিকা জোটাতে পারলাম না।

চাকরির ব্যাপারে হতাশা যখন চরমে পৌঁছেছে সেই সময় বিচিত্র যোগাযোগে রাজস্থানের তামার খনিতে একটা কাজ জুটে গেল। কাজটা পাওয়ামাত্র কলকাতা ছাড়লাম।

দশ বছর খনির পাতালে নিষ্ঠাভরে খাটাবার পর কোম্পানি আমার ওপর সদয় হয়ে তিন বছরের জন্য বোম্বাইয়ের হেড অফিসে বদলি করেছে। অবশ্য দু'টি বছর ইতিমধ্যেই কেটে গেছে। বোম্বাই-এর ক্ষণিক স্বর্গে আমার থাকার মেয়াদ ফুরোতে আর বেশি বাকি নেই। আর মাত্র একটি বছর। তারপর আবার সেই অন্ধকার গহ্বরে ফিরে যেতে হবে।

এখানে, অর্থাৎ এই বোম্বাই নগরী থেকে পনের মাইল দূরে শহরতলির এক বস্তি অঞ্চলে (এখানে বলে 'চাওল') আরো তিনজন শরিকের সঙ্গে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকি। তিনজনের সেই হট্টমন্দিরে শোয়াটুকুই মাত্র সম্ভব। তার জন্য মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। খাওয়ার ব্যবস্থা যত্র-তত্র। পুরনো প্রবাদটাকে নিজের জীবনে সার্থক করে তুলেছি।

সকালে স্নান সেরে হোটেলে খেয়ে সাবার্বন ট্রেনে ঝুলতে ঝুলতে মূল শহরে যাই। সেখানে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস। তারপরেই ছুটি আরব সাগরের পারের সেই এলাকায় যার নাম মেরিন ড্রাইভ।

অবশ্য অফিসের দিনগুলোতেই মেরিন ড্রাইভে যাওয়া হয়। নইলে রবিবার কি অন্য ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়ি মহারাষ্ট্রের পাহাড়ে-প্রান্তরে, মাঠে-জঙ্গলে। ঠিকানাহীন নিরুদ্দিষ্টের মতো সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে অনেক রাত্রে ফিরে আসি।

অফিস ছুটির পর মেরিন ড্রাইভে গিয়ে দেখি মোহময়ী সেজে সে যেন আমারই প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে। স্বপ্নাবিষ্টের মতো, বলা যায়, অলৌকিক এক ঘোরের মধ্যে সেখানে

বেড়িয়ে যখন জায়গাটা জনবিরল হয়ে যায়, হাঁটতে হাঁটতে চার্চগেট স্টেশনে চলে যাই। সেখান থেকে লাস্ট ট্রেন ধরে শহরতলির সেই এজমালি বিবরে।

দু'বছর বোম্বাইতে আছি। এতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এ-নিয়মের কদাচিৎ ব্যতিক্রম ঘটেছে। ভেবেছিলাম, এভাবেই শেষ বছরটা কেটে যাবে।

কিন্তু কে জানত, আজ মেরিন ড্রাইভ এমন একটা বিস্ময় নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল! কে জানত, প্রায় এক যুগ পর বর্ধমানের সেই মেয়েটিকে আরব সাগরের এই বিচিত্র পরিবেশে আবিষ্কার করে বসব! সেই মঠগামিনী সন্ন্যাসিনী বিজলীকে! ....

শহরতলির ট্রেনে কতক্ষণ বসেছিলাম, মনে নেই। যখন খেয়াল হল, দেখলাম, আমার যে-স্টেশনে নামার কথা সেটা পেছনে ফেলে বহুদূর চলে এসেছি।

গাড়িটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। যাই হোক, সামনের স্টেশনে নেমে আমাকে আবার উলটো দিকের ট্রেন ধরতে হবে। এ ছাড়া আপাতত কিছু করণীয় নেই।

তিন

শহরতলির যে অংশে আমার বাস সে-জায়গাটার নাম খার। স্টেশনটাও ওই নামেই।

খার স্টেশন থেকে অ্যাসফাল্টের যে রাস্তাটা ঘোড়বন্দর রোড পার হয়ে বরাবর পশ্চিম দিকে গেছে তারই শেষ প্রান্তে সমুদ্র—আরব সাগর।

আর সমুদ্রের কূল ঘেঁষে ধসে-পড়া পুরনো ইমারত এবং টালির অগণিত বস্তি অতিকায় একটা পশুর মতো পড়ে আছে। এ-অঞ্চলে বস্তিকে বলা হয় 'চাওল'।

নানা মুন্সিয়ানায় পরিকল্পিত বিশ শতকের এই আধুনিক নগরে 'চাওল'গুলোর অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভব, ভাবতেও বিস্ময় লাগে। পৃথিবীর শরীরে দুরারোগ্য ক্ষতের মতো তারা ছড়িয়ে রয়েছে।

জগতের আর দশটা বস্তির মতো এই 'চাওল'গুলোর মধ্য দিয়ে রুদ্ধশ্বাস গলি সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। গলি আর কি। সেগুলো যুগপৎ পায়ে চলার পথ এবং নর্দমা! বেরোবার কোনো উপায় না থাকায় দু'পাশের সারিবদ্ধ ঘরগুলি থেকে যত ক্লেদ আবর্জনা ওখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। গলিগুলো অন্ধকার। সেখানে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর কিছুই দেখা যায় না। দু'ধারের টালির চালের ফাঁক দিয়ে নীলাকাশের ছোট একটা টুকরো চোখে পড়ে শুধু।

'চাওল'-এর ভেতরটা ছায়া-ছায়া। একটা বিষণ্ণ সন্ধ্যা যেন সব সময় ঘনিয়েই আছে। আর আছে ভারী, মন্থর বাতাস। সেই বাতাসে বিষাক্ত একটা দুর্গন্ধ সর্বদাই ভাসমান।

সারা বছর রোদ দেখা যায় না বললেই হয়। চারদিকে দেওয়াল আর মাথায় একটানা টিন আর টালির চাল। ফলে বাইরের আলো আসার পথ প্রায় নেই। শুধু সূর্যটা যখন বিষুবরেখায় গিয়ে ওঠে সেই সময় রোদের চকিত একটা রেখা এখানকার গলিতে ঝলকাতে থাকে।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছ থেকে দু'টো মাত্র জলের কল, একটা টিউবওয়েল আর মিটমিটে ক'টি রাস্তার আলো ছাড়া কিছুই আদায় করতে পারেনি 'চাওল'টা। আর কর্পোরেশনও ওইটুকু দাক্ষিণ্য বিতরণ করেই কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে নিশ্চিন্ত আছে।

'চাওল'টা ছত্রিশ জাতের মেলা। একটা জগন্নাথ ক্ষেত্র। অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে, আর্যাবর্তে এবং দাক্ষিণাত্যে, যেখানে যত জাত আছে তাদের কেউ এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে ভুল করেনি। এই শহরের সমস্ত জায়গা থেকে মার খেতে খেতে 'চাওল'-এর বাসিন্দারা আরব সাগরের এই সীমান্তে এসে ঠেকেছে।

এখানকার বাসিন্দাদের অধিকাংশই কারখানার শ্রমিক, কিছু আছে মাদারী খেলোয়াড়, কিছু বাড়ির দালাল, আড়কাঠি, বেলুনওলা, ভেলপুরীওলা আর বেশ কিছু হরিজন বেশ্যা। এদের বাদ দিলে অবশিষ্টের দল অন্ধকারের জীব—তারা পকেটমার, ভাড়াটে গুণ্ডা, মদচোলাইয়ের কারবারি। মোট কথা, পৃথিবীর তাবত জীবিকার মানুষ 'চাওল' নামে নরকের এই প্রান্তে এসে ভিড় জমিয়েছে।

তামার খনির হেড অফিস থেকে যে মাইনে পাই তাতে শহরের মাঝখানে থাকা অসম্ভব। কাজেই শহরতলির এই 'চাওল'টায় এসে ঠেকেছি।

বাংলাদেশে একটা কথা আছে, যে কৃষ্ণ সে-ই কালী। এক ঈশ্বরের সহস্র নাম। অতএব কলকাতায় যিনি 'সেলামি' বোম্বাইতে তিনিই 'পাগড়ি' নামে বিরাজ করছেন। তিন শ' টাকা পাগড়ি দিয়ে 'চাওল'-এর একখানা ঘর যোগাড় করেছি। ঘর আর কী। দশ ফুট প্রস্থ বারো ফুট দৈর্ঘ্যের সেই খুপরিটার কোনোদিকেই জানালার বালাই নেই। সামনের দিকে একটা দরজা মাত্র। সেটাই যুগপৎ আলো, বাতাস এবং মানুষ চলাচলের একমাত্র পথ।

দরজাটা এত নিচু যে প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই ভেতরে ঢুকতে হয়। আর ঢুকতে ঢুকতে এই বিশ শতকেও পৃথিবীর আদিম যুগের গুহাবাসের কথা মনে পড়ে যায়।

তবু তো ঘর—মাথা গোঁজার আস্তানা। তিন শ' টাকা পাগড়ি ছাড়াও ষাট টাকা হিসেবে বাড়িওলার হাতে তুলে দিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করতে হয়।

দাসত্ব করি বোম্বাই শহরে, ঘুমোতে আসি 'চাওল'-এর হট্টমন্দিরে আর ভোজন যত্রতত্র। সস্তায় উদর পূরণ যেখানে সম্ভব সেখানেই ঢুঁ মারি। তা সে যে হোটেলেই হোক। মোট কথা, আমি যদি ঢেকুর তুলি পাঞ্জাবি-মারাঠি-উদিপি-উৎকলী—আসমুদ্র হিমাচলের তাবত জাতের তাবত স্বাদের তাবত খাদ্যের সৌরভ পাকস্থলীর ভেতর থেকে একসঙ্গে উঠে আসবে।

'চাওল'-এর সেই ঘরখানায় প্রথম মাস তিনেক আমি একাই ছিলাম। কিন্তু মাসান্তে মাইনের একটা অংশ বাড়িওলার হাতে তুলে দিলে অশন-বসনের ব্যাপারে মারাত্মক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। জীবনে অনেক শারীরিক কষ্ট সহ্য করেছি। এই বয়সে রক্তের স্রোত যখন মন্থর এবং শীতল হয়ে আসতে শুরু করেছে আর তা সম্ভব নয়।

সুতরাং ঘরের এবং ভাড়ার হিস্যাদার হয়ে আরো তিনজন এসেছে। প্রথমে এসেছে সুধাংশু, তারপর গণেশ, অবশেষে রজত। তিনজনেই বাঙালি! এই তিন শরিক নিয়েই আপাতত বোম্বাইয়ের শহরতলিতে আমার এজমালি সংসার।

সাবার্বন ট্রেনে বসে বিজলীর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ফলে খার স্টেশন পেছনে রেখে অনেক দূর চলে গেছি। সেখান থেকে উলটো দিকের ট্রেন ধরে 'চাওল'-এর দরজার সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন রাতের দ্বিতীয় যাম পার হয়ে গেছে, আর আমার ঘরের অন্য তিন শরিক—সুধাংশু-গণেশ-রজত তখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি এবং কড়া নাড়ার পর ঘুমজড়িত চোখে টলতে টলতে উঠে এসে সুধাংশু আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিল। তারপর আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। সোজা নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এবং চোখের পলক পড়বার আগেই তার নাকের ডাক শোনা গেল।

আমাদের এই ঘরখানায় চার দেওয়াল ঘেঁষে চারখানি দড়ির খাটিয়া। দক্ষিণ দেওয়ালের কাছে যে খাটিয়াটা সেটা সুধাংশুর, উত্তরেরটা রজতের, পশ্চিমেরটা গণেশের আর পুব দিকেরটা আমার।

সুধাংশু রজত-গণেশ, তিনজনেই এখন নিবিড় ঘুমে। ঘুমোলে সুধাংশুর নাক ডাকে। গণেশের বুকের ভেতর ঘড়ঘড়ে একটানা আওয়াজ হয়। রজতের নাক বা বুক, কোনোটাই ডাকে না। বিলম্বিত লয়ে সে ফুসফুসে বাতাস টেনে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে থাকে।

এই মুহূর্তে 'চাওল'-এর এই ঘরখানায় তিনটি মানুষের নাক ডাকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বিচিত্র মিশ্রিত শব্দ ছাড়া আর সব কিছুই স্তব্ধ। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই মিহি-মোটা-ভারী শব্দগুলো শুনলাম আর তিনটি বুকের উত্থানপতন দেখলাম।

অন্য সব দিন আমি না ফিরলে ওরা ঘুমোয় না। আজ বোধহয় আমার অস্বাভাবিক দেরি দেখে শুয়ে পড়েছে।

প্রায় এক যুগ ধরে আমি বাংলাদেশের বাইরে। রাজস্থানের তামার খনিতে যতদিন ছিলাম, স্বদেশের একটি মানুষেরও মুখ দেখি নি। কলকাতা থেকে বার শ' মাইল দূরে আরব সাগরের কূলের এই শহরটিতে বাঙালি যে দেখি নি তা নয়। আমাদের হেড অফিসেই দু-চারজন আছে। কিন্তু তারা দীর্ঘকালের প্রবাসী। দেশের সঙ্গে তাদের সংযোগ অনেক কাল আগেই ছিন্ন হয়ে গেছে। নামের মধ্যে বাংলাদেশের সীলমোহরটুকু ছাড়া চলায়-ফেরায়-আহার-বিহারে বাঙালিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু আমার ঘরের এই তিন শরিক, সুধাংশু-রজত-গণেশ---এরা দু-এক বছর মাত্র বোম্বাই এসেছে। এরা যেন তিনটি জানালা। এদের মধ্য দিয়ে বহুকাল আগে ফেলে আসা বহুদূরের সেই বাংলাদেশটির টুকরো টুকরো ক'টি ছবি যেন দেখতে পাই।

আমার এক যুগের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের যা যা পরিবর্তন আর ওলটপালট ঘটে গেছে, এই ছেলে তিনটি সর্বাঙ্গে তার অনেকখানি ছাপ যেন বয়ে এনেছে। এদের দিকে তাকালেই একটা নিদারুণ সময়ের অদৃশ্য কতকগুলো নখরাঘাত যেন দেখতে পাই। আর দেখতে দেখতে বুঝিবা শিউরেই উঠি।

দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁষে যে সুধাংশু ঘুমিয়ে রয়েছে, প্রথমে তার কথাই ধরা যাক। বছর দেড়েক হল বোম্বাই এসেছে সে। তার আগে কলকাতাতেই ছিল।

সুধাংশুর মুখে তার জীবনের সব কথা শুনেছি। সেই চিরাচরিত ইতিহাস।

কলকাতায় সে থাকত তার কাকার কাছে। সংসারে বাপ-মা হীন বেকার ছেলেদের জন্য যে জায়গাটা নির্দিষ্ট, কাকার বাড়িতে সেইখানেই তার স্থান হয়েছিল। দু'বেলা দু'থালা ভাতের জন্য প্রতিনিয়ত গঞ্জনা, অপমান আর গালাগালি। এমন একটা দিন স্মৃতি থেকে খুঁজে বার করতে পারবে না সুধাংশু যেদিন চোখের জলে ভাতের স্বাদ নোনা হয়ে যায় নি তার।

কাকা অবশ্য বিশেষ চেঁচামেচি করতে পারত না। ব্লাড প্রেসারের রোগী—কোনো কারণে উত্তেজিত হওয়া ডাক্তারের বারণ ছিল। সে ক্ষতিটুকু সুদে-আসলে চক্রবৃদ্ধি হারে পূরণ করে দিয়েছিল কাকিমা। জিভখানা তার শানানো। চোখ এবং হাত যুগপৎ ঘুরিয়ে সর্বাঙ্গ নাচিয়ে সে যখন স্বয়যন্ত্রটাকে তীব্র নিখাদে ঝঙ্কার দিতে থাকত তখন বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড জমাট বেঁধে যেত সুধাংশুর।

অথচ জাপানি পুতুলের মতো ছোটখাট চেহারা। দেখে মনে হত, কাকিমার মতো এমন নিরীহ ভালমানুষ জগতে দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু তার গলাখানি বহু সাধনায় সাধা—যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই প্রখর। কষে-বাঁধা তবলার মতো একটুতেই ঠন্ ঠন্ করে উঠত। মুখের দিকে তাকিয়ে কে অনুমান করবে গলার ভেতর এত রাগরাগিণী ওত পেতে আছে, আর একটু ইঙ্গিত করলেই ডানা মেলে সেগুলো বেরিয়ে আসবে।

গালাগালির ব্যাপারে মৌলিক প্রতিভা ছিল কাকিমার। প্রতিদিনের গঞ্জনার মূল কারণ অবশ্য একই। সেটা সুধাংশুর বেকারত্ব। কিন্তু গালাগালির ভাষাটা এক-একদিন এক-এক রকম।

রোজই জীবিকার সন্ধানে কলকাতার নানা জায়গায় হানা দিত সুধাংশু। চেষ্টার এতটুকু ত্রুটি ছিল না। কিন্তু রোজই ক্লান্ত, ব্যর্থ আর হতাশ হয়ে ফিরে আসত সে। কোনোদিন ফিরতে একটু দেরি হলে কাকিমা বলত, 'ভাসুরপো, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

কাকিমা সুধাংশুর প্রায় সমবয়সিনী। খুব বেশি হলে দু-তিন বছরের বড়। সুধাংশুর নাম ধরে ডাকত না সে। ডাকত ভাসুরপো বলে। ভয়ে ভয়ে সুধাংশু প্রশ্ন করত, 'কী কথা?'

'তোমার বাবা এ-বাড়িতে প্রকাণ্ড জমিদারি রেখে গেছে, না?'

সুধাংশুর বাবা যে তার স্বামীর ভাই, তথা তার ভাসুর, এ তথ্যটা প্রায়ই খেয়াল থাকত না কাকিমার। সুধাংশু হকচকিয়ে যেত. 'এ-কথা বলছেন কেন কাকিমা!'

কাকিমা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আপন মনেই বলে যেত, 'দাসী-বাঁদী-চাকর-নফর, সব হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। কখন বাবু আসবেন—তার পা ধোবার জল, গা ধোবার সাবান, মাথায় দেবার তেল জুগিয়ে অন্নব্যঞ্জন সাজাতে ছুটবে—' বলেই এনামেলের থালায় কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত, একটু ডাল আর ভাজা-টাজা কিছু ঝনাৎ করে ছুঁড়ে দিত।

এক-একদিন কিন্তু বেশ মোলায়েম সুরেই আরম্ভ করত কাকিমা, 'আচ্ছা ভাসুরপো, ম্যাট্রিকটা কবে যেন পাস করেছিলে? মনে আছে সে-কথা?'

কাকিমার স্বরের আকস্মিক কোমলতা বিভ্রান্ত করে ফেলত সুধাংশুকে। কারণটা সঠিক বুঝতে না পেরে বিমূঢ় সুরে বলত, 'ছ'বছর আগে।'

'ম্যাট্রিক পাস করার পরই তো চাকরির চেষ্টায় লেগেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সুধাংশুর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকত কাকিমা। তারপর হঠাৎ একসময় বলে বসত, 'একটা সত্যি কথা বলবে ভাসুরপো?'

কুকুরের মতো সুধাংশুর স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠত। সে বুঝতে পারত, একটা দুর্যোগ খুব আসন্ন। কাকিমার এই নিরীহ কথা ক'টির মধ্যে নির্দোষ প্রশ্নই শুধু নেই। রুদ্ধশ্বাসে সুধাংশু বলত, 'কী?'

'আগে কথা দাও, সত্যি বলবে।'

'মিথ্যে বলব কেন?'

'ছ'বছর ধরে সত্যিসত্যিই চাকরির চেষ্টা করছ, না চাকরির ঠাটটা বজায় রেখে ভাঁওতা দিয়ে দিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে যাচ্ছ? এ-বাজারে একটা লোকের খাওয়া-পরায় কত খরচ পড়ে—খাতা-পেন্সিল দিচ্ছি, হিসেব করে দেখ।'

এতক্ষণে সেই মোলায়েম শুরুটার একটা হেতু যেন খুঁজে পাওয়া যেত। ম্রিয়মাণ, করুণ মুখে সুধাংশু বলত, 'বিশ্বাস করুন কাকিমা, চাকরির জন্যে কি না করছি আমি! হেন অফিস আর ফ্যাক্টরি নেই যেখানে অন্তত দশ বিশ বার করে যাই নি। আপনি বিশ্বাস করুন।'

একদিন কাকিমা বলেছিল, 'দেখ ভাসুরপো, এভাবে অন্যের ঘাড়ে বসে খেলে লোকে বলে কী! যা দু-দশ টাকা পার, আমার হাতে এনে দাও।'

সুধাংশু উত্তর দেয় নি। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল।

কাকিমা ফের বলে উঠেছিল, 'লোকের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু নিজেদের দিকে একটু চোখ ফেরাও, একটু বিবেচনা কর। এতদিন সংসার ছোট ছিল, একরকম করে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দিন দিনই সংসার বড় হচ্ছে। এই দেখ না, ক'বছরে তোমার তিনটে খুড়তুতো ভাই-বোন হল। তোমার কাকার তাতেও শখ মেটে না, আরো ছেলেপুলে চায় সে। তা আমি তোমার কাকাকে কী বলি জানো?'

'কী?'

'কী বলি, তুমিই বল না—'

'আমি কেমন করে বলব?'

'পারবে না?' বলেই পুতুলের মতো মহিলাটি কাছে এগিয়ে এসেছিল। চোখের কোণে বিচিত্র হেসে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠেছিল, 'বেশ, তা হলে আমিই বলি। অবশ্য সে একটু লজ্জার কথা, তা হোক। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার আবার কিসের লজ্জা! তোমার কাকাকে আমি বলি, বিধবা বোনের মতো একটা জোয়ান বেকার ভাইপো ঘাড়ে চেপে আছে। সারাজীবন তাকে টানতে হবে। যার মাথায় এত দায় সে বেটাছেলের প্রাণে এত রসের জোয়ার কেন?' বলতে বলতে স্বরটা অতল খাদে নেমে গিয়েছিল কাকিমার, 'কথাটি সত্যি কিনা ভাসুরপো?'

সুধাংশু চমকে উঠেছিল। কী বিচিত্র কৌশলেই না কাকিমা তার কথাগুলোর মধ্যে ধিক্কার মিশিয়ে দিয়েছে: তার বক্তব্যের বাইরের দিকে আদিরস-ঘেঁষা নির্দোষ কৌতুকের একটা আবরণ আছে। কিন্তু ভেতর দিকে যা আছে, তীক্ষ্ণ ফলার মতো সেটা অব্যর্থ লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধেছে। শরবিদ্ধ পশুর মতো আহত, অসহায় মুখে কাকিমার দিকে তাকিয়ে ছিল সুধাংশু। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিল সে, গলার ভেতর থেকে অস্ফুট গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল শুধু।

হাসি-হাসি মুখে কাকিমা আবার বলেছিল, 'তাই বলছিলাম কি ভাসুরপো, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর তো বয়েস হল। কবে যে আমাদের সম্বন্ধে তোমার একটু বিবেচনা হবে!'

সুধাংশু সেদিন আর চাকরির সন্ধানে বেরোয় নি। সোজা চলে গিয়েছিল ব্লাড-ব্যাঙ্কে। শিরায় শিরায় যে উষ্ণ প্রাণদায়িনী রক্তের স্রোত দুরন্ত বেগে ছুটছে তার থেকে খানিকটা বার করে বেচে দিয়ে এসেছিল সে। রক্ত বিক্রির সেই টাকা এনে তুলে দিয়েছিল কাকিমার হাতে।

এরপর এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল। রক্তের দামে কাকার সংসারে থাকার কর যুগিয়ে গেছে সুধাংশু। কী নিদারুণ প্রাণধারণ!

বাঁচার জন্য আত্মহত্যার যে নিপুণ, নিখুঁত পরিকল্পনাটা করেছিল সুধাংশু শেষ পর্যন্ত তা পরিণতিতে পৌঁছতে পারল না।

একদিন ব্লাড ব্যাঙ্ক তার ক্ষীণ শরীর থেকে রক্ত নিতে অস্বীকার করল। সুধাংশু খুব পীড়াপীড়ি করেছে, হাতে-পায়ে ধরে অনেক অনুনয় করেছে কিন্তু রক্তের যারা ক্রেতা তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে। সুধাংশুকে তারা বুঝিয়েছে, তার শরীরের যা অবস্থা, এরপর রক্ত নিলে দুরারোগ্য অসুখ অনিবার্য। সুধাংশু শুধু রুদ্ধ, ভীত সুরে বলেছে, 'রক্ত না নিলে আমি খাব কী? অসুখ হয় হোক, আপনারা নিন। টাকা আমার চাই-ই।' কাকুতি-মিনতি, হাতে-পায়ে ধরা, কোনো কিছুতেই কাজ হয়নি। ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্ত না নিয়েই সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল তাকে।

অথচ দেহের রক্ত ছাড়া বিক্রি করার মতো আর কিছুই ছিল না সুধাংশুর। সুতরাং ভয়ে ভয়ে চুপিসারে চোরের মতো সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিল সে। ভয়টা অকারণে নয়।

দু'সপ্তাহ পর পর রক্ত বিক্রি করতে ছুটত সুধাংশু। এক শিশি রক্তের বিনিময়ে পাওয়া যেত দশটি টাকা। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে সেই টাকাটা কাকিমার হাতে তুলে দিত। বেকার ছেলেটা হঠাৎ কোত্থেকে টাকা এনে দিচ্ছে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না কাকিমার। দু'সপ্তাহ পর পর দশটি করে টাকা পাওয়া যাবে, মোটামুটি এতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে, এবং খানিকটা তুষ্টও।

কিন্তু সেদিন যখন টাকাটা পাওয়া যায় নি তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কাকিমা। বলেছে, 'মাসে মাত্তর কুড়িটা টাকা! তা-ও ক'টা দিন ঠেকিয়ে বন্ধ করে দিলে!'

অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে থেকেছে সুধাংশু। আড়ষ্ট সুরে বলেছে, 'এবার টাকাটা পাওয়া গেল না। আসছে বার একসঙ্গে দিয়ে দেব।'

পরের বারও ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে সুধাংশুকে। তার পরের বারও। সুধাংশুর শরীর রক্তদানের শেষ সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। এবং স্বাস্থ্যের যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য চাই, বিশ্রাম চাই। একটা টনিকের ব্যবস্থা-পত্রও ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে লিখে দিয়েছিল।

যদিও তার মাথা ঘুরত, থেকে থেকে হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন থেমে আসতে চাইত তবু পুষ্টিকর খাদ্য, বিশ্রাম এবং টনিকের ব্যবস্থা, সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক পরিহাস বলে মনে হয়েছে সুধাংশুর।

এদিকে কাকার সংসারে ঝড় বইতে শুরু করেছিল। কাকিমা প্রতিদিনই গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করে যাচ্ছিল, 'এত আরামে গায়ে ফুঁ দিয়ে এখানে থাকা চলবে না, চলবে না, চলবে না।'

কাকিমার গঞ্জনাটা যখন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল সেই সময় দিশেহারার মতো হাওড়া স্টেশনে এসে বোম্বাই মেল ধরে আরব সাগরের এই কূলে চলে এসেছে সুধাংশু। বার শ' মাইল দূরের শহরও তার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে বসে ছিল না। একটা ভদ্র রকমের জীবিকার জন্য উদ্‌ভ্রান্তের মতো এখানেও ঘুরে বেড়িয়েছে সে। কিন্তু কলকাতার মতো বোম্বাইও দুয়ার খুলে তাকে কাছে টানে নি। তার কৃপণ, কঠিন মুঠি থেকে এক কণা করুণাও ঝরে নি।

শেষ পর্যন্ত চাকরির ব্যাপারে যখন হতাশ হয়ে পড়েছে সেই সময় কটন গ্রিনের এক কাপড়-কলে হঠাৎ কাজ জুটে গিয়েছিল। সারাটা দিন সেখানেই তার কেটে যায়। সন্ধের পর একটা ক্লান্ত পশুর মতো ধুঁকতে ধুঁকতে খারের এই এজমালি বিবরে ফিরে আসে সে।

সুধাংশুর পায়ের দিকে যে খাটিয়াটা, সেখানে ঘুমোচ্ছে গণেশ। তার ইতিহাস আরো করুণ, আরো বিচিত্র। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ফরিদপুর জেলার এক অখ্যাত, নগণ্য গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে এসেছিল গণেশরা। মা-বাবা-দিদি-ছোট এক বোন আর দুই ভাই নিয়ে তাদের সংসার।

কলকাতায় এসে প্রথম কয়েকটা মাস শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে কেটে গেছে। তারপর উত্তর শহরতলির শেষ প্রান্তে জবরদখল কলোনির একখণ্ড মাটিতে টিনের চাল আর কাঁচা বাঁশের বেড়ার দু'খানা ঘর তুলে নিয়েছে গণেশরা।

মাথা গোঁজার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা তো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই পৃথিবীর সেই আদিম জৈবিক প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—খাবে কী? যে কোনো ধরনের একটা কাজের আশায় বাবা কিছুদিন এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে অবশেষে ট্রেনে ট্রেনে ফেরিওলার যে জীবিকাটা সংগ্রহ করেছিল তাতে সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নিজের খরচটাই উঠতে চাইত না।

অতএব এই বিরাট সংসারের সামনে ভাতের থালা সাজাবার জন্য দিদিকে এগিয়ে আসতে হল। কত আর বয়স তখন তার? উনিশ কি কুড়ি। আদিবাসিনী মেয়েদের মতো নিটুট শরীর তার। পূর্ব বাংলার অবারিত প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত উদ্দাম স্বাস্থ্য কেড়ে এনেছে সে। সেই সঙ্গে যৌবন এসেছে উজান ঠেলে। তার ওপর গায়ের রংখানি ছিল ফর্সা, ঠোঁটদু'টি রক্তাভ, প্রতিমার মতো মুখের গড়ন, চোখ দু'টি বড় বড় এবং টানা টানা।

সেই দিদি একদিন সাজতে বসেছিল। বিস্মিত সংশয়ে গণেশ লক্ষ করেছে, দিদি ঠোঁটে রং লাগিয়েছিল, চোখে কাজল টেনেছিল, গালে পাউডার ঘষেছিল, পরিপাটি করে চুল বেঁধেছিল এবং একমাত্র ফর্সা কাপড়খানা কুঁচি দিয়ে পরেছিল। তারপর কোত্থেকে যেন, বুঝিবা মাটি ফুঁড়েই মন্ত্রবলে দু'টি অপরিচিত লোক—বিচিত্র তাদের পোশাক, পরনে পশুপাখির ছাপমারা হাওয়াই শার্ট এবং সরু প্যান্ট, পায়ে ছুঁচলো জুতো—বেরিয়ে এসে দিদিকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে চলে গিয়েছিল।

দিদির কলকাতার সেই সঙ্গী দু'টি এবং সাজের এত উপকরণ, এ-সব যে কোত্থেকে এসেছিল, সেদিন বুঝতে পারে নি গণেশ।

প্রথম যেদিন দিদি কলকাতায় যায়, গণেশ আর ছোট ভাই-বোনেরা দল বেঁধে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। আর মা বাঁশের বেড়ায় মুখ গুঁজে রুদ্ধ গলায় গুঙিয়ে উঠেছে।

প্রথম সেই দিনটির পর রোজই সেজেগুজে সন্ধের পর কলকাতায় চলে যেত দিদি। ফিরত রাতের মধ্য প্রহরে। শহরতলির লাস্ট ডাউন ট্রেনে। এইভাবে পাঁচ বছর যাতায়াত করেছে দিদি। ইতিমধ্যে সংসারে অনেকখানি সচ্ছলতা এসেছে, ভাইবোনদের গায়ে দামি জামা প্যান্ট উঠেছে। তারা স্কুলে যেতে শুরু করেছে। ভাতের থালায় মাংস না হোক, বড়সড় এক টুকরো মাছ রোজই পাওয়া যেত। বাবা আর ফেরি করতে বেরতো না। গুঙিয়ে গুঙিয়ে মায়ের সেই প্রথম দিনের কান্নাটা আর শোনা যায় নি। তার বদলে পুরনো ঢং-এ চুলে পাতা কেটে ফর্সা শাড়ি পরে পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে কলোনির বাড়ি বাড়ি বেড়াতে বেরতো সে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, 'মাইয়া রোজ সন্ধ্যায় যায় কই? অত রাইতে ফিরে ক্যান?' মা উত্তর দিত, 'আপিসে যায়।' কলোনির লোকেরা বলত, 'রোজ রাইতেই আপিস! দেইখো, সাবধান!' মা সন্দিগ্ধ সুরে বলত, 'কী কইতে চাও তোমরা?' তারা বলত, 'কই কি, আমরা তো আন্ধাও না, কালাও না। চোখে হগলই দেখি, কানে হগলই শুনি। এত যে ফুটানি, বুড়া বয়েসে এই যে চুলে পাতা কাটন—কিসে কী হয়, আমরা হগলই বুঝি। ছিঃ ছিঃ—'

কথা শেষ হবার আগেই মা ঝগড়া বাধিয়ে দিত। চিৎকার করত, গালাগাল দিত, 'আমরা একটু ভাল খাই, ভাল পরি, নিঃবংশী ডেকরীগো তা সয় না। পরান একেবারে চড় চড় করে—'

অপর পক্ষও স্বাভাবিক কারণেই নিশ্চুপ থাকত না, 'যদি পার, মাইয়ার অমুন রোজগারে না বাইচা গলায় একখান দড়ি দিও।'

পাঁচ বছরে দিদির কলকাতায় যাবার রহস্য এবং কোন মূল্যে এতগুলো মানুষের প্রাণধারণ চলছে তার গ্লানিকর ইতিহাস ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে ফেলেছে গণেশ। গণেশ জেনেছে, প্রতিদিন কলকাতার হোটেলে হোটেলে গিয়ে শ্বাপদের মুখে নিজের সুঠাম দেহটি তুলে—

পাঁচ বছর চলার পর তাদের সংসারটা হঠাৎ থমকে গিয়েছিল। একদিন যথানিয়মে সন্ধের সময় দিদি সেই যে বেরিয়েছিল আর ফেরে নি। বাবা আর সে দু'দিন সমস্ত

কলকাতা তোলপাড় করে অবশেষে হাসপাতালে খোঁজ পেয়েছিল। দিদিকে কারা যেন ছুরি মেরে খুন করেছে।

দিদির শোকে কতটা, আর নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনধারণের দুশ্চিন্তার জন্য কতটা, তা কে বলবে, বাবা একদিন বিষ খেয়েছে। খেয়ে একরকম বেঁচেই গেছে।

দিদির পর সংসারটা স্বাভাবিক নিয়মেই গণেশের মুখের দিকে তাকিয়েছে। গণেশও তাদের বাঁচাবার চেষ্টা না করে পারে নি। শুরু করেছিল শহরতলির ট্রেন থেকে ইলেকট্রিকের তার কাটা দিয়ে। এক বছরের মধ্যেই কুখ্যাত ওয়াগন-ব্রেকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

(আমি ললিত চৌধুরি যে-সময় দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম সেটা হল উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের শেষাশেষি অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্ব। তারপরের একযুগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরেকটা অদৃশ্য অন্ধকার পৃথিবী জন্ম নিয়েছিল। সেই অন্ধকার পাতালের একদিকে হারিয়ে গিয়েছিল গণেশের দিদি। আরেকটা দিক হাত বাড়িয়ে গণেশকে তার গহ্বরে টেনে নিয়ে গেছে।)

গণেশরা যেখানে থাকত, যদিও সেটা শহরতলি, তবু কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে নয়। সেটা জেলা চব্বিশ পরগনারই একটা অংশ। একদিন ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলা থেকে 'এক্সটার্ন' হতে হল গণেশকে। 'এক্সটার্ন' হলেও রাতের অন্ধকারে তাকে ফিরে আসতেই হত। না ফিরলে সংসার চলবে কীভাবে? অতএব যা স্বাভাবিক তা-ই ঘটেছে। বার দুই তাকে জেলে যেতে হয়েছে। দ্বিতীয় বার জেল থেকে বেরিয়ে গণেশ দেখেছে, চারদিকে ফাঁদ পাতা। সে এত বেশি দাগী হয়ে গেছে যে, যে-কেউ ওয়াগন ভাঙুক কি ইলেকট্রিকের তার কাটুক, পুলিশ এসে প্রথমে তাকেই টানাটানি করবে। কাজেই বার শ' মাইল পাড়ি দিয়ে বোম্বাই চলে এসেছে সে। এখানে খারের জেলে-বস্তিতে বে-আইনি মদ চোলাই করে। মাসের শেষে মায়ের নামে টাকা পাঠায়। সেই টাকার ওপর ক'টি প্রাণ নির্ভর করছে।

আমি জানি, রক্তের দাগ শুঁকে শুঁকে যেমন শ্বাপদ আসে, একদিন গণেশের খোঁজে পুলিশ এসে এখানে হানা দেবেই। অনেক বুঝিয়েছি তাকে, এ-সব ছেড়ে ছুড়ে কোনো কল-কারখানায় সে চাকরি নিক, সৎভাবে বাঁচতে চেষ্টা করুক। অসহায়ের মতো গণেশ জানিয়েছে, এ-পথ থেকে ফেরার তার কোনো উপায় নেই। লেখাপড়া শেখে নি সে। কলকারখানায় চাকরি নিয়ে যা মাইনে পাবে তাতে সে-ই বা খাবে কী, আর বাড়িতেই বা কী পাঠাবে?

গণেশের পায়ের দিকে অর্থাৎ উত্তরের দেওয়াল ঘেঁষে যে খাটিয়াটা, সেখানে আমার ঘরের চতুর্থ শরিক রজত শুয়ে আছে। প্রথম প্রথম এই ছেলেটিকে আমি বুঝতে পারতাম না। তার চারদিকে অনেকগুলো দেওয়াল তোলা ছিল। ধীরে ধীরে অবশ্য সেই দেওয়ালগুলো ভেঙে ভেতরের সমস্ত রহস্যই জেনেছি।

সুধাংশু বা গণেশ বাংলাদেশের যে দিগন্ত থেকে এসেছে, রজত এসেছে তার বিপরীত প্রান্ত থেকে। তার কুলশীল ভিন্ন।

রজত থাকত মামাবাড়িতে। মামার অবস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সচ্ছল। রীতিমতে ধনীই বলা যায় তাঁকে। একদিন হাজার পাঁচেক টাকা আর মামীর কিছু গয়না চুরি করে বোম্বাই চলে এসেছে সে।

সুধাংশু বা গণেশের মতো জীবিকার সন্ধানে এখানে আসে নি রজত। এই শহর তাবে অন্য দিক থেকে হাতছানি দিয়েছিল। ছায়ালোকের নেপথ্যে যে মোহময় আলো-আঁধারের একটা জগৎ রয়েছে, সে এসেছে সেই দুরন্ত আকর্ষণে। অর্থাৎ তারকা হবার স্বপ্ন তার দু'চোখে।

শোনা যায়, কাঁচপোকার সংস্পর্শে এলে তেলাপোকা কাঁচপোকা হয়ে যায়। রজতের ধারণা ছিল, বোম্বাই শহরের এমনই মহিমা, এখানে এলেই চিত্রলোকের তারকা হয়ে যেতে পারবে। তেলাপোকা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁচপোকা হতে পারে নি।

অবশ্য রজতের অধ্যবসায় বা চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। বোম্বাইতে পা দিয়েই প্রথমে দামি হোটেলে উঠেছিল সে। তারপর স্টুডিওতে স্টুডিওতে হানা দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু স্বপ্নলোকের দরজাটা মুহূর্তের জন্যও তার সামনে খুলে যায় নি। চিচিং-ফাঁকের মন্ত্রটাও তার জানা ছিল না।

এদিকে পাঁচ-হাজার টাকা আর মামীর গয়নাগুলো দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় যে ফিরে যাবে, রজতের সে পথেও কাঁটা ছড়ানো। মামা এমনিতে স্নেহশীল ভালমানুষ কিন্তু তাঁর চরিত্রে অনমনীয় কাঠিন্য আছে। কোনো অন্যায় তা যে রকমই হোক, ক্ষমা করেন না। বিশেষ করে যে ছেলে চুরি করে সিনেমার নায়ক হতে বোম্বাই পালিয়েছে সে ফিরে এলে দু'হাত বাড়িয়ে যে বুকে টেনে নেবেন তেমনটা ভাবা নিতান্তই দুরাশা অতএব হোটেল থেকে খারের এই বস্তিতে নেমে এসেছে রজত।

হাতে একটি পয়সাও তার অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই কিছুদিন চৌপট্টির বালুকাবেলায় রংবেরঙের বেলুন বেচে বেড়িয়েছে সে। ইদানীং জুহু বীচে ভেলপুরী আর আইসক্রিম বিক্রি করে। দিনান্তে দশ-পনেরটা টাকা লাভ থাকে। আপাতত এ-ই তার জীবিকা।

সুধাংশু, রজত আর গণেশ—বাংলাদেশের তিনটে জানালা। এতকাল এদের নিয়ে আমি মেতে থেকেছি। এদের দুঃখে কেঁদেছি, এদের সুখের জোয়ারে ভেসে গেছি। এদের সঙ্গে আরব সাগরের বাতাস ফুসফুসে টেনে নিতে নিতে রোজ স্বপ্ন দেখেছি যদি আমাদের অবস্থা কোনোদিন ফেরে খারের এই বস্তি থেকে আরেকটু ভদ্র জীবনে চলে যাব। কিন্তু আজ?

আজ আমার চেতনায় সুধাংশু, রজত বা গণেশ, কেউ ছায়া ফেলতে পারছে না আমার প্রাণের সব দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে আছে বিজলী। সন্ধেবেলা মেরিন ড্রাইভে তাকে আবিষ্কার করার পর থেকেই নিজের মধ্যে অস্থির এক আলোড়ন অনুভব করতে শুরু করেছি।

মেরিন ড্রাইভ থেকে ফিরে কড়া নাড়তে সুধাংশু আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিয়েছিল। সেই আলোটা এখনও জ্বলছে।

আলো নিভিয়ে এখনই শুয়ে পড়ব। আমি জানি আজ আর ঘুম আসবে না। বাকি রাত বিজলীর চিন্তাতেই কেটে যাবে।

বিজলী! বিজলী! বিজলী!

চার

দিন দুই পর ছিল রবিবার। সপ্তাহ শেষের এই ছুটিটার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে ছিলাম। শুধু উন্মুখই নয়, অস্থিরও। সেটা নিতান্ত অকারণে নয়।

সেদিন বিজলীকে মেরিন ড্রাইভে দেখেছি, দু-চারটে কথাও বলেছি। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমার অপার কৌতূহলের লেশমাত্রও মেটে নি। বরং এই দু'দিনে আমার বিস্ময় এবং বিমূঢ়তা শতগুণ বেড়ে চেতনা আর অবচেতনার সকল দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যেন।

অতএব শনিবারের রাতটা শেষ হতে না-হতে উঠে পড়লাম। চারপাশে তরল অন্ধকার ছড়ানো। ছুটির দিনের ভোর আরব সাগরের এই কূলে এসে এখনও পৌঁছতে পারে নি।

আমার ঘরের অন্য শরিক তিনজন এখনও অগাধ ঘুমে নিমজ্জিত। নিঃশব্দে মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে স্টেশনে চলে গেলাম। আমি দাদার যাব।

বিজলী সেদিন আমাকে তার ঠিকানা দিয়েছিল। —নম্বর পার্শি কলোনি, ফিফথ ফ্লোর, দাদার।

দাদার স্টেশনে নেমে পার্শি কলোনির সেই বাড়িটাকে খুঁজে বার করতে বেশ বেলা হয়ে গেল। ততক্ষণে সূর্যটা মহারাষ্ট্রের এই শহরের প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে।

বাড়িটা সুবিশাল। গুনে দেখলাম, ছ'তলা। সামনের দিকে চমৎকার বাগান। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণে সামলে নিলাম। বিজলীকে সেদিন যেভাবে যে-রূপে দেখেছি তাতে সে যে এমন একটা বাড়িতে থাকবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

মরিয়ার মতো ভেতরে ঢুকে পড়লাম। অটোমেটিক লিফট ছিল। সেদিকে গেলাম না। উঁচু সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে বাড়িটার প্রায় শীর্ষে অর্থাৎ ষষ্ঠ তলের নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম ক্লান্তিতে পরিশ্রমে আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে।

একটু জিরিয়ে জোরে জোরে বারকতক ফুসফুসে বাতাস টেনে কলিং বেল টিপলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে উর্দি-পরা একটা বয় উঁকি দিল।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'বিজলী দেবী এখানে থাকেন?'

'বিজলী দেবী কৌন?' বয়টা পালটা প্রশ্ন করল।

কী করে তাকে বোঝাব বিজলী দেবী কে। বর্ধমানের সেই মেয়েটির একটা মাত্র পরিচয়ই আমার জানা। সে ঈশ্বরবিশ্বাসী, সংসার-বিরাগী এবং সন্ন্যাসিনী। সে-পরিচয় নিশ্চয়ই এখানে গ্রাহ্য নয়।

কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'আরে ললিতদা যে। এস ভাই, এস। বয়, সাবকো অন্দর লেকে আও।'

বয়টা সসম্ভ্রমে বলে উঠল, 'আইয়ে—'

বেঁচে গেলাম। বয়টার পিছু-পিছু অতঃপর যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম সেটা যেন বাস্তব জগতের কোনো অংশ নয়। মনে হল, বিচিত্র এক স্বপ্নের মধ্যে এসে পড়েছি।

লম্বা, বিরাট একখানা ঘর। দেওয়ালগুলো ডিস্টেম্পার-করা এবং জলরঙে চিত্রিত। টাইলস-বসানো মেঝে দামি কাশ্মিরি কার্পেটে আবৃত। তার ওপর ক'টি ফ্যাশনেবল সোফা আর টি-পয়। এককোণে রেডিওগ্রাম, তার উলটো দিকে অ্যাকোয়েরিয়ামে লাল-নীল মাছেদের মেলা। আরেক ধারে মেঝেটা অনেকখানি উঁচু। সেখানে দু'টি সুদর্শন পিলার। দুষ্প্রাপ্য অর্কিড তাদের বেষ্টন করে রয়েছে।

ঘরের একটা দরজা বা জানালাও খোলা নেই। কাজেই পরিবেশটা অন্ধকার। অন্ধকার ঠিক নয়, নীলাভ। কেন না, ওই রঙেরই আলো দেওয়ালের এক প্রান্তে কাচের আবরণের ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ঘরটা আশ্চর্য শীতল। মাথার ওপর ফ্যান নেই। অনুমান করলাম, এয়ার-কুলারের ব্যবস্থা আছে।

বিজলী একটা সোফায় অর্ধশায়িত ছিল। তার সামনের টি-পয়ে স্তূপীকৃত সিনেমা, থ্রিলার এবং চিপ পোর্নোগ্রাফির ম্যাগাজিন। মুখোমুখি একটা সোফা দেখিয়ে আমার উদ্দেশে বলল, 'বসো।'

মন্ত্রচালিতের মতো বসে পড়লাম।

বিজলী আবার বলল, 'ঠিকানা অবশ্য নিয়েছিলে। শেষ পর্যন্ত কষ্ট করে সত্যিই যে আসবে, ভাবি নি।'

এখনও ঘোরের মধ্যেই আমি আছি। বর্ধমানের সেই মেয়েটি যে কীভাবে এত ঐশ্বর্য আর বিলাসের মাঝখানে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছে, বুঝে উঠতে পারছি না। ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'কী যে বল তার ঠিক নেই। এতদিন পরে দেখা, আসব না!'

বিজলী হাসল। একটু ভেবে বলল, 'অনেকটা সময় হাতে নিয়ে এসেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখন বল, কী খাবে? চা না কফি?'

'যা খুশি আনাও।'

বয়কে দিয়ে চা-ই আনাল বিজলী। সেই সঙ্গে লোভনীয় সব ভোজ্য। প্লাম কেক স্যান্ডউইচ, পেস্ট্রি। এবং নানা স্বাদ-গন্ধ-বর্ণের আরো অনেক কিছু যে-সব চোখে দেখা দূরের কথা, নাম পর্যন্ত শুনি নি। নিজের হাতে খাবারগুলো আমার সামনে সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এখন চা খাও। দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে সেই বিকেলে ছাড়া পাবে।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

একটু চুপচাপ। খানিকটা ইতস্তত করে একসময় বিজলী বলল, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো ললিতদা?'

'কী?'

'দেখ ভাই, আমি হ্যাবিচুয়াল স্মোকার। পাঁচ মিনিট পর পর সিগারেট না খেলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তুমি দাদা মানুষ, তাই সঙ্কোচ হচ্ছে। দয়া করে যদি অনুমতি দাও—'

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বলে কী বিজলী! পর মুহূর্তেই খেয়াল হল, শুশুরিয়ায় যে-মেয়েটিকে দেখেছিলাম, এ সে নয়। তার জন্মান্তর ঘটে গেছে। অর্ধস্ফুট গলায় বললাম, 'বেশ তো।'

সিগারেট ধরাতে ধরাতে বিজলীর দৃষ্টি এসে পড়ল আমার ওপর। বলল, 'ওকি, হাত গুটিয়ে কেন? খাও।'

নিঃশব্দে একটা পেস্ট্রি তুলে কামড় দিলাম।

কী একটু ভেবে বিজলী আবার শুরু করল, 'আচ্ছা ললিতদা—'

'বল—' আমি উদ্‌গ্রীব হলাম।

'তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না?'

প্রশ্নটা যে বিজলীর নিজের সম্পর্কে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। বললাম, 'তা খানিকটা হয়েছি বৈ কি।'

স্বগতের মতো বিজলী বলতে লাগল, 'অবাক হবার কথাই। যখন ভাবি, কী ছিলাম আর কী হয়েছি তখন নিজেরই মাথার ঠিক থাকে না।'

নিরুত্তরে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মুখের ভেতর থেকে সিগারেটের একরাশ গাঢ় ধোঁয়া কুণ্ডলীর আকারে মুক্তি দিয়ে বিজলী বলল, 'আমার কথা থাক, আগে তোমার কথা বল।'

'আমার আবার কী কথা! তোমারটা শুনবার জন্যেই তো এলাম।'

'নিশ্চয়ই শুনবে। সে তো অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত। তার আগে তোমারটা বলে নাও।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্বে শুশুরিয়া থেকে কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষেপে বলে গেলাম।

সব শুনে বিজলী প্রশ্ন করল, 'আমাদের জন্যে একটা বৌদি-টৌদি এনেছ?'

নীরবে হাসলাম। সেই হাসির মধ্যেই উত্তরটা ছিল। বিজলী বলল, 'বুঝলাম। এখনও 'একলা চল'র দলে নাম লেখানো রয়েছে।'

এবারও আমি নিশ্চুপ।

কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বিজলী বলল, 'তোমার কথা তো বললে। এবার আমার পালা। কিন্তু কোত্থেকে কীভাবে আরম্ভ করব, ঠিক বুঝতে পারছি না।' বলতে বলতে বিদ্যুৎচমকের মতো হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল তার, 'আচ্ছা, শুশুরিয়ার সব কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে, তাই না? বিশেষ করে ধীরেশ সম্পর্কে—'

'আছে। তবে—'

'কী?'

খানিকটা দ্বিধান্বিত সুরে বললাম, 'ধীরেশের সঙ্গে তোমার কেমন করে আলাপ আর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, সে-সব জানতাম না। তবে আন্দাজ করতাম ওদের বাড়ি যেতে যেতেই হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না বিজলী। কী এক আত্মগত ভাবনার মধ্যে তলিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করল, 'ঠিক ধরেছ। প্রথম দু'দিন তুমি আমার সঙ্গে গিয়েছিলে। পরে তো আমি একাই যেতাম। যতবার গেছি মনে হয়েছে, ধীরেশ যেন আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে। শিশির বাসুর কাছ থেকে ডোনেশন আদায় করে যখন ফিরতাম, সে আমার সঙ্গ নিত। আমার পাশে পাশে বাগানের শেষ মাথায় ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তাটা পর্যন্ত আসত। প্রথম প্রথম আমার ভীষণ ভয় লাগত। আড়ষ্টের মতো হাঁটতাম। পরে অবশ্য ভয় টয় ছিল না। ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। তার কারণও ছিল। শিশির বাসু রাফ, অ্যারোগ্যান্ট কিন্তু তাঁর ছেলে ধীরেশ ডাইরেক্টলি অপোজিট। সে বিনয়ী, ভদ্র, নম্র। এক কথায় ডিসেন্ট।'

প্রথম প্রথম বিজলীর সঙ্গে বাগানের প্রান্ত পর্যন্ত আসত ধীরেশ। কবে যেন একদিন রাস্তাতেও নামল সে। তারপর থেকে বিজলীকে শুধু এগিয়েই দিত না, তাকে নিয়ে গ্রামের ভেতরে এবং বাইরে বেড়াতেও যেত।

অতএব স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেই বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে শুশুরিয়ার মতো গ্রামে অনাত্মীয় তরুণ-তরুণীর সম্পর্ক বোঝাতে বন্ধুত্ব শব্দটা নিঃসংশয়ে শ্রুতিকটু। তবু তার বদলে আর কী-ই বা বলা যায়?

বিজলী আর ধীরেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। প্রাথমিক আলাপ এবং পরবর্তী সখ্যের অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে ধীরে ধীরে তারা আরো নিকট এবং ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

প্রথমে তারা পরস্পরকে 'আপনি'ই বলত। কিন্তু নিজেদের অজান্তে কবে যেন একদিন 'তুমি' শুরু হয়েছিল।

সেই ঈশ্বরবিশ্বাসী মেয়েটির এমন অভাবিত পরিবর্তন হল কেন? তার বিশদ ব্যাখ্যা অবশ্যই দেওয়া যায়।

প্রথমত, ধীরেশের মধ্যে এমন এক আকর্ষণ ছিল যা উপেক্ষা করা অসাধ্য। শুরুতে মঠের জন্য চাঁদা আদায় করতে শিশির বাসুদের বাড়ি যেত বিজলী। পরে যেত নিজের অজ্ঞাতসারে, প্রায় অকারণেই, বিচিত্র দুর্বোধ্য এক ঘোরের মধ্যে।

দ্বিতীয় কারণটি এই রকম। দু-চার দিনের আলাপেই তার জীবনের সব ইতিহাস জেনে নিয়েছিল ধীরেশ। জানার পর থেকে যখনই দেখা হত, সে বলত, 'এভাবে নিজেকে ধ্বংস করছ কেন? জীবনের একটা দিকই শুধু দেখলে। তার উলটো দিকটাও দেখ। সুখ-আনন্দ-যৌবন, এগুলো এই বয়েসেই অস্বীকার করতে চাও?'

ঔদ্ধত্য আর অবিনয়টুকু বাদ দিলে শিশির বাসুর মতো তাঁর ছেলে ধীরেশও একই ভোগের ধাতুতে গড়া, একই ভোগের বৃত্তে তারও ঘোরাফেরা। সে-ও নিদারুণ ভোগী। তার অস্তিত্বের ভেতরে বাইরে, মুক্ত-বন্ধের সকল দিকে ভোগবাদের মেলা সাজানো।

প্রায় রোজই ধীরেশের ওই একই কথা শুনতে শুনতে প্রাণের গভীরে কোথায় যেন আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আঠার উনিশ বছরের একটি তরুণী, জীবনের কোনো দিকই যার পূর্ণ হয় নি, সব সাধই অতৃপ্ত, সমস্ত ভোগ-বাসনা সবলে সরিয়ে দিয়ে সে মঠ আর ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়েছে। এতকাল স্বাভাবিক কামনাগুলির দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছিল বিজলী। অকস্মাৎ সব অতৃপ্তি, সব স্পৃহা, সব বাসনা হাত ধরাধরি করে বুকের ভেতরকার গোপন কারাবাস থেকে শতমুখে বিদীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল যেন।

শুনতে শুনতে আমি ললিত চৌধুরি, অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সামনে সেই সুদর্শন টি-পয়টার ওপর রাশি রাশি লোভনীয় খাদ্য। সেগুলোর কথা মনেই ছিল না।

বিজলী সমানে বলে যাচ্ছে, 'জানো ললিতদা, আমার ঈশ্বর আস্তে আস্তে বদলে যেতে লাগল। মঠে যেতে আর ভাল লাগত না। একটা নেশায় পেয়ে বসেছিল যেন। প্রায় সারাদিনই ধীরেশের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। সে-ই একদিন সন্ন্যাসিনীর খোলস ছিঁড়েখুঁড়ে আমার ভেতরকার একটা নতুন মানুষকে বার করে আনল। তারপর নতুন সাজে তাকে সাজাতে বসল। তুমি হয়তো লক্ষ করেছ, গেরুয়া চাদর আর থান ছেড়ে আমি রঙিন সিল্কের শাড়ি পরতাম, ঠোঁটে রং মাখতাম। চোখে সুর্মা লাগাতে আর বাহারে জুতোও পরতে দেখেছ।'

রুদ্ধস্বরে বললাম, 'দেখেছি।'

'সে-সব ধীরেশই আমাকে দিত।' বিজলী বলতে লাগল, 'যাই হোক, সেই ছোট্ট গ্রামখানায় থেকে আমার নতুন ঈশ্বরকে কতটুকুই বা ভজনা করতে পারতাম? দু'খানা দামি শাড়ি-ব্লাউজ পরে, ঠোঁটে-মুখে রং লাগিয়ে কতখানিই বা ভোগী হওয়া যেত ? তা ছাড়া আরো একটা বিপদ বাধল।'

'কিসের বিপদ?'

বিজলী এ-প্রশ্নের যা উত্তর দিল, সংক্ষেপে এইরকম। স্বেচ্ছাগমন স্বেচ্ছাভ্রমণ যতই করুক, প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের কাঁটা ছিল। হাজার হোক সেটা উনিশ শ' বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশের গ্রাম। সেই ছোট, রক্ষণশীল, নানা সংস্কারে-ভরা এলাকার মধ্যে সবার নজর এসে পড়েছিল বিজলী আর ধীরেশের ওপর। মঠগামিনী মেয়েটির এমন অকল্পনীয় পরিবর্তন তাদের যতখানি আঘাত হেনেছিল, ঠিক ততখানিই কৌতূহলী করে তুলেছিল। গ্রাম জুড়ে অতএব নিদারুণ গুঞ্জন উঠেছে। তারা যেখানেই যেত, কেউ না কেউ তাদের অনুসরণ করত।

বিজলী বলতে লাগল, 'জানো ললিতদা, একদিন ধীরেশ বললে, এটা বিশ্রী জায়গা। এ-খানে ভাল লাগছে না। তার চাইতে চল, কলকাতায় যাই। কলকাতার নামে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের নোরপুর আর তোমাদের শুশুরিয়া, বধর্মান জেলার এই

গ্রামদু'টোর বাইরে বিশেষ কোথাও যাই নি। অবশ্য কলকাতায় আগে একবার গিয়েছিলাম। থেকেও এসেছিলাম মাস দুয়েক।'

'কলকাতায় কী জন্যে গিয়েছিলে?' আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম।

'বা রে, তোমার কিছুই মনে নেই দেখছি। আমার একবার শ্মশানযাত্রা হয়েছিল না!'

'শ্মশানযাত্রা!'

'হ্যাঁ, সেই যে একটা উন্মাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তোমাকে তো সবই বলেছি। মনে পড়ছে এবার? কলকাতায় আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল যে গো।' বলেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে প্রমত্ত হয়ে উঠল বিজলী। হাসির মাতামাতি একটু কমলে আবার বলল, 'শ্বশুরবাড়ির কথা থাক। বলছিলাম ধীরেশের কথা, তার ভেতর শ্বশুরবাড়ি ঢুকে পড়ল। ধীরেশ তো আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইল। আমি বললাম, 'কিন্তু—' ধীরেশ বলল, 'কিসের কিন্তু?' সংস্কারের খানিকটা তলানি তখনও আমার মধ্যে ছিল। ইতস্তত করে বললাম, 'সেখানে যে নিয়ে যেতে চাইছ কী পরিচয়ে তোমার কাছে থাকব?' আমার কথাটা যেন বুঝতে পারল ধীরেশ। বলল, 'কী পরিচয় থাকতে চাও, বল।' বললাম, 'যে-পরিচয়ে থাকলে কেউ অসম্মান করতে পারবে না।' ধীরেশ বিচিত্র হেসে বলেছিল, 'তার মানে বিয়ে করতে চাও?' মাথা নিচু করে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু—' ধীরেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে বলেছিল, 'আবার কী?' ভয়ে ভয়ে এবার বলেছিলাম, 'আমার আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সে-কথা তুমি তো জানো। হঠাৎ যদি কোনোদিন ওরা খুঁজে খুঁজে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন?' ধীরেশ বলেছিল, 'সে-সব আমি বুঝব'খন।' এবার অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিলাম, 'তা হলে আমাকে ছুঁয়ে বল, কলকাতায় গিয়েই আমাদের বিয়ে হবে।' ছোঁওয়াছুঁয়ির বিশ্বাসটা তখনও আমার ছিল। যা বলেছিলাম তা-ই করেছিল ধীরেশ।'

সুতরাং ধীরেশের সঙ্গে ভোগবাদের পীঠস্থান কলকাতায় চলে এল বিজলী।

কলকাতায় না গিয়ে উপায়ই বা কী? যে সাধনার যে ক্ষেত্র।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে সাধনার জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং উপকরণ প্রয়োজন। নতুবা সিদ্ধি অসম্ভব। শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধির জন্য যুদ্ধোত্তর কলকাতার মতো উপযুক্ত জায়গা আর কোথায় পাবে বিজলীরা?

বিশদ করে বলা যায়, ভোগের শক্তি প্রায় মাধ্যাকর্ষণের মতো। সেই দুরন্ত, বিপুল শক্তির টানেই সে কলকাতায় এল। তার পুরনো ধারণার ঈশ্বর শুশুরিয়ার মঠে মুখ গুঁজে নির্বাসিত হয়ে রইল।

কলকাতায় এসে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করল ধীরেশ। সেখানেই বিজলীকে রাখল সে।

তারপর শুরু হল ছোটা। উল্কার মতো উদ্দাম, বিরামহীন গতিতে দৌড়।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন পোশাক আর প্রসাধনের অজস্র উপকরণ আসতে লাগল। মাসে দু'বার করে চৌরঙ্গির অভিজাত হোটেলগুলোতে বিজলীকে নিয়ে যেত ধীরেশ। সেখানে নতুন ঈশ্বরের সন্ধানে ধীরে ধীরে পানপাত্রে চুমুক দিতে শিখেছিল বিজলী,

সঙ্গীর বাহুবন্দি হয়ে বল-রুমে নাচতে শিখেছিল। এবং সন্ন্যাসিনীর পক্ষে নিষিদ্ধ, এমন সব খাদ্যের আস্বাদ নিতে নিতে আত্মহারা হয়ে পড়তেও শিখেছিল। যে ঈশ্বরের যে মন্ত্র।

তবু প্রথম কিছুদিন সংস্কারের সেই তলানিটা মাঝে মাঝে বুকের অতল থেকে উঠে এসে তাকে চঞ্চলই করে তুলত। প্রায়ই সে বলত, 'এবার বিয়ের ব্যবস্থাটা কর।' ধীরেশ বলত, 'যাক না আর ক'টা দিন।' অবশেষে কবে যেন একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই বিয়ের কথাটা ভুলে গেল বিজলী। নতুন ঈশ্বর পুরনো সংস্কারের শেষ আবেগটুকুকে তার ভাবনা থেকে একেবারেই হরণ করে নিয়েছিল।

এই কলকাতা শহরে ধীরেশ তাকে নতুন ঈশ্বর দেখাতে এনেছিল। ধীরেশ জানত না, ভোগের পেছনে বিজলীকে লেলিয়ে দিয়ে কী মারাত্মক ভুলই না করেছে। তার বাবা শিশির বাসু আড়াই হাজার টাকা মাইনের বিরাট চাকুরে। ধীরেশও চাকরি করত। সে আমলের পক্ষে তার মাইনে ঈর্ষা করার মতো।

কিন্তু মাসান্তের এই টাকার অঙ্ক দিয়ে ভোগবাদের কতটুকুই বা মাপা যায়? ফ্ল্যাট ভাড়া, রান্নার বাবুর্চি এবং চাকরের মাইনে যুগিয়ে মাসে দু'বারের বেশি চৌরঙ্গির হোটেলে যাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ বিজলীর বুকের গুহায়িত অসহ্য তৃষ্ণাকে উসকেই দিতে পেরেছিল ধীরেশ। সেই তৃষ্ণাকে নির্বাপিত করার সাধ্য, সামর্থ্য তার ছিল না।

এদিকে নতুন ঈশ্বর ততদিনে বিজলীর আত্মাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে। চৌরঙ্গির হোটেলে যাবার জন্য প্রতিদিনই ধীরেশকে তাগিদ দিত সে। 'বার' ছাড়াও ফ্ল্যাটে বসে মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক করত। এর মধ্যে সিগারেটও ধরেছিল বিজলী। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল, ধমনীতে তামাকের ধোঁয়া এবং পাকস্থলীতে ফেনিল পানীয়ের ক্রিয়া শুরু না হলে রাতে ঘুমই আসত না তার।

কাজেই নির্বিচারে, প্রায় মরিয়া হয়ে চড়া সুদে টাকা ধার করতে লাগল ধীরেশ। ঋণে ঋণে সে যতই ডুবতে লাগল, বিজলীর তৃষ্ণা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ততই বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় গিয়ে ধীরেশ পৌঁছল যেখানে দাঁড়িয়ে লোকের কাছে আর হাত পাতা যায় না। চাকরি ছাড়া টাকা যোগাড়ের কোনো পথই তখন আর উন্মুক্ত নেই। মাসের শুরুতে পৌঁছে অফিস থেকে যে-টাকা সে নিয়ে আসত তার বিরাট একটা অংশই ধার শোধ করতে শেষ হয়ে যেত।

অতএব বিজলীর জীবনে ধীরেশের ভূমিকা প্রায় অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। এদিকে যত দিন যাচ্ছিল, রাহুগ্রাসের মতো নেশার অভ্যাসগুলো বিজলীকে পেয়ে বসছিল। প্রতিদিন নিয়মিত নেশার যোগান দিতে না পারলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত বিজলী। চিৎকার করত। অশ্লীল, কদর্য ভাষায় গালাগাল দিত।

কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়েই বা সমস্যার সমাধান কোথায়? যতই সে উত্তেজিত হত, ধীরেশ তার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সামর্থ্য নিয়ে ততই বিব্রত আর ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ত।

সুতরাং উন্মত্তের মতো নতুন একটা পথ খুঁজছিল বিজলী। অস্তিত্বের গহন কেন্দ্র থেকে যে নিদ্রিত তামসিক রিপুরা জেগে উঠেছে তাদের তৃপ্ত করা ছাড়া তখন আর মুক্তি নেই। নতুবা মন্ত্রে-জাগা পুরাণের সেই দৈত্যদের মতো তারাই তাকে শেষ করবে।

বিজলী বলতে লাগল, 'কী করব যখন কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না, সেই সময় সিতাংশু এল আমার জীবনে। লোকটা ধীরেশের বন্ধু। যুদ্ধের বাজারে কন্ট্রাক্টরি করে অজস্র টাকা করেছে। প্রায়ই ধীরেশের সঙ্গে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর সেই ফ্ল্যাটে আসত। যতক্ষণ থাকত, নিশি-পাওয়া মানুষের মতো কেমন এক আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমাকে দেখত। সে-দৃষ্টির মানে না বুঝবার কারণ ছিল না। একদিন ধীরেশকে ছেড়ে সিতাংশুর সঙ্গে পালালাম।'

বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'ধীরেশকে ছেড়ে গেলে!'

বিচিত্র হাসল বিজলী। বলল, 'হ্যাঁ, গেলাম। কেন জানো? ভেবেছিলাম ডানা যখন মেলেইছি ছোট আকাশে কেন, বড় আকাশই দেখি না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'এতদিন মনে হত, ধীরেশের জন্যেই আমি কলকাতায় এসেছিলাম। পরে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করলাম, ধীরেশ উপলক্ষ মাত্র। আমি এসেছি আমার নতুন ঈশ্বরকে দেখতে। ধীরেশ আমাকে সেই ঈশ্বরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। ভেতরে নিয়ে যাবার সাধ্য তার ছিল না।'

ধাতস্থ হতে আমার বেশ খানিকটা সময় লাগল। বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কি—' একটা সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার শেষাংশটুকু অ্যাশ-ট্রেতে গুঁজে আরেকটা ধরিয়ে নিল বিজলী। মৃদু একটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সিতাংশু আমাকে নিয়ে এল পার্ক স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাটে।'

পার্ক স্ট্রিটের অর্থাৎ কলকাতার সর্বাধিক উত্তেজক ভোগচর্যার এলাকা। সেখানে এসে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল।

প্রথম পাঠগুলি ধীরেশের কাছেই একরকম সেরে এসেছিল বিজলী। তবে তার মধ্যে না ছিল পরিকল্পনা, না শৃঙ্খলা, না কোনো সামঞ্জস্য। শাড়ি-গয়না-প্রসাধন দিয়ে আর মাঝে মাঝে হোটেলে-বারে গিয়ে জীবনের নতুন পর্বের মহড়া দিয়ে যাচ্ছিল সে।

পার্ক স্ট্রিটে এসে বিজলী বুঝল, দীক্ষা অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। মন্ত্রগুলির কিছুই প্রায় জানা হয়নি। নতুন ঈশ্বরকে জাগাতে আরো অনেক কিছুই তাকে আয়ত্ত করতে হবে।

সুশৃঙ্খল পথেই দীক্ষা শুরু হল।

প্রথমেই সিতাংশু তার জন্য একজন মেমসাহেব টিউটর রেখে দিয়েছিল। সে তাকে ইংরেজি বলতে এবং লিখতে শেখাবে। এই ভাষাটার ছাড়পত্র না পেলে যুদ্ধোত্তর যুগের কলকাতা ভোগের দুয়ারটা পুরোপুরি কোনোদিনই খুলে দেবে না।

সকালে ইংরেজি শিখত বিজলী। বিকেলে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মিউজিসিয়ানের কাছে পিয়ানো বাজানোর পাঠ নিত। আর সন্ধের পর চৌরঙ্গির হোটেল অথবা পার্ক স্ট্রিটের 'বার'গুলোতে যেত। এ ছিল প্রায় দৈনন্দিন এবং নিয়মিত।

কলকাতার মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটা কলকাতা ছিল। সেগুলো নাইট ক্লাব। সেখানে আদিম বেলেল্লাগিরির মধ্যে স্বচ্ছবসনা রক্তনখ বাঘিনীরা নাচত, অর্ধনগ্নিকারা সুইমিং পুলে জলকেলি করত, মাছের মতো সাঁতার কাটত।

এই দ্বিতীয় কলকাতাটা ছিল ধীরেশের নাগালের বাইরে। সিতাংশুর কিন্তু অবাধ গতিবিধি ছিল সেখানে। তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে বিজলী সে-সব জায়গায় যাবার সুযোগ পেত।

কিন্তু সিতাংশুও শেষ পর্যন্ত বর্জিত হল। কেন না, ততদিনে আরো বড় আকাশের সন্ধান পেয়ে গেছে বিজলী।

অবশেষে অনেক আকাশ ঘুরে এই বোম্বাইতে এসে পৌঁছেছে সে।

বিজলীর জীবনের এই চমকপ্রদ, বিচিত্র ইতিহাস শুনতে শুনতে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। উপাদেয় ভোজ্যগুলি টি-পয়ের ওপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধোঁয়া উড়িয়ে উড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটা শীতল হয়ে গেছে।

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল বিজলী, 'এ কি, কিছুই যে খাও নি!' বলতে বলতে কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে যেন চমকেই উঠল, 'কী সর্বনাশ, একটা বেজে গেছে! থাক থাক, ওগুলো আর খাওয়ার দরকার নেই। চান টান সেরে এসেছ তো?'

'না।' অস্ফুট স্বরে বললাম।

'তা হলে এখানেই সেরে নাও। তারপর চল, লাঞ্চ খেয়ে নিই।'

আরামদায়ক বাথ-টাবে স্নান সেরে একরকম ঘোরের মধ্যেই ডাইনিং-রুমে খেতে গেলাম।

খাওয়ার ব্যবস্থা চেয়ার-টেবলে, নিখুঁত সাহেবি কেতায়। টেবলের ওপর চামচ ছুরি-ফর্ক-প্লেট এবং কয়েকটি সাদা ন্যাপকিন চমৎকারভাবে সাজানো ছিল।

খাবারগুলোর কোনোটাই বাঙালি রুচি অনুযায়ী নয়। পোলাও, ফ্রাই, সসেজ, মাস্টার্ড, পুডিং, রোস্ট, কোর্মা এবং সুপ। বিলিতি মেনুর সঙ্গে কিছু মোগলাই আমেজ মিশিয়ে তালিকাটাকে একেবারেই বর্ণসংকর করে ফেলা হয়েছে।

দেখতে দেখতে পরিবেশটা প্রায় বিস্মৃতই হলাম বুঝি। বর্ধমান জেলার সুদূর অভ্যন্তরে শুশুরিয়া নামে সেই অখ্যাত গ্রামের একটি মেয়ের কথা বার বার আমার চেতনায় হানা দিতে লাগল। সেই ঈশ্বরগামিনী মঠযাত্রিণী মেয়েটা। একবেলা প্রায় হবিষ্যান্নই করত সে। রাতে অধিকাংশ দিনই নির্জলা উপোস দিয়ে কেটে যেত।

আশ্চর্য, সেই বিজলী অদ্ভুত তৃপ্তির সঙ্গে অক্লেশে, অনায়াসে নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে চলেছে।

খেতে খেতে সে ডেকে উঠল, 'ললিতদা—'

'বল—' আমি উন্মুখ হলাম।

'জানো ভাই, সে এক ভারি মজার ব্যাপার—'

'কী?'

বিজলী বলল, 'সিতাংশুর সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের সেই ফ্ল্যাটে তো গেলাম। কেমন করে যেন ধীরেশ ঠিকানাটা যোগাড় করে ফেলেছিল।'

আমি চকিত হয়ে উঠলাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কি।' মৃদু হাসল বিজলী। বলল, 'সিতাংশু যখন থাকত না, প্রায়ই সেখানে আসত সে। চেহারাটা ইতিমধ্যে ভেঙে গিয়েছিল তার। এমনিতে নিখুঁত বাবু মানুষ ধীরেশ। কিন্তু সে-সময় লক্ষ করতাম, দাড়ি বেশির ভাগ দিনই কামানো থাকত না, চুলগুলো এলোমেলো বিশৃঙ্খল, জামা-প্যান্ট ময়লা, জুতোয় কতকাল যে কালি পড়েনি। দৃষ্টি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। দেখেই বোঝা যেত, খাওয়া-দাওয়া-ঘুম-বিশ্রাম, কোনো কিছুই তার নিয়মমতো হচ্ছে না। হয়তো খায়ই না, নয়তো রাতের পর রাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। নইলে আমি তো এসেছি মাত্র কয়েকটা দিন। এর মধ্যে শরীর এত ভাঙে কী করে?' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল বিজলী। এতক্ষণ আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা দূরের অ্যাকোয়েরিয়ামটার ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হল। কেমন দূরমনস্কের মতো দেখাতে লাগল তাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্লেটের খাবারগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। এই মুহূর্তে কী যে বলা এবং কী যে করা উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ পর বিজলীই স্তব্ধতা ভাঙল। নিশি-পাওয়া কেমন এক গলায় বলতে লগল, 'যাই হোক, প্রথম যেদিন ধীরেশ এল, রীতিমতো ভয়ই পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, পালিয়ে এসেছি বলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিহিংসায় মানুষ যে কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার কিছু কিছু কাহিনী আমার জানা ছিল। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনোরকমে চাপা রুদ্ধ গলায় বলতে পেরেছিলাম, 'কী, কী চাও তুমি এখানে?'

অদ্ভুত, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বিজলীর দিকে তাকিয়েছিল ধীরেশ। সে-দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবটুকু যন্ত্রণাই বুঝি পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল। আস্তে আস্তে চাপা অসহ্য গলায় সে শুধু বলতে পেরেছে, 'তুমি ফিরে চল।'

'কোথায়?'

'আমার সঙ্গে। আমার কাছে থাকবে। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

বিজলী অবশ্য ফেরেনি। তখন সে অন্ধ। জগৎ নয় সংসার নয়, তার চেতনা-ভাবনা-অস্তিত্ব, তার বিচার-বিবেচনা এবং ইন্দ্রিয়ের সকল দিকই ভোগবাদী ঈশ্বরের দখলে। সেই দিনটির পর বার বার আসত ধীরেশ। ফিরে যাবার জন্য অনুনয় করত। বলত, 'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। ফিরে চল। আমাকে দয়া কর।'

বিজলী উত্তর দিত না। প্রথম দিন ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তার। পরে বিদ্যুৎচমকের মতো তীব্র কৌতুকের একটি রেখা তার দুই ঠোঁটে মুহূর্তের জন্য বিচ্ছুরিত হয়েই অদৃশ্য হয়ে যেত। আর হতাশ, ব্যর্থ, পরাভূত একটা পশুর মতো পা টেনে টেনে ঘাড় গুঁজে ফিরে যেত ধীরেশ।

ধীরেশ যত ভেঙে পড়ছিল ততই উদ্দাম হয়ে উঠছিল বিজলী। তার মদের মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। নাইট ক্লাব, বার এবং হোটেলে যাতায়াত চলছিল উন্মত্তের মতো।

আর বিজলীর মত্ততা যত বাড়ছিল, সেই সংহারমূর্তি দেখে ততই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল

ধীরেশ। বিজলীর এই রূপান্তর তার পক্ষে অভাবনীয়। একদিন ভোগবাদের দীক্ষা দিতে বিজলীকে বর্ধমানের দূর দিগন্ত থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। ধীরেশ জানত না, যে হাউইটাকে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে তার মধ্যে কতখানি বারুদ ঠাসা ছিল আর কতদূর সেটা ছুটতে পারে।

বিজলী যখন সত্যিই ফিরল না, ধীরেশ বোঝাতে লাগল, 'এমন করে সুইসাইড করো না বিজলী। নিজের ওপর কী অত্যাচার চালাচ্ছ, তা কি জানো? ভেবে দেখ, বর্ধমানে থাকতে, কোথায় যেতে চেয়েছিলে আর কোন নরকের তলায় এসে ঠেকেছ! নিজের আত্মাকে কীভাবে ঠকাচ্ছ, ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখ।'

বিদ্রূপে ঠোঁটদু'টি বেঁকে গিয়েছিল বিজলীর। বুঝিবা অব্যক্ত এক ঘৃণায় শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী কুঁচকে গিয়েছিল। সে বলেছিল, 'আত্মা! নরক! সুইসাইড! অত্যাচার! শুশুরিয়া থেকে যখন নিয়ে আসো তখন ভাবতেও বুঝি পার নি, এই অবস্থা হবে! নিজের ক্ষুধিত অস্তিত্বের বেগে উল্কার মতো ছুটছি ধীরেশ। যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখান থেকে আর ফেরা যায় না।'

রুদ্ধস্বরে ধীরেশ বলেছিল, 'বেশ তো, আমার কাছে ইচ্ছা না হলে ফিরো না। তবে যেভাবে চলছ সেটা বন্ধ কর। এখনও বাঁচার পথ আছে।'

'বাঁচার পথ! সেটা আবার কী!' বিজলীর গলায় ব্যঙ্গ ঝলকে উঠেছিল।

'দেশে ফিরে যাও বিজলী। সেখানে তোমার সেই পুরনো বিশ্বাসের মধ্যে বাঁচার পথ আছে।' ধীরেশ বলেছিল।

বিজলী বলেছিল, 'আমার জন্যে তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। তুমি যাও, বার বার কষ্ট করে আর এস না।'

না এসে কিন্তু পারেনি ধীরেশ। বিজলীর জন্য দুর্ভাবনার শেষ ছিল না তার। নিষেধ সত্ত্বেও বিজলীর চিন্তাই দিবারাত্রি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এদিকে আবার হস্তান্তরিত হয়ে গেছে বিজলী। বরং বলা উচিত স্বেচ্ছায় পোশাক বদলের মতো সঙ্গী বদল করেছে। সিতাংশুর দখল থেকে সে গেছে মিস্টার পারেখ নামে এক গুজরাটি ধনকুবেরের কাছে। সেখানে কয়েক মাস কাটিয়ে সাহানি নামে এক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের লীলাসঙ্গিনী হয়েছিল। তারপর মিস্টার শর্মা, সচদেব, ব্যানার্জি—এমন কত পতঙ্গ যে তার জীবনে এসেছে, বিজলী সবাইকে মনে করতে পারে না।

সিতাংশু, পারেখ, সাহানি বা শর্মা, এরা সবাই রঙিন বুদ্বুদের মতো ফুটে উঠেই তার জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিজলীর প্রাণের গভীরে কেউ এতটুকু রেখাপাত পর্যন্ত করতে পারেনি। সেটা অকারণে নয়। এই মানুষগুলি ক্ষণিক বিলাসের একটি জীবন্ত উপকরণ হিসাবেই গ্রহণ করেছিল তাকে। আর বিজলীর কাছে তারাও ছিল সোপান মাত্র। তার নতুন ঈশ্বরের কাছে পৌছবার জন্য ক'টি সিঁড়ি।

সিতাংশু, পারেখ, শর্মা—শুধু ক'টি নাম হয়েই মানুষগুলো তার স্মৃতিতে টিকে আছে। এ ছাড়া তার ভেতরে বা বাইরে, মুক্ত-বন্ধের কোনোদিকেই তাদের কোনো ছায়া নেই।

সবাইকেই প্রায় ভুলেছে বিজলী। কিন্তু ধীরেশকে তার স্মৃতি থেকে নির্বাসনে পাঠাতে পারেনি।

যতদিন বিজলী কলকাতায় ছিল, ব্যানার্জি-সাহানি-শর্মা—যার কাছেই গেছে, ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করেছে ধীরেশ। তার সুঠাম সুন্দর উজ্জ্বল স্বাস্থ্য আগেই ভেঙে পড়েছিল। ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ পর্যন্ত ভগ্নস্তূপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। মাথার তেলহীন চুলগুলো রুক্ষ, মুখে বহুকালের সঞ্চিত দাড়ি, অন্যমনস্ক নিষ্প্রভ দু'টি চোখ বিবরের মধ্যে। ধ্বংসের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল ধীরেশ।

যেখানে যেখানে বিজলী গিয়েছিল সেখানেই হানা দিত ধীরেশ। গিয়ে একটিই মাত্র কথা বলত, 'আমি তোমার সর্বনাশ করলাম বিজলী। মঠের ঈশ্বর নিয়ে ছিলে, সেই বিশ্বাস আর শান্তির মধ্যে থাকলেই ভাল হত। কেন যে তোমাকে কলকাতায় আনতে গেলাম!' নিদারুণ এক অপরাধবোধে এবং অনুতাপে দু'হাতে মুখ ঢাকত ধীরেশ।

কলকাতা থেকে ভাসতে ভাসতে একদিন বোম্বাই চলে এল বিজলী। এখানে এসে ধীরেশকে আর দেখা যায়নি। হয়তো আরব সাগরের এই কূলের ঠিকানা যোগাড় করে উঠতে পারেনি সে।...

প্রায় এক নিশ্বাসেই কথাগুলো বলে গেল বিজলী। আমি ললিত চৌধুরি, শুনতে শুনতে অভিভূত অথবা বিহ্বল, বিস্মিত বা ভারাক্রান্ত—আমার চেতনা ঠিক যে কী হয়ে গেছে, জানি না। খাওয়ার কথা আর খেয়ালই ছিল না।

বিজলী হঠাৎ তাড়া লাগাল, 'ও কি, হাত চলছে না কেন? খাও—'

'হ্যাঁ, খাচ্ছি।' চমকে উঠে খাবারে মনোযোগ দিলাম।

মাছের ফ্রাই থেকে একটা টুকরো কেটে মুখে পুরতে পুরতে বিজলী বলল, 'চার বছর বোম্বাইতে এসেছি। এর মধ্যে ধীরেশকে দেখিনি। এক-এক সময় কী ইচ্ছে হয় জানো?'

'কী?'

'আমার সেই মন্ত্রগুরু, যার কাছে প্রথম ভোগবাদের দীক্ষা নিয়েছিলাম, আজকাল কী করছে, কীভাবে তার দিন কাটছে, একটু জানি।' বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেল বিজলী। কিছুক্ষণ কী ভেবে আবার শুরু করল, 'জানো ললিতদা, বম্বেতে চলে আসার আগে শুনেছিলাম ধীরেশ চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। দিনরাত নাকি পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বোধ হয়—'

'কী?'

'বোধ হয় ধীরেশ আমাকে ভালই বেসে ফেলেছিল।' বলে বিজলী খিল খিল করে হেসে উঠল, 'বেচারা!'

তার শেষ কথাগুলি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম না। ধীরেশের কথাই ভাবছিলাম। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল ধীরেশ। বিজলীর মতোই তাকে দেখবার একটা অদম্য ইচ্ছা একটু একটু করে আমাকে পেয়ে বসছিল।

পাঁচ

পার্শি কলোনিতে বিজলীর ঠিকানায় আরো অসংখ্য বার আমি এসেছি। এতকাল আমার সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল মেরিন ড্রাইভ আর ছিল আমার ঘরের সেই তিন শরিক—সুধাংশু, গণেশ এবং রজত। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্য সব দিন অফিসের খাঁচা থেকে মুক্তি পেলেই উর্ধ্বশ্বাসে মেরিন ড্রাইভে ছুটে যেতাম। আর রবিবার কি অন্য ছুটির দিনগুলো আমার কাটত সুধাংশুদের নিয়ে।

প্রতিটি ছুটির দিন আমাদের একই নিয়মে কেটে যেত। উত্তর শহরতলির আমরা চার বাসিন্দা—গণেশ, সুধাংশু, রজত আর আমি—জীবিকার জন্য একপথে হাঁটি না। সবারই ভিন্ন ভিন্ন পেশা। প্রকৃতিও আমাদের এক নয়। ওরা তিনজন স্বভাব-পলাতক, স্বভাব-যাযাবর। ঘর-পালানোর একটা নেশা জন্মমুহূর্ত থেকেই ওদের রক্তের মধ্যে বোধহয় ছিল। সেটাই নিয়ত ওদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত।

আমার প্রকৃতি কিন্তু বিপরীত। মাঝে মাঝে একটু আধটু বেড়ানো ছাড়া ঘরের নিভৃত কোণটিতে চুপচাপ বসে থাকতেই এতকাল ভালবাসতাম। কিন্তু সুধাংশুরা আমার স্বভাবের সকল দিকে ঝড়ো বাতাস ছুটিয়ে দিয়ে সেটাকে একেবারেই বদলে দিয়েছে। ঘরে যে বসে থাকব, সুধাংশুদের জন্য তার কি উপায় আছে! অতএব এতকাল ছুটির দিনের ভোরে ঝোলায় কিছু খাবার-দাবার পুরে ওদের সঙ্গে আমিও ছুটতাম খার স্টেশনে। সেখান থেকে ফার্স্ট ট্রেন ধরতাম। শহরতলির সর্বশেষ স্টেশনটাই আমাদের গন্তব্য। গেটে টিকিট জমা দিয়ে বেরিয়ে পড়তাম সেইখানে যেখানে মহারাষ্ট্রের পাহাড় বা প্রান্তরগুলি দিগন্ত পর্যন্ত উধাও।

মানুষ নাকি নির্জনতায় যায় নিজেকে খুঁজতে। আমরা আত্মসন্ধানী নই। কোনো দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজেও ঘরের বাইরে আমরা পা বাড়াতাম না। সারাটা সপ্তাহ জীবনধারণের জন্য ছুটে ছুটে আমরা ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। ছুটির দিনে বাইরের হাতছানিতে আমাদের প্রাণে দক্ষিণা বাতাস বয়ে যেত। সে ডাককে অস্বীকার করব, সাধ্য কী।

তা ছাড়া বোম্বাইয়ের ইট-কাঠ-পাথরের পিঞ্জরে সমস্ত সপ্তাহ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকতাম। ছুটির দিনে প্রকৃতির সীমাহীন বিস্তারের মাঝখানে বুক ভরে শ্বাস টেনে বাঁচার চেষ্টা করতাম।

নইলে কী এমন! মহারাষ্ট্রের সেই পাহাড়ে প্রান্তরে তেমন কোনো বিস্ময়ই নেই। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু টিলা আর টিলা। রক্তাভ, কর্কশ মাটি চড়াই-উতরাইতে তরঙ্গিত হয়ে আছে। সবুজের আভাস নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে এক-আধ চাপড়া হলদে রঙের ঘাস, মরা-মরা কন্টিকারি আর ফণীমনসার ঝাড়। দূর দিগন্তকে বেষ্টন করে ধোঁয়ার দৈত্যের মতো উঁচু উঁচু পাহাড়। প্রকৃতি এখানে প্রসূতি নয়, বন্ধ্যা। মহারাষ্ট্রের সেই প্রান্তরগুলোতে তান্ত্রিক পৃথিবী যেন ধ্যানে বসেছে।

বাংলা দেশের শ্যামল সমারোহ এখানে কোথায় পাব! সেজন্য কোনো ক্ষোভ নেই। আমাদের যেটুকু আছে তা-ই নেড়েচেড়েই আমরা খুশি।

না-ই বা রইল ধানের খেতে উতল বাতাসের লুটোপুটি, না-ই শুনলাম বাঁশবনের গভীর থেকে উঠে আসা ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত বিলাপ, না-ই বা দেখলাম সবুজ ঘাসে মাটিকে রোমাঞ্চিত হয়ে থাকতে, তবু এখানকার বিশাল মাঠে ঘাটে পাহাড়ে অবাধ মুক্তি। এটুকুই আমাদের পরম পাওয়া। রোদে গা ডুবিয়ে আমরা চারটে ঘর-পালানো যুবক আপন খুশিতে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াতাম।

আমরা হাঁটতাম আর হাঁটতাম। হাঁটতে হাঁটতে কোনোদিন দূরের পাহাড়গুলোতে চলে যেতাম। সেখানে হয়তো আদিবাসীদের নগণ্য একখানা গ্রাম কি ছোট্ট একটা ঝরনা আবিষ্কার করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম। কোনোদিন অতদূরে যেতাম না। টিলার ছায়ায় গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকতাম। তাস নিয়ে গেলে তা-ই দিয়ে আসর জমাতাম। নয়তো গল্পসল্প করতাম কিংবা চুপচাপ দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। তারপর প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে রোদ আর বাতাস লুট করে সন্ধে বেলায় ফেরার ট্রেন ধরতাম।

ছুটির দিনে প্রকৃতির মাঝখানে পালিয়ে যাওয়া আমাদের নিয়মে বা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেরিন ড্রাইভে বিজলীকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিন থেকেই বোধ হয় এতদিনের অভ্যাসটাকে বিস্মৃত হতে শুরু করেছি। আমার প্রাণের দেখা অ-দেখা সকল দিকেই এখন একটিমাত্র জপমন্ত্র—পার্শি কলোনি, পার্শি কলোনি, পার্শি কলোনি। পার্শি কলোনি ছাড়া আর কোনো দিকেই ইদানীং আমার চোখ ফেরাবার অবকাশ নেই।...

বিজলী নয়, মনে হয়েছে বিচিত্র এই যুগটা বার বার হাতছানি দিয়ে আমাকে পার্শি কলোনিতে টেনে নিয়ে গেছে। সে হাতছানি নিশির ডাকের মতো অমোঘ, মাধ্যাকর্ষণের মতো প্রবল। অপ্রতিরোধ্য সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের বাইরে।

এখানে পশ্চিম উপকূলের এই শহরে কার সঙ্গিনী হয়ে বিজলী আছে, জানি না। হাজার চেষ্টা করেও তা জানতে পারিনি। যখনই পার্শি কলোনিতে গেছি, বয়-বাবুর্চি বাদ দিলে বিজলীকে একলাই দেখেছি। ভেতরে ভেতরে আগ্রহ যদিও দুর্দম হয়ে উঠেছে, তবু তার সঙ্গী সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি। কৌতূহলটা ঠোঁটের প্রান্তে এসে থমকে গেছে। আমার অনুমান, মেরিন ড্রাইভে তার সঙ্গে যে সুদর্শন লোকটিকে দেখেছিলাম, এখানে সে-ই তার ভোগ-বাসনার আর এক শিকার। সম্ভবত বিজলী তার সঙ্গেই আছে।

বিজলীর এই দিকটা আমার অজ্ঞাত হলেও আরো কয়েকটা দিক কিন্তু একেবারেই উন্মুক্ত। সে-সব জায়গায় কোনো গোপনতা নেই। এই দিকগুলোতে আছে তার প্রত্যহের অভ্যাস, তার দিনযাপনের ভালমন্দ, গ্লানি এবং গৌরব, আলো আর অন্ধকার।

নিজের প্রাত্যহিকতা সম্বন্ধে অকপটে অনেকখানি স্বীকারোক্তিই করেছে বিজলী। আমিও কিছু কিছু দেখেছি। যা দেখেছি তার দশ গুণ করেছি অনুমান।

কলকাতায় থাকতেই নেশার অভ্যাসটা নিদারুণ করে তুলেছিল বিজলী। সিগারেট তো অনবরতই খায়। একটা শেষ হয়ে এলে তার আগুনে আর একটা ধরিয়ে নেয়। আগে রাতের দিকে ড্রিঙ্ক করত। ফেনিল আগ্নেয় তরল পাকস্থলীতে গিয়ে ক্রিয়া না করলে ঘুমই আসত না। আজকাল সকালে বিয়ার, দুপুরে শেরি, বিকেলে হুইস্কি দরকার। তার ওপর রাতের বরাদ্দ তো আছেই। দু-এক দিন তাকে চীনাদের মতো চরস খেতেও দেখেছি। চোখে দেখিনি তবে তার মুখেই শুনেছি, মাঝে মাঝেই নাকি পিনিক খায়।

এ তো গেল নেশার দিক। যে-কোনো রুচির আহার্যই হোক না, কোনো কিছুতেই বিজলীর বিরাগ নেই। হবিষ্যান্ন করত যে সন্ন্যাসিনী, সবরকম মাংসের প্রতিই এখন তার অসীম অনুরাগ। বিশেষ করে মুরগি। সন্ন্যাসের ব্যাকরণে এই নিষিদ্ধ পাখিটি ছাড়া তার খাদ্য তালিকা ভাবাই যায় না।

শুধু কি তা-ই, নেশার মতো জুয়াতেও তার প্রচণ্ড আসক্তি। আমি গেলেই তাস সাজিয়ে বসে বিজলী। বলে, 'এস, দু'বাজি খেলা যাক।' বলেই একরাশ নোট আর রেজগি আমার দিকে ঠেলে দেয়। আমার পকেটের অবস্থা তার অজানা নয়। সামান্য কয়েক শ' টাকা মাইনের চাকুরের পক্ষে জুয়া খেলার টাকা যোগানো অসম্ভব। অতএব বাজি ধরার জন্য সে টাকা দেয়। খেলার শেষে সে-সব অবশ্য ফিরিয়ে দিই।

কুণ্ঠিত মুখে বলি, 'এমনিই নম্বর লিখে খেলি এস না। আবার টাকাপয়সা কেন?'

'আরে দূর—' আমার কুণ্ঠা এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে বিজলী বলে, 'দেখ ললিতদা, কামগন্ধ নেই এমন প্রেমে আমি বিশ্বাস করি না। বিনা পয়সায় জুয়া খেলা —না-না, অমন পানসে ব্যাপারে আমি নেই—'

'কিন্তু—' আমার দ্বিধাটা তবু কাটতে চায় না।

'আবার কী?' অসহিষ্ণু সুরে বিজলী জিজ্ঞেস করে।

'বলছিলাম, এভাবে খেলে লাভ কী? তোমার পয়সা দিয়েই তো বাজি ধরব।'

'আমারই হোক আর যারই হোক, তবু তো আঁশের গন্ধ থাকবে একটু। নিরামিষ ব্যাপার আমার চলবে না। নাও ভাই তাস বেঁটে ফেল, আর তক্কো করে যন্ত্রণা বাড়িও না।'

তাসের জুয়া তো আছেই, শনিবার হলেই মহালছমীর রেসকোর্সে সে ছুটবেই। দু-একদিন জোর করে আমাকে ধরেও নিয়ে গেছে। নিতান্ত পার্শ্বচর হিসাবেই তার সঙ্গে থেকেছি। লক্ষ করেছি, শেষ বাজি না ধরে মহালছমী থেকে সে ফেরে না।

রেস-জুয়া বাদ দিলে তার অভ্যাসের আরো কয়েকটি অংশ অবশিষ্ট থাকে। প্রথমত, উত্তেজক অপরাধ-কাহিনী আর বাছা বাছা বিদেশি পর্নোগ্রাফি পড়া। কাহিনীগুলো এমন যা তীব্রস্বাদ ফেনায়িত তাড়ির মতো স্নায়ুকে চড়া তারে বেঁধে রাখে। দ্বিতীয়ত, বোম্বে-পুণা রোড ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে মোটর-ছোটানো। ঘণ্টায় ষাট মাইলের নিচে গতি হলে ড্রাইভারের নিস্তার নেই। কোনো কোনো দিন সালোয়ার-পাঞ্জাবি কি শর্ট পরে স্কুটার নিয়ে একা একাই সে বেরিয়ে পড়ে। কখনও বা অকারণেই প্লেনে উঠে দিল্লি কি কলকাতা টহল দিয়ে আসে। যে প্লেনে যায়, কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে অন্য প্লেনে ফেরে।

বিজলী প্রায়ই বলে, 'জানো ললিতদা, একটা কিছু এক্সাইটমেন্ট না হলে আমার চলে না। মাই ডে'জ মাস্ট বী ফিল্ড উইদ থ্রিলস অ্যান্ড এক্সাইটমেন্টস। এ ছাড়া আমার জীবন অচল।'

আসল কথা, বিজলী-চরিতের সকল স্তরেই এখন শুধু উত্তেজনা, প্রবল প্রখর চরম উত্তেজনা। কোনোদিকে, কোনো প্রান্তে প্রশান্তি বা স্নিগ্ধতার লেশমাত্র নেই।

শুশুরিয়া তার জীবনটাকে একটা সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে পুরে একেবারে সীল করে দিয়েছিল। বোম্বাই সেই দুর্গটাকে ভেঙে চুরে তাকে বার করে এনে প্রচণ্ড স্রোতে ছুঁড়ে

দিয়েছে। বিজলীর শিরা-স্নায়ু এবং ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের খরস্রোত, সবই এখন দুরন্ত বেগে ছুটছে। যা কিছু নরম এবং উত্তেজনাহীন, সে-সবই তার জীবন থেকে চিরদিনের মতো নির্বাসিত হয়েছে। সম্ভবত বিজলী এতদিনে তার নতুন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

দু'মাস ধরে বিজলীর কাছে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে নিয়মিত হানা দিচ্ছি। তার প্রতিদিনের অভ্যাস, তার দিনযাপনের পদ্ধতি, চলফেরা, ওঠাবসা, খাদ্যরুচি, নেশা—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই লক্ষ করে গেছি। তবু মনে হয়েছে এ তো বাহ্য, এ-সবই বাইরে থেকে চোখে পড়ে। গুহাগোপন ধারার মতো ভেতর দিকে এমন আরো কিছু তার আছে যা আমার অজানা। নিজের অনেক দিকের অনেক যবনিকা বিজলী তুলে ধরেছে। তবু কোথায় যেন নিরেট একটা দেওয়াল তার মধ্যে মাথা তুলে রয়েছে। আমি সেই পর্যন্তই এগোতে পেরেছি। দেওয়ালটার ওপারে কোথায় কী আছে, জানি না।

এসব আমার অহেতুক মনে হয়নি। যখনই পার্শি কলোনিতে আসি, সারাটা দিনই কাটিয়ে যাই। আপ্যায়নে আদরে বিজলী একেবারে নিখুঁত। কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই তার। না খাইয়ে একদিনও ছাড়ে না। সব দিকেই অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে বিজলীর, কিন্তু একটা ব্যাপারে শুশুরিয়া মঠগামিনী গ্রাম্য মেয়েটার সামান্য একটু ছায়া এখনও যেন যাই-যাই করেও যেতে পারেনি।

প্রথম যেদিন পার্শি কলোনিতে আসি সেদিন থেকেই লক্ষ করেছি, বিকেল হলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে বিজলী। তারপর একটা মুহূর্তও সে আমাকে তার ফ্ল্যাটে থাকতে দিতে চায় না। যে কোনো অজুহাতে কিংবা কৌশলে বিদায় করে দেয়। অবশ্য কৌশলগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সৌজন্য আর শোভনতা মেশানো থাকে। হাসতে হাসতে কোনোদিন সে বলে, 'যেরকম মতিগতি তোমার দেখছি ভাই ললিতদা, তাতে তোমাকে মোটেও বিশ্বাস নেই।'

আমার স্বভাব সম্বন্ধে বিজলী কোন গূঢ় গহন ইঙ্গিত দিতে চায়, বুঝতে না পেরে চমকে উঠি। কাঁপা গলায় শুধোই, 'কি রকম?'

'তুমি নিজেই ভেবে দেখ না।' আমার সমস্ত চেতনাকে দুলিয়ে দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে বিজলী। শুধু দু'চোখ কৌতুকে ঝলকাতে থাকে তার।

আর কিছুই ভেবে না পেয়ে বিপন্ন মুখে নিশ্চুপ বসে থাকি।

আমার দিকে তাকিয়ে বুঝিবা করুণাই বোধ করে বিজলী। বলে, 'আরে বাপু, সোজা কথাটা বুঝতে পারছ না? এতকাল মেরিন ড্রাইভ আর তোমার ঘরের সেই ছেলেদের নিয়ে মেতে ছিলে। যেই আমাকে দেখলে অমনি সে-সব বেমালুম ভুলে গেলে। ভাগ্যিস বিয়ে-টিয়ে করনি। বউ বেচারির মরণ ছিল তা হলে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। বিজলীকে নতুন করে আবিষ্কার করার পর থেকে মেরিন ড্রাইভ আর সুধাংশুদের যেন ভুলতে বসেছি। পার্শি কলোনির এই ফ্ল্যাট প্রতি মুহূর্তে আমাকে দুরন্ত আকর্ষণে টানতে থাকে। জাগরণে কি নিশার স্বপনে, বিজলীর বিচিত্র বেগবান জীবন সর্বক্ষণ আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। জিজ্ঞেস করি, 'বউ বেচারির মরণ ছিল কেন?'

'কেন নয়, তা-ই বল। ঘরে বউ রইল, এদিকে আর কারওকে দেখে হয়তো খেপে উঠলে, বউটার কথা ভুলে গেলে। তার অবস্থাটা তখন কী দাঁড়ায় চিন্তা করে দেখ। সে যাক, কতদিন মেরিন ড্রাইভে যাও না?'

'তা দিন পনের।'

'ওঠ, ওঠ—শিগ্‌গির উঠে পড়।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিজলী, 'আজ একবার মেরিন ড্রাইভে যাও। পনের দিন ওদিকে মাড়াও নি, বেচারা নিশ্চয় গোসা করে আছে।' আমাকে উঠিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয় সে।

কোনোদিন বা বিজলী বলে, 'সেই সকালবেলা এসেছ, এখন বিকেল হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তোমাকে আটকে রেখেছি। ইস, একেবারে খেয়াল ছিল না। না জানি তোমার কত ক্ষতি করে দিলাম!'

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না-না, ক্ষতি কিসের। আজ আমার কোনো কাজ নেই।'

'আহা, ক্ষতি হলে মুখ ফুটে তুমি স্বীকার করবে বুঝি? তোমার স্বভাব যেন আমি জানি না? না-না, তোমাকে আর একদণ্ডও আটকে রাখব না। নাও, উঠে পড়। নিজের কাজ নষ্ট করা ঠিক নয়।'

সত্যিই যে আমার কোনো কাজ নেই, এই কথাটা হাজার ব্যাখ্যা করেও বিজলীকে বোঝাতে পারি না। অবশ্য যে প্রতিজ্ঞা করেছে বুঝবে না, তাকে বোঝানো অসাধ্য ব্যাপার। আসল কথা, বিকেল পার হয়ে দিনটা যখন সন্ধের দিকে ঢলতে থাকে তখন আর এক মুহূর্তও এখানে আমার উপস্থিতি বিজলীর কাম্য নয়। অতএব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে বিদায় নিতে হয়।

দিনের বিজলীকে প্রায় পুরোপুরিই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু রাতের বিজলী আমার কাছে এক অনাবিষ্কৃত রহস্য। সে রহস্যের অন্তঃপুরে ঢুকতে পারি, এমন কোনো দুয়ার কোনোদিকেই খোলা নেই।

ছয়

পার্শি কলোনির সেই ঠিকানাটা আমার সকল সত্তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে। দু' মাস ধরে প্রায়ই সেখানে হানা দিচ্ছি। ছুটির দিনগুলোতে তো বটেই। আমার এগার বছরের চাকরি জীবনে কখনও কোনো ছলেই যা করিনি, ইদানীং তাই করতে শুরু করেছি। আফিস পালিয়ে প্রায়ই বিজলীর কাছে ছুটছি।

আজ রবিবার, ছুটির দিন।

আশৈশব ভোরে স্নান করা আমার অভ্যাস। এ-অভ্যাসের কোনোদিন ব্যতিক্রম হয়নি। আজও ঘুম থেকে উঠে 'চাওল'-এর বারোয়ারি টিউব ওয়েলে স্নান সেরে নিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার ঘরের আর তিন বাসিন্দা, গণেশ রজত আর সুধাংশু এখনও ঘুমোচ্ছে।

চিরদিনই ওরা নিদ্রাবিলাসী। জীবনে ক'টা দিন সূর্যোদয় দেখেছে, হাতের আঙুলে গুনে

বলতে পারে। রোজ আমার কখন ঘুম ভাঙে কখন স্নান সেরে আসি, টেরও পায় না ওরা ঘুমের আরকে তখনও ডুবে থাকে।

আজও ঘরে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ সুধাংশু জেগে উঠল। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর চোখ রগড়াতে রগড়াতে ক্ষিপ্র গতিতে উঠে বসল। দশটা খুনের আসামীকে যেন পাকড়াও করে ফেলেছে এমন উল্লসিত সুরে বলে উঠল, 'ধরেছি!' বলেই লাফ দিয়ে গণেশ আর রজতের বিছানায় গিয়ে পড়ল। এবং হাত ধরে টেনে দু'জনকে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ, দেখে চোখ সার্থক কর।'

ঘুমের ঘোরটা মুহূর্তে ছুটে গেল। চোখ ডলতে ডলতে গণেশ আর রজত বলল, 'তাই তো—' দু'জনের গলার স্বরে এবং চোখমুখে বিস্ময়।

বিস্ময়টা অকারণে নয়। বিজলী আসার পর ছুটির দিনের ভোরে রজতরা জাগবার আগেই স্নান চুকিয়ে পার্শি কলোনিতে চলে যাই। এতদিন ওদের দৃষ্টি এড়িয়েছি, পালিয়ে বেড়িয়েছি কিন্তু আজ প্রথম ধরা পড়ে গেলাম।

সুধাংশু রজতের পিঠে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'আকাশের দিকে আজ তাকিয়েছিস?'

সুধাংশু কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে বিমূঢ় গলায় রজত বলল, 'না, কেন?'

'যা না, দেখে আয়।'

'তুই তো দেখেছিস। বল না—'

বহু-ব্যবহৃত সেই পুরনো রসিকতাটা করে বসল সুধাংশু, 'সূর্য আজ পশ্চিমে উঠেছে। নইলে ঘুম ভেঙে আজকাল ছুটির দিনে ওই চাঁদমুখ দেখতে পেতিস?'

চাঁদমুখটা যে কার, তা অবোধ্য নয়। সেটা বুঝতে পেরে যুগপৎ লজ্জিত এবং অপ্রতিভ বোধ করলাম।

এতক্ষণ আক্রমণটা ছিল পরোক্ষ। সম্মুখ সমরে না নেমে দূর থেকে তারা যে তী ছুড়ছিল, যথাস্থানেই সেগুলো এসে বিঁধছিল। এবার আর ইঙ্গিত নয়, সরাসরি সামনে এ দাঁড়াল সুধাংশু। বলল, 'কী ব্যাপার বল দেখি ললিতদা—'

এ-ঘরে আমি সবার বড়। তাই নামের সঙ্গে সম্মানজনক 'দাদা' শব্দটা সুধাংশুরা জুড়ে দিয়েছে। বললাম, 'কোন ব্যাপারের কথা বলছিস?'

রজত ওধার থেকে টিপ্পনী কাটল, 'আহা ন্যাকা, কিছুই জানেন না। এ-সবের মানে কী? ক'সপ্তাহ ধরে ছুটির দিনগুলোতে কোথায় যাও তুমি?'

অবশ্য এ-প্রশ্নটা আরো অনেক বার করেছে ওরা। সঠিক উত্তর পায়নি। আগে আ যেমন বলেছি আজও তেমন বললাম, 'এই একটু কাজে।'

'কী কাজ?'

'এই মানে—তেমন কিছু না। তবে—'

'অমন গাঁইগুঁই করছ কেন? বলতে আপত্তি থাকলে না হয় না-ই বললে।'

বিজলীর কথা এদের কাছে আগে বলিনি। যদিও ছুটির দিনে উঠে আমি কোথায় কা কাছে ছুটি সে-সম্বন্ধে রজতদের অপার কৌতূহল তবু স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। উত্তরটা বরাবরই এড়িয়ে গেছি। আমার আশঙ্কা হয়েছে, বিজলীর প্রসঙ্গ উঠলেই কোথায় কীভাবে

তার সঙ্গে আমার আলাপ, কী সম্পর্ক এবং সম্পর্কের গভীরতা কতখানি—আদ্যোপান্ত যাবতীয় ইতিহাস তারা জানতে চাইবে। সব শুনে বিজলীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে এমন কিছু পরিহাস করে বসবে যাতে আমার মাথা কাটা যাবে। বিজলী প্রসঙ্গ না তোলার লজ্জাটা আমার সেইখানে। রজতরা আজ যেমন করে কোমর বেঁধেছে তাতে মনে হচ্ছে কোনো ফাঁকিই টিকবে না। কোনো ছলনা দিয়েই বিজলীকে আড়াল করে রাখতে পারব না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না-না, আপত্তি কিসের? মাস দুই আগে দেশের একজন লোকের সঙ্গে মেরিন ড্রাইভে দেখা। দাদারে একা-একা থাকে। রোজ একবার করে যাবার জন্যে পেড়াপেড়ি করেছে। রোজ যাওয়া তো সম্ভব নয়। কাজকর্ম আছে, অফিস আছে, তোরা আছিস। তাই ছুটির দিনগুলোতে যাই।'

মিথ্যের কিঞ্চিৎ খাদ মিশিয়ে কৈফিয়ত পেশ করলাম। পার্শি কলোনির সেই ঠিকানাটা আমার নাকে অদৃশ্য একখানা বড়শি গেঁথে রেখেছে। ছুটির দিনেই শুধু নয়, সপ্তাহের অন্য দিনেও দুরন্ত আকর্ষণে বিজলী আমাকে টেনে নিয়ে যায়। সেটা অবশ্য গোপনই রাখলাম। সব দিক বজায় রেখে জবাবদিহি করতে পেরেছি, তাতেই খানিকটা স্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু আমার ধারণাটা যে কতখানি ভ্রান্ত, পরক্ষণেই টের পেয়ে গেলাম।

চোখের তারাদু'টো এককোণে এনে রজত বলল, 'আচ্ছা ললিতদা—'

তার আপাত নিরীহ স্বরের মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠলাম। ব্যস্তভাবে বললাম, 'কী?'

'দেশের লোকের কাছে যাও, না?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া কী?'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কর না।'

'সভয়ে, না নির্ভয়ে?'

রজতের সুরের মধ্যে কী একটা চাতুরির খেলা যেন আছে। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'নির্ভয়ে।'

'তোমার দেশের লোকটা পুং না স্ত্রীলিঙ্গ?' আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে উঠল রজত।

এতক্ষণ রজতই আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল। অন্য দু'জন অর্থাৎ গণেশ আর সুধাংশু ছিল নীরব মনোযোগী শ্রোতা। অবশ্য তাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে ছিল আমার মুখের ওপর। লক্ষ করলাম, রজতের শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখে কৌতুক আর কৌতূহল বিচ্ছুরিত হতে লাগল। শব্দহীন, বিচিত্র হাসির ধাক্কায় ঠোঁটের কোণগুলো যেতে লাগল বেঁকে।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। বিমূঢ় গলায় বললাম, 'কী বলছিস!'

'তোমার দেশের লোকটি মেয়েমানুষ না পুরুষমানুষ, এটুকুই জিজ্ঞেস করছি।' নিপাট ভালমানুষটির মতো বলে উঠল রজত।

আর আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম ছুটল। নতচোখে শিথিল সুরে বললাম, 'মেয়েমানুষ।'

এতক্ষণ গলার স্বরটাকে নিচু খাদে নামিয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিল রজত। হঠাৎ সেটাকে এক টানে উঁচু পর্দায় তুলে দিল সে, 'অই—অই—অই কথাটাই এতদিন আমরা ভাবছিলাম।' গণেশ আর সুধাংশুর দিকে ফিরে বলল, 'কি রে, তোদের বলিনি দাদা আমাদের মেয়েমানুষের চক্করে ফেঁসে গেছে।'

গণেশ আর সুধাংশু কিছু বলল না। হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। এতক্ষণ হাসিটাকে তারা অতি কষ্টে আটকে রেখেছিল। আচমকা সেটার মুখ থেকে অবরোধ সরে গেছে।

ভয়ানক বিব্রত বোধ করলাম। রজতদের সঙ্গে এই দু'মাস ধরে যে লুকোচুরিটা খেলেছি তার কারণ বিজলী। ওইটুকুই মাত্র। কিন্তু বিজলীকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে যে ইঙ্গিত ওরা দিয়েছে, আর যেভাবে হাসাহাসি করছে সেটা একেবারেই মিথ্যে। আমার চেতনে বা অবচেতনে তেমন কিছুই নেই। থাকা সম্ভবও নয়। বিজলী এবং আমার যা জীবন তাতে আকাশ পাতালের দুই বিপরীত কূলে দু'জনে দাঁড়িয়ে আছি। মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। এত দূরত্বে দাঁড়িয়ে বিজলীর প্রাণটাকে যে ছোঁব, সাধ্য কী। তা ছাড়া তার মনভ্রমরা কোথায় কোন কৌটোয় বন্দি, তা-ও জানি না। জানার কৌতূহল আছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। তবু যে বিজলীর কাছে ছুটি সেটা তার মনের অন্বেষণে নয়, তার জীবনের ভেতর এবং বাইরে এক যুগ ধরে যে অভাবিত, অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে সেটাই পার্শি কলোনি থেকে সম্মোহন-মন্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

কিন্তু এত কথা রজতরা বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না। তবু মরিয়ার মতো বলে ফেললাম, 'তোরা যা ভাবছিস, সে-সব কিছু নয়।'

গণেশ আর সুধাংশুর ঘর-ফাটানো অট্টহাসি থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তার রেশটা এখনও থেকে গেছে। রজত বলে উঠল, 'আচ্ছা ললিতদা—'

'কী?'

'মেয়েটির বয়েস কত হবে?'

আমি একেবারে থতিয়ে গেলাম। কপালের ঘাম মুছে শিথিল সুরে বললাম, 'কত আর, এই তিরিশের মতো।'

রজত আবার নিরীহ গলায় প্রশ্ন ছুড়ল, 'দেখতে?'

'ভালই।' ঝাপসা গলায় উত্তর দিলাম।

এবার গণেশ আর সুধাংশুর দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের ইশারা করে রজত বলল, 'শুনলি?'

তারা বলল, 'শুনলাম।'

রজত বলতে লাগল, 'এক নম্বর দেখতে সুন্দর, দু'নম্বর বয়েস তিরিশ, তিন নম্বর দেশের লোক।' বলতে বলতে হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল তার। কোমরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে আমার দিকে ঘুরে বলল, 'ভাল কথা—'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কী?'

'বিবাহিতা না কুমারী?'

সধবা, বিধবা কি কুমারী—বিজলীর পরিচয় একটিমাত্র শব্দে অসম্ভব। একবার তার বিয়ে হয়েছিল। মৃত্যু যতদিন না বাদ সাধে ততদিন স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন নাকি অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু যে আশায় মানুষের বিয়ে হয় তার এক কণাও পূর্ণ হয়নি বিজলীর। বরং উন্মাদ স্বামীকে ঘিরে তার জীবন হতাশার অথৈ অন্ধকারে একটু একটু করে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল। জীবনব্যাপী সেই পাহাড়-প্রমাণ অন্ধকারটার চেহারা যতই তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ততই অস্থির হয়ে পড়ছিল বিজলী।

পঙ্গু হোক, অথর্ব হোক, উন্মাদ হোক, তবু তো স্বামী। তাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজন্মের সংস্কারের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছে বিজলী। উন্মাদটাকে ত্যাগ করে কাকার কাছে পালিয়ে এসেছিল। আইনত না হলেও সে বিয়েটার কোনো অর্থই নেই। তারপর লুকিয়ে ধীরেশের সঙ্গে সে পাড়ি দিয়েছিল কলকাতায়। ধীরেশের সঙ্গে তার হয়েছিল মন্ত্রহীন, অশুদ্ধ বিয়ে। শুধু কি ধীরেশের সঙ্গেই, এই এক যুগ ধরে কত মানুষের সঙ্গেই না অশাস্ত্রীয়, গান্ধর্ব বিবাহের মহড়া দিয়ে গেছে সে।

সে কি কুমারী, না বিবাহিতা? কোন পরিচয়ে তাকে চিহ্নিত করব? থতিয়ে থতিয়ে বললাম, 'মানে—'

উত্তরটা সম্পূর্ণ শোনার ধৈর্য রজতের নেই। বিজলী সম্বন্ধে তার কল্পনা ডানা মেলে দিয়েছে। দু-হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরল সে। তারপর এক নিশ্বাসে বলে যেতে লাগল, 'মানে-টানে কিচ্ছু নেই। যা বুঝবার বুঝে ফেলেছি। তা মাইরি ললিতদা, একটা কথা রাখবে?'

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'তোরা যা বুঝেছিস, সেটা ঠিক নয়। আমার সব কথা আগে শোন—'

'যা বুঝেছি তা-ই ঢের। আর শোনার দরকার নেই। শুধু আমাদের কথাটা রাখবে কি না, তাই বল।'

'কী আশ্চর্য—'

'আশ্চর্য-টাশ্চর্য কিচ্ছু না, আমাদের বউদিকে একবার দেখাও দাদা। আজই বলছি না। যেদিন তোমাদের সময় হবে।' বলতে বলতে হঠাৎ আমার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল রজত। হাতখানেক জিভ কেটে বলল, 'ইস—'

গণেশ আর সুধাংশু পাশ থেকে বলল, 'কী রে?'

'দাদার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ—'

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে গণেশ আর সুধাংশু বলল, 'তাই তো রে—'

আর মরমে আমি তখন মরে যাচ্ছি। মুখখানা নিখুঁত কামানো। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে নিয়েছি। পরনে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, পাটভাঙা ধুতি। চিরদিনই পোশাক সম্পর্কে আমি উদাসীন। মোটামুটি একটা আচ্ছাদন হলেই আমার চলে যায়। কিন্তু বিজলীকে দেখার পর থেকে নিজের অজান্তে প্রাণে ভিন ভাবের সুর বাজতে শুরু করেছিল।

এতকাল খানতিনেক মোটা কাপড়ের প্যান্ট আর ফুল শার্ট—উৎসবে-ব্যসনে-শোকে-দুঃখে এই ছিল আমার একমাত্র আচ্ছাদন। আমার ওই পোশাকগুলো পার্শি কলোনির সেই ঠিকানায় একেবারেই দৃষ্টিকটু। তাই কবে যে দোকান থেকে মিহি ধুতি আর পাঞ্জাবি কিনে এনেছি, খেয়াল ছিল না। নিজের দিকে চোখ পড়তে সঙ্কোচে মাথাটা নুয়ে পড়ল।

বিজলীর কাছে যে-কারণে যাই তার জন্য ঘটা করে সাজবার প্রয়োজন নেই। তবু আমি সেজেছি। কেন সেজেছি তার স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। যদি বলতে যাই এমনিই সেজেছি, সেটা রজতদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। বিজলীর ব্যাপারে ওরা আমাকে যেখানে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে সেটাই চরম। আমার সাজসজ্জার বাহার নিয়ে রজতরা পেছনে লাগতেই পারে।

এই ফুরফুরে ধুতি-পাঞ্জাবিগুলো যে এমন করে আমাকে বিব্রত করবে, এভাবে আমাকে সঙ্কোচে কুঁকড়ে দেবে, তা কে ভেবেছিল!

রজত এবার এক কাণ্ডই করে বসল। আমার একটা হাত ধরে বলল, 'মাইরি দাদা, অনেকটা সময় তোমার নষ্ট করে দিয়েছি। বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়।'

'বেরিয়ে পড়ব!' বিমূঢ় সুরে বলে উঠলাম।

'হ্যাঁ। নইলে দেশের লোকটা আবার গোসা করে বসে থাকবে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। যাও দাদা, যাও—' বলতে বলতে মুখচোখের এমন ভঙ্গি করল রজত যাতে গণেশ আর সুধাংশু তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ল। আর নোয়ানো মাথাটা আরো একটু ঝুঁকে পড়ল আমার।

পার্শি কলোনিতে যাবার ইচ্ছেটা আজ অনেকক্ষণ আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। স্খলিত গলায় আস্তে আস্তে বললাম, 'আজ আর যাব না। অনেকদিন তোদের সঙ্গে ছুটি কাটানো হয়নি। পাঁউরুটি কলা-টলা কিছু কিনে নিয়ে চল, ইগটপুরির দিকে বেরিয়ে পড়ি।'

'দূর, তাই কখনো হয়?' আমার কোনো আপত্তি গ্রাহ্য করল না ওরা। কোনো কথা কানে তুলল না। একরকম জোর করে তিনজনে আমাকে ঘরের বার করে দিল।

সাত

পার্শি কলোনিতে আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না। একবার ভাবলাম, আবার ঘরে ফিরে যাই।

সুধাংশু গণেশ রজত এবং আমি, এই বিচিত্র সময় আমাদের চারজনকে জীবনের নানা দিগন্ত থেকে কুড়িয়ে এনে পশ্চিম বোম্বাইয়ের একটি ঘরে ছুড়ে দিয়েছিল। অনেক দিন আমরা একসঙ্গে আছি। বাংলাদেশ থেকে বার শ' মাইল দূরে চারটে ছন্নছাড়া মানুষের মধ্যে অতি দ্রুত আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। বিজলীর সঙ্গে দেখা হবার পর সেই আত্মীয়তার কথাটা একেবারে ভুলতে বসেছিলাম। দু'মাস ধরে বিজলী আমার প্রাণের সকল প্রান্তকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে সুধাংশুদের দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ পাইনি।

সেই অমনোযোগের ফলটা সুদে-আসলেই পেয়ে গেছি। রজতরা নিদারুণ লজ্জা দিয়েছে আমাকে।

বিজলীর কাছে আজ আর যাব না। রজতদের সঙ্গে নিয়ে দু'মাস আগের মতো মহারাষ্ট্রের অসীম প্রান্তরে আবার বেরিয়ে পড়ব, আমার সজ্ঞান মনে এই ইচ্ছাটাই অবিরাম ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু চেতন মনের অনেক স্তর নিচে অবচেতনের কোথায় যেন আরেকটা স্রোত ছিল। নিজের অজান্তে সেটা যে কখন দুরন্ত টানে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, বুঝতে পারিনি। কখন যে পায়ে পায়ে খার স্টেশনে এসেছি, কখন যে দাদারের টিকিট কেটে ডাউন লোকাল ট্রেনে উঠে বসেছি, সেটাও খেয়াল নেই।

বিজলীদের সেই সুবিশাল বাড়িটার সমানে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন প্রায় দুপুর। সময়টা বৈশাখ মাস। মহারাষ্ট্রের আকাশে গলা কাঁসার রং ধরেছে। সেদিকে চোখ রাখা যায় না, দৃষ্টি ঝলসে যাবে যেন। বাতাসে স্নিগ্ধতার লেশমাত্র নেই। দূর দিগন্তে তাকিয়ে যে আশ্বাস পাব তেমন এক টুকরো মেঘও নেই কোথাও। শুধু শুষ্ক, তপ্ত হাওয়া দুর্দম বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

বাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়লাম। যদিও লিফ্‌টের ব্যবস্থা আছে, সিঁড়িটাই আমার কাম্য। যখনই এখানে আসি, পায়ে হেঁটে ওপরে উঠি।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অন্যমনস্কের মতো উঠছিলাম। দোতলার বাঁকে আসতেই হঠাৎ ইংরেজিতে কে যেন ডেকে উঠল, 'শুনছেন—'

প্রথমটা খেয়াল করিনি। এবার আরো কাছ থেকে গলাটা ভেসে এল, 'একটু শুনুন, প্লিজ—'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় ফেরাতেই চোখোচোখি হয়ে গেল। প্যান্ট, বুশ শার্ট আর ইংরেজি ভাষাটার কল্যাণে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, কাশী-কাঞ্চী-কোশল—কোন অঞ্চলের মানুষ বুঝবার উপায় নেই। তা ছাড়া, চেহারাও বিশেষত্ব বর্জিত। কালোও না, আবার ফর্সাও না, মোটা বা রোগাও না, আবার খুব লম্বা বা বেঁটেও না। সব কিছুর মাঝামাঝি একটা জায়গা নিজের চেহারায় ধরে রেখেছে লোকটা। মুখ প্রায় চৌকো ধরনের, নাক থ্যাবড়া, ছোট ছোট গোলাকার চোখ। একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে অনায়াসেই ভুলে যাওয়া যায়। মানুষের ভিড়ে যদি সে মিলিয়ে যায়, এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা দিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে পারব।

লোকটা একটু হেসে ইংরেজিতেই বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

'আপনি কি বাঙালি?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

আমার কথা শেষ হতে না হতে দু'চোখে খুশি ছলকে উঠল লোকটার। প্রথমে তার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, 'ইউরেকা—' পরক্ষণেই খাঁটি বাংলা ভাষায় সে বলে উঠল, 'ক'দিন ধরেই দেখছি আপনি এখানে আসছেন। দেখেই বুঝেছি আপনি আমার দেশোয়ালী।'

লোকটার উদ্দেশ্য কী, বুঝতে পারছি না। কলকাতা থেকে বার শ' মাইল দূরের এই মহানগরে অকস্মাৎ একটি বাঙালিকে আবিষ্কার করার জন্যেই যদি তার এই উচ্ছ্বাস হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই। নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লোকটা ফের বলে উঠল, 'বুঝলেন দাদা, প্রভাতে উঠে রোজ যে মুখ হেরি তা হল পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুর্জর আর মারাঠা নন্দনদের মুখ। দু'বছর বোম্বাইতে আছি। এই প্রথম একজন বাঙালি দেখলাম। কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার। ছেলে বয়েস হলে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিতাম।'

লোকটার উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে পারলাম না। বরং মনের প্রান্তে সংশয়ের একটু দোল লাগল। সুরহীন গলায় আস্তে আস্তে বললাম, 'দু'বছর আপনি এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে এই প্রথম বাঙালি দেখলেন?'

প্রশ্নটায় আমার সন্দিগ্ধ মনের ছায়া পড়েছিল। লোকটা ঈষৎ চকিত হয়ে উঠল পরমুহূর্তেই বলল, 'মাইরি দাদা, বিশ্বাস করুন।'

বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, আমার মনে কোন ভাবের খেলা চলছে, বুঝতে পারছি না। স্থির দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলাম, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না।'

'না-না, মনে করব কেন? বলুন না—'

'আমি যত দূর জানি এই বোম্বাই শহরে লাখ দেড়েকের মতো বাঙালি রয়েছে। আর আপনি দু'বছরে এই প্রথম বাঙালি দেখলেন! আশ্চর্য!'

লোকটা কিছুক্ষণ থতিয়ে রইল। তারপরেই বলে উঠল, 'সত্যি বলছি, যে দিব্যি করতে বলবেন তাই করব। তা ছাড়া—'

'কী?'

'বাঙালি হয়তো দেখেছি কিন্তু চিনতে পারিনি। শিখদের দাড়ি-পাগড়ির নিশানা আছে। মাদ্রাজীদের আছে লুঙ্গি। আমাদের আছে ধুতি-পাঞ্জাবি। কিন্তু এই বোম্বাইতে শিখ আর দ্রাবিড় ছাড়া আর সবাই তো নিজের নিজের ইউনিফর্ম ঝেড়ে ফেলেছে। বুশ শার্ট আর প্যান্টের কল্যাণে কে মারাঠি আর কে গুজরাটি তা কি বুঝবার উপায় আছে? আপনাকেই কি বাঙালি বলে চিনতে পারতাম? নেহাত ওই ধুতি-পাঞ্জাবিটা ছিল—'

লোকটার কৈফিয়ত এতক্ষণে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। এই বোম্বাই শহরে বুশ শার্ট আর প্যান্টই আন্তর্জাতিক পোশাক। তার তলায় সব প্রদেশের পরিচয়নামা প্রায় হারিয়ে গেছে। মনের কোণে সংশয়ের যে ছায়াটা পড়েছিল সেটা উধাও হয়ে গেল। লোকটার কথায় পুরোপুরি সায় দিয়ে বললাম, 'যা বলেছেন।'

সে বলল, 'এতকাল পর একজন দেশোয়ালী পেয়েছি। আজ কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না দাদা। এই সামনেই গরিবের একটা আস্তানা আছে। সেখানে পায়ের ধুলো দিতেই হবে। না বললে কিছুতেই শুনব না।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

বললাম, 'এ-বাড়িতে আমার খুব জরুরি একটা কাজ আছে।' কথাটা মিথ্যে। বিজলীর সঙ্গে আমার এমন কোনো শর্ত হয়নি যে আজ হাজিরা না দিলে চুক্তিভঙ্গের দায়ে পড়তে হবে।

'দেখুন দাদা—' করুণ মুখে লোকটি বলল, 'আজ ছুটি। ভেবেছিলাম দেশের একটা লোক পেলাম। তাকে নিয়ে সারাটা দিন মাতামাতি করে কাটাব। আপনি আমাকে আনন্দটা থেকে বঞ্চিত করবেন দাদা?'

লোকটার দিকে তাকিয়ে করুণাই বোধ করলাম। তা ছাড়া, তার আন্তরিকতা আমাকে স্পর্শ করেছিল। কিছুটা কৌতূহলও বোধ করছিলাম। বললাম, 'বেশ, চলুন। কিন্তু একটা কড়ার করতে হবে।'

'কী?'

'সারাদিন কিন্তু আমাকে আটকে রাখতে পারবেন না। ঘণ্টাখানেক পরেই ছেড়ে দিতে হবে।'

লোকটার চোখ চকচক করে উঠল। উল্লসিত সুরে সে বলল, 'সে দেখা যাবে'খন। আগে চলুন তো।' বলেই আমার হাত ধরে টান লাগাল।

তার সঙ্গে চলতে চলতে বললাম, 'দেরি কিন্তু করতে পারব না। ঠিক একঘণ্টা পর আমি চলে আসব।'

লোকটা উত্তর দিল না। দেওয়াটা প্রয়োজন বোধ করল না সম্ভবত।

বিজলীদের সেই বিশাল ম্যানসনটার উলটো দিকে একখানা হলুদ রঙের চারতলা বাড়ির চিলেকোঠায় ছোট্ট একটি ঘরে লোকটির আস্তানা। বারকয়েক শ্বাস টানা আর শ্বাস ফেলার মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম।

একখানা ক্যাম্বিসের খাট, একটি স্টিলের ফোল্ডিং চেয়ার আর স্টিলেরই ফোল্ডিং একটা টেবল—আসবাব বলতে এই। এমনকি গেলাসও একটিই। সবই অদ্বিতীয়। এককোণে দড়ি টাঙানো। সেখানে খানকয়েক জামা-প্যান্ট ঝুলছে। এছাড়া সমস্ত ঘরে আর কিছুই আবিষ্কার করা যাবে না। অবশ্য মেঝেময় পোড়া সিগারেটের ধ্বংসাবশেষ এবং দেশলাইয়ের কাঠি স্তূপীকৃত। আর আছে ইতস্তত পাঁউরুটির খালি প্যাকেট, কলার খোসা, পানের বোঁটা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

লোকটা যে পাক্কা বাউণ্ডুলে টাইপের, ঘরে পা দিয়ে মুহূর্তে অনুমান করা যায়। যে-কোনোদিন যে-কোনো সময় বিনা ভূমিকায় চেয়ার-টেবল আর খাটখানা ভাঁজ করে নিরুদ্দেশে সে পাড়ি জমাতে পারে।

ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি চেয়ারটা খুলে পেতে দিল লোকটা। বলল, 'বসুন দাদা—'

ঘরের একমাত্র রাজাসনখানায় নিজেকে স্থাপন করলাম। ক্যাম্বিসের খাটে অনন্ত শয্যা পাতাই ছিল। লোকটা সেখানে গিয়ে বসল। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল তার।

ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'কাণ্ডটা দেখুন একবার। এতক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলছি অথচ কেউ কারও নামটাই জানি না। আমার নাম রতীশ হালদার। আপনার?'

রতীশ। সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় রতি যোগ ঈশ। অর্থাৎ রতির ঈশ্বর। লোকটিকে আরেক বার দেখে নিলাম। চেহারার সঙ্গে নামটা খাপ খায়নি, বরং কৌতুকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বললাম, 'আমার নাম ললিত চৌধুরি।'

রতির ঈশ্বর অর্থাৎ রতীশ আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে বলল, 'দাদার দেশ ছিল কোথায়?'

কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, 'কেন, বাংলাদেশে।'

'আরে না-না, সে কথা জিজ্ঞেস করছি না। বলছি কোন জেলায়?'

'বর্ধমানে। তবে একবারই মাত্র সেখানে গিয়েছিলাম। সেই যুদ্ধের সময় ইভাকুয়েশনের হিড়িকে। নইলে জন্ম থেকে বরাবরই আমার কলকাতায় কেটেছে। অবশ্য শেষের অনেকগুলো বছর ছাড়া।'

'শেষ বছরগুলো কোথায় কেটেছে?'

'রাজস্থান আর বোম্বাইতে।'

এরপর আমার এবং আমাদের তাবত পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগল রতীশ। আমি যথাসম্ভব উত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম।

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল রতীশ। ব্যস্তভাবে বলল 'আপনাকে তো এই দুপুরবেলা পাকড়াও করে নিয়ে এলাম। খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই হয়নি?'

ছুটির দিনের দুপুরে বিজলীর কাছে খাওয়াটা আমার নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। আজ আর সেখানে পৌঁছতে পারলাম কই? তার আগেই তো রতীশ আমাকে ধরে নিয়ে এল সকাল থেকে পেটে বিশেষ কিছুই পড়ে নি। বললাম, 'সে হবে'খন। এখান থেকে ফিরে গিয়ে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রতীশ। প্রায় হাতখানেক জিভ কেটে বলল, 'ছি-ছি-ছি, আপনি না খেয়ে আছেন! একটু বসুন দাদা, আমি আসছি।'

বুঝলাম, কী উদ্দেশ্যে সে বেরোতে চায়। বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না-না, আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি একটু পরেই উঠে পড়ব।'

'তাই কখনও হয়!'

কিছুক্ষণের পরিচয়েই বুঝতে পেরেছি রতীশ চরিত্রের কোথাও যুক্তির নামগন্ধ নেই। একটা দুরন্ত আবেগের স্রোতে সবসময় সে ভাসমান। কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটল। আর বিব্রত, অপ্রস্তুত মুখে আমি বসে রইলাম। এখন পর্যন্ত যে প্রায় না খেয়ে আছি, সে কথা রতীশকে না জানালে যেন এই মুহূর্তে স্বস্তি বোধ করতাম।

খানিক পর কাগজের ঠোঙায় পুরি-তরকারি আর কিছু ক্ষীরের মিষ্টি নিয়ে এল রতীশ। আমার সামনে ঘরের সেই একমেব টেবলখানা পেতে দিয়ে খাবারগুলো সাজিয়ে দিতে

দিতে বলল, 'একটু কষ্ট করে এটুকু মুখে দিয়ে নিন দাদা। দুপুরবেলা এ-সব আপনার সামনে ধরে দিতে ভারি লজ্জা করছে। যেতেন আমাদের দেশের বাড়িতে—' বলতে বলতে থেমে গেল সে।

তার দেশের বাড়িতে আমাকে নিতে পারলে রতীশ যে একটা মহোৎসবের মহড়া দিত, সে-সম্বন্ধে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আমি কিছু বললাম না।

রতীশ আবার শুরু করল, 'আমি একেবারে জাতকাট ভবঘুরে। রান্নাবান্নার কোনো পাটই নেই। রান্না যে করবে তেমন মানুষ এখন পর্যন্ত ঘরে আসেনি। খাওয়াদাওয়া সবই বাইরে সারি। নইলে আপনার কাছে এই পুরি-তরকারি প্রাণ ধরে দিতাম! কস্মিন কালেও না।' বলে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। আয়োজনের তুচ্ছতায় খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে রতীশ।

আমিও তো একই ঝাঁকের কই। ভোজন যত্রতত্র, শয়ন শহরতলির সেই হট্টমন্দিরে। রোজ কি ধরনের বাদশাই খানা মুখে ওঠে, আমার চাইতে কে আর ভাল করে জানে। উদিপি কি পাঞ্জাবি হোটেলের বিস্বাদ, লঙ্কাঠাসা খাদ্যগুলি চোখের জলে নাকের জলে মিশিয়ে কোনোরকমে পাকস্থলীতে চালান করি।

আমার খাওয়ার জন্য রতীশ যে আয়োজন করেছে তা যত তুচ্ছ আর নগণ্যই হোক, তার মধ্যে আন্তরিকতার ছোঁওয়া আছে। খাবারগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'আদর করে ঘরে এনে খেতে দিচ্ছেন, এই না কত। তার ওপর ও-সব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

রতীশ হাসল। বলল, 'আচ্ছা—আচ্ছা—'

'আমাকে খাওয়াবার জন্যে তো দোকানে ছুটে গেলেন। নিজের খাওয়া হয়েছে তো?'

'কখন। দুপুরের খাওয়া এগারটার ভেতরেই আমি সেরে ফেলি। এখন তো সাড়ে বারটা বাজতে চলল।' হাতে ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে রতীশ বলল।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। খেতে খেতে একসময় আমিই নীরবতা ভাঙলাম, 'আচ্ছা রতীশবাবু—'

দূরমনস্কের মতো কী যেন ভাবছিল রতীশ। আমার ডাকে চমকে উঠল, 'কী বলছেন দাদা—'

'আমার সব কথাই তো শুনলেন। আপনার নামটা ছাড়া আর কিন্তু কিছুই জানতে পারিনি।'

'কী জানতে চান, বলুন না—'

'এই কী কাজ টাজ করেন—'

'কী কাজ করি?' আমার চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রতীশ।

সামান্য আলাপেই বুঝে নিয়েছি, রতীশ হালদার লোকটা খুবই সপ্রতিভ। সহজে তাকে অপ্রস্তুত করা যায় না। কিন্তু জীবিকার প্রশ্নে সম্ভবত সে বিব্রত হয়ে পড়েছে। সঙ্কোচের সুরে বললাম, 'যদি আপত্তি থাকে, না হয় না-ই বললেন। মানে—'

মুহূর্তে সামলে নিল রতীশ। হো হো করে হেসে বলল, 'কী আশ্চর্য, আপত্তি থাকবে কেন? আগেই তো নিজের পরিচয় দিয়ে দিয়েছি আপনাকে। আমি জাতকাট ভবঘুরে।'

ভবঘুরে হওয়াটা যে কারও জীবিকা হতে পারে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। বিমূঢ়ের মতো রতীশের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

রতীশ খুব সম্ভব আমার মনোভাবটা টের পেয়ে গেছে। বলল, 'মানেটা বোধহয় দাদা বোঝেন নি। তাই না?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'আমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। বছর দুয়েক হল বোম্বাই সার্কেলে আছি। কোন দিন হুট করে আবার কোথায় বদলি করে দেবে, কে জানে। এমন চাকরি, কোথাও হাঁড়ি কালো হতে দেয় না।'

এরপর নিজের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যই বিনা প্রশ্নে সরবরাহ করতে লাগল রতীশ। নদীয়া জেলার এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে তাদের দেশ। সেখানে বিঘে পঞ্চাশেক ধানজমি, তিনটে বিরাট বিরাট পুকুর, আর তিন-মহলা প্রকাণ্ড বাড়ি। সেগুলো থেকে ছোটখাট একখানা জমিদারিই বলা হয়। বাবা-মা এখনও জীবিত। বাবা বেশ শক্ত সমর্থ মানুষ, নিজেই সম্পত্তি, চাষ-বাস দেখাশোনা করেন। রতীশরা দুই ভাই, এক বোন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ভাই নীরেন এ বছর বি. এ পাস করেছে।

রতীশ যে চাকরি নিয়ে সারা ভারতবর্ষে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে সেটা অভাবের জন্য নয়। সেটা তার স্বভাবের দোষে। শৈশব থেকেই তার দেশ দেখার প্রচণ্ড নেশা। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি সেই নেশাটার পক্ষে অমোঘ মুষ্টিযোগ। এক নিশ্বাসে নিজের এবং পারিবারিক সমস্ত খবর দিয়ে রতীশ থামল।

এদিকে আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। রতীশ তাড়াতাড়ি টেবল পরিষ্কার করে আমাকে খাবার এবং আঁচাবার জল দিল। তারপর সিগারেট বার করল। আমাকে দিয়ে নিজেও একটা ধরিয়ে নিল।

সিগারেটে প্রচণ্ড টান দিয়ে গল গল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রতীশ। ক্যাম্বিসের খাটটাকে আমার চেয়ারের কাছে টেনে এনে আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা দাদা—'

'কী?' আমি ফিরে তাকালাম।

'অভয় দিলে একটা কথা বলতে পারি।' রতীশ হালদার চোখের কোণে একটু হাসল।

'কী কথা?'

'আমার কাছে আসুন। আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি।'

কথামতো উঠে গেলাম। রতীশের ঠিক পেছনেই গরাদহীন ছোট একটা জানালা। তার ভেতর দিয়ে বিজলীদের সুবিশাল ম্যানসনটা স্পষ্ট দেখা যায়। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে রতীশ বলল, 'ওই বাড়িটায় তো প্রায়ই আসেন আপনি। আজও তো ওখান থেকেই আপনাকে পাকড়াও করে আনলাম।'

চিলেকোঠার এই ঘরটি থেকে যে বিজলীদের ম্যানসনটা দেখা যায়, এ ধারণা আমার ছিল না। নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললাম, 'হ্যাঁ, প্রায়ই আসি। ওখানে আমাদের দেশের একটি লোক থাকে।'

রতীশ ফস করে বলে বসল, 'ছ'তলার কোণের দিকের ওই ফ্ল্যাটটায়?'

চকিত হয়ে রতীশের দিকে ফিরলাম। তার চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই ফ্ল্যাটটায় যে আসি, আপনি কেমন করে জানলেন?'

রতীশ হালদার হকচকিয়ে গেল। তারপর ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'না, মানে আমার এই জানালা দিয়ে ও-বাড়ির সবই দেখা যায়। মাঝে মাঝেই আপনি আসেন, দেখতে পাই। তা ছাড়া, কখনও সখনও আমাকে ও-বাড়িতে যেতে হয়। তখনও আপনাকে দেখেছি। এই আর কি। নইলে কেমন করে আর জানব?'

উত্তর দিলাম না। আমার দৃষ্টি রতীশের চোখে তেমনই স্থির হয়ে রইল।

সে আবার বলল, 'আচ্ছা দাদা—'

মুখে কিছু বললাম না। টের পেলাম আমার চোখদু'টি কুঁচকে গেছে। রতীশ বলতে লাগল, 'ছ'তলার ওই ফ্ল্যাটটায় একটি বাঙালি মহিলা থাকেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। কেন?'

আমার প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেল না রতীশ। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্য থেকে বলে উঠল, 'ফাইন দেখতে দাদা। সারা বোম্বাই ঢুঁড়ে বেড়ালে এমন চেহারা আর একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। একবার যে দেখবে সে পাগল হয়ে যাবে।' তার ছোট ছোট গোলাকার চোখ আরশোলার নতুন পাখার মতো চকচক করতে লাগল।

এতক্ষণে রতীশের যেচে আলাপ করা, ঘটা করে ঘরে নিয়ে এসে খাওয়ানো, এত খাতির, সমস্ত কিছুর সঙ্গত একটা হেতু আবিষ্কার করা গেল। এবং জগতে কোনো কার্যই যে কারণহীন নয়, এই সত্যটার আরেক বার প্রমাণ পেয়ে খানিকটা আরামই বোধ করলাম। সেই সঙ্গে অনেকখানি কৌতুকও। রতীশ হালদার নামে এই লোকটা তা হলে বিজলীর আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য গাথা মেলে রয়েছে! রগড় করে বললাম, 'বিজলীকে দেখে আপনিও পাগল হয়েছেন নাকি?'

'কী, কী নাম বললেন?' লাফ দিয়ে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরল রতীশ।

'বিজলী!'

'বিজলী—বিজলী—' অনুচ্চ, ফিসফিস সুরে নামটা বারকয়েক জপ করে নিল রতীশ। তারপর গলা তুলে বলল, 'আচ্ছা দাদা, বিজলী মানে তো বিদ্যুৎ?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'সার্থক নাম। ওই রূপের সঙ্গে অমন নাম না হলে কিছুতেই খাপ খেত না।'

বিজলীর নামের ব্যাপারে রতীশের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত। বললাম, 'যা বলেছেন—'

লুব্ধ স্বরে রতীশ বলতে লাগল, 'মহিলাটি তো আপনাদের দেশেরই।'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে খুব খাতির করেন, না?'

'এক দেশে বাড়ি। তা খানিকটা খাতির করে বইকি। দেখুন ভাই রতীশবাবু, তাই বলে—'

'কী?' রতীশ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকায়।

প্রথমে একটু করুণাই হল। পরক্ষণে অদম্য একটা হাসি ভেতরে চেপে নির্দয় গলায় বলে উঠলাম, 'বিজলীর সঙ্গে আপনার আলাপ টালাপ কিন্তু করিয়ে দিতে পারব না বিজলী এ-সব পছন্দ করে না।'

চোরা চোখের দৃষ্টি হেনে লক্ষ করলাম, মুহূর্তে রতীশের মুখের আলো নিভে গেল জোরে জোরে প্রচণ্ড বেগে মাথা নেড়ে ম্রিয়মাণ, করুণ মুখে সে বলতে লাগল, 'না না আলাপ করিয়ে দিতে বলব কেন? আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? ছি-ছি—'

সরবে যত অস্বীকারই করুক, রতীশ যে বিজলীর জন্যই আমাকে এ-ঘরে টেনে এনেছে সে-সম্বন্ধে সংশয় নেই। ইচ্ছা হয়তো ছিল বিজলীর কাছে তাকে নিয়ে যাই। সে-অনুরোধও হয়তো করে বসত। কিন্তু তার আগেই তার গনগনে উৎসাহে জল ঢেলে দিয়েছি। রতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আগের সেই দুরন্ত হাসিটা বুকের ভেতরে উথলাতে লাগল একটু যদি অসাবধান হই, সেটা প্রবল তোড়ে বেরিয়ে আসবে। ফল হবে এই, রতীশ বেচারা ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে। লজ্জায় মুখই তুলতে পারবে না আমার দিকে। অতি কষ্টে হাসিটাব মুখে পাথর চাপা দিয়ে রাখলাম। সেটা বেরিয়ে আসার পথ না পেয়ে ভেতরে ভেতরে পাক খেতে লাগল।

এরপর অনেকক্ষণ রতীশ এবং আমি দু'জনেই নিশ্চুপ। হঠাৎ একসময় রতীশ বলে উঠল, 'আচ্ছা দাদা, বিজলী মানে ওই মেয়েটি আপনার কী হয়? মানে কোনো সম্পর্ক আছে?'

'তা কি আর নেই?' ইচ্ছা করেই ডাহা একটা মিথ্যে বললাম, 'বিজলী আমার দূর সম্পর্কের মাসতুতো বোন।'

'তাই বুঝি, তাই বুঝি?' একটু থেমে কী ভেবে রতীশ বলল, 'আপনার ওই বোন কি বিবাহিতা?'

সেই দুরূহ প্রশ্ন। আজ সকালে আমার ঘরের সেই তিন শরিক, রজত সুধাংশু এবং গণেশ, এই প্রশ্নটাই করেছিল। চোখ-কান বুজে অর্ধেক মিথ্যে আর অর্ধেক সত্যির খাদ মিশিয়ে বলে ফেললাম, 'তা একরকম অবিবাহিতাই বলতে পারেন।'

'একরকম মানে?'

বুঝলাম, চক্ষুলজ্জার খাতিরে আলাপ করিয়ে দেওয়ার কথাটা তুলতে পারছে না বটে কিন্তু বিজলী সম্বন্ধে যাবতীয় খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবার রতীশ সংগ্রহ করবে। বললাম, 'এক কথায় তা বোঝানো যাবে না।'

'এক কথায় না হোক, বিশ কথায় বোঝান না।' রতীশ হাসল।

উত্তর দিতে গিয়ে জানালার বাইরে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল। রোদের রং বদলে যেতে শুরু করেছে। দুপুরবেলা মহারাষ্ট্রের আকাশ বেয়ে সূর্যটা যখন সরাসরি মাথার ওপরে উঠে এসেছিল সেই সময় রতীশের এই আস্তানায় এসে ঢুকেছিলাম। কথায় কথায় কখন যে দুপুরটাকে বিকেলের দিকে টেনে নিয়ে এসেছি, খেয়াল ছিল না। দিনের বয়স সম্বন্ধে সচেতন হতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, 'অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলাম। এবার উঠে পড়ি ভাই।'

আমার একটা হাত চেপে ধরে রতীশ অনুনয়ের সুরে বলল, 'এই তো এলেন, এর মধ্যেই যেতে চাইছেন! এক্ষুনি উঠলে আমি কিন্তু ভারি কষ্ট পাব দাদা। এতকাল পর দেশের একটা লোকের সঙ্গে দেখা—'

রতীশের কাকুতি মিনতির নেপথ্যে কোন প্রেরণা কাজ করছে, অবোধ্য নয়। বললাম, 'এক ঘণ্টার কড়ারে কিন্তু আমি এসেছিলাম। সে জায়গায় ক'ঘণ্টা কাটল, ভেবে দেখুন।'

'ছোট ভাইয়ের কাছে এলে কি ঘণ্টা-মিনিটের হিসেব করতে আছে দাদা! আপনি একটু বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি। আর কী খাবেন, বলুন?'

পুরি-তরকারি এখনও পেটের ভেতর গিজগিজ করছে। এক পেট খাবার খাইয়ে যেভাবে রতীশ আমাকে চক্ষুলজ্জার ফাঁদে আটকে রেখেছে তাতে নতুন করে কিছু খেতে সাহস হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি তার একটা হাত ধরে বললাম, 'চা'টা এখন কিছু খাব না। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

'কিচ্ছু খাবেন না দাদা!' মুখখানা কাঁচুমাচু করে তাকাল রতীশ।

'না ভাই। এই তো কতগুলো খেলাম। এখনও সে-সব হজম হয়নি। খাওয়ার ওপর খেলে মারা পড়ব।'

'তা হলে থাক। তবে খেলে কিন্তু ভারি খুশি হতাম।'

আমি উত্তর দিলাম না।

কী যেন চিন্তা করে রতীশ খুক খুক করে একটু কাশল। বোঝা গেল, এই কাশিটা ভূমিকামাত্র। এর পরেই আসল প্রসঙ্গে চলে যাবে সে। আমি সে জন্য প্রস্তুত হয়েই রইলাম।

যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই। ফিসফিসিয়ে রতীশ একসময় বলে উঠল, 'আচ্ছা দাদা, আপনার ওই মাসতুতো বোন তো ছ'তলার ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকেন, না?'

'একা থাকবে কেন?' আমি বললাম, 'বেয়ারা-বাবুর্চি-বয় আর বদরাগী একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরও আছে। অচেনা লোক দেখলে কুকুরটা এত খেপে যায়—'

ভেবেছিলাম, কুকুরের কথায় রতীশের মুখে ভয়ের ছায়া পড়বে। কিন্তু না, তেমন কোনো প্রতিক্রিয়াই ঘটল না। কুকুরের কথাটা যেন শুনতেই পায়নি, এমনভাবে বলে উঠল, 'ও-সব যে আছে, আমি জানি। আর কেউ কি নেই? যেমন বাপ-মা-ভাই-বোন?'

'না, জগতে ও একা। কেউ নেই ওর।'

'কেউ না?'

'না।'

'আপনার মাসতুতো বোনের খুব টাকা, না?'

'তা আছে বইকি। নইলে ও-রকম ফ্যাটে এত আরামে থাকতে পারে?'

'তা তো বটেই।' একটু থেমে আমার চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে রতীশ বলল, 'এত টাকা কি ওঁর পৈতৃক?'

বর্ধমানের সেই ছবিটা চকিতের জন্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেদিন মৃত্যুপথগামী কাকাকে নিয়ে আমাদের পরিত্যক্ত, ভাঙা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল বিজলী। মঠ থেকে যে সাহায্যটুকু পেত তাতেই তাদের কোনোরকমে জীবনধারণ চলত। পৈতৃক সূত্রে সে কী পেয়েছিল, তা তা আমার অজানা নয়। বললাম, 'না। সবই ও নিজে রোজগার করেছে।'

রতীশের চোখ দু'টি সঙ্গে সঙ্গে গোলাকার হয়ে গেল, 'নিজে রোজগার করেছেন!'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

কোন পদ্ধতিতে অপরিমিত অর্থ বিজলী সঞ্চয় করেছে তা ভাবতে গেলে আমার মাথা কাটা যায়। হায় মঠযাত্রিণী সন্ন্যাসিনী! সব জেনেশুনেও চোখ বুজে মিথ্যেই বললাম, 'খুব বড় চাকরি করে বিজলী।'

'চাকরি করেন!' চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রতীশের। পরমুহূর্তে হেসে সে বলল, 'না, দাদা। হয় আপনি লুকোচ্ছেন, নইলে জানেন না।'

'কী জানি না?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

'চাকরি উনি করেন না। তা ছাড়া চাকরিতে এত টাকা হয় না।'

'চাকরি যে করে না, আপনি কেমন করে জানলেন?'

'সপ্তাহে দু-একদিনের বেশি তো বিজলীদেবীকে বেরোতে দেখি না। শনিবার শনিবার মহালছমীতে রেস খেলতে যান। মাঝে মধ্যে দামি গাড়িতে চড়ে বেরোন। আর—আর—'

যত শুনছি ততই স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। বিজলী সম্বন্ধে এত তথ্য কোত্থেকে যোগাড় করল রতীশ! তবে কি সমস্ত দিন নিজের ঘরের জানালায় চোখ লাগিয়ে বিজলীর ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে সে? বিজলী যখন বেরোয় তার পিছু নেয়? তক্ষুনি খেয়াল হল, প্রেমিক আর গোয়েন্দার মধ্যে খানিকটা মিল আছে। মনে হতেই কিছুটা আরাম বোধ করলাম।

আমার চোখে রতীশের দৃষ্টি নিবদ্ধই ছিল। খুব আস্তে আস্তে, চাপা গলায় সে বলে উঠল, 'আর দশ বার দিন পর পর সন্ধের সময় বিজলী দেবী সান্তাক্রুজের দিকে চলে যান।'

'সান্তাক্রুজ!'

'হ্যাঁ, এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্ট থেকে ফিরতে বারটা একটা বেজে যায়।'

বিজলী যে এয়ারপোর্টে যায়, সে খবর জানতাম না। বললাম, 'ওর অনেক বড় বড় বন্ধুবান্ধব আছে। প্রায়ই তারা কলকাতা দিল্লি থেকে আসে। তাদের রিসিভ করতেই এয়ারপোর্টে যায় হয়তো।'

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না রতীশ। নিজের মনেই বলে যেতে লাগল, 'তবেই বুঝতে পারছেন দাদা, এ-ভাবে চাকরি করা চলে না, আর বিজলী দেবী চাকরি করেনও না।'

চকিত হয়ে উঠলাম। আমার মিথ্যে বলাটা যে ধরা পড়ে যাবে, ভাবিনি। কিছু একটা কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করলাম। গলায় স্বর ফুটল না।

আমার অবস্থা অনুমান করে বুঝি করুণাই হল রতীশের। হালকা গলায় সে বলল, 'সে যাক গে দাদা, আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমার কী দরকার? তার চাইতে এই সিগারেটটা ধরান।'

সিগারেট খেতে খেতে বিজলী ছাড়া তাবত বিষয়ে, যেমন বোম্বাইয়ের আবহাওয়া, হোটেলের রান্না, শেয়ার বাজার, চাকরির অবস্থা, পরবর্তী নির্বাচনে গ্রেট ব্রিটেন লেবার পার্টি কি কনজারভেটিভ পার্টি কে ক্যাবিনেট গঠন করবে, ইত্যাদি আলোচনা হতে লাগল। কথায় কথায় কখন যে সন্ধে নেমে গেছে, লক্ষ করিনি। চমকে উঠে বললাম, 'ইস, কত দেরি হয়ে গেল। এবার কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ভাই।'

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। আপনাকে আর আটকে রাখলে অন্যায় করা হবে।' রতীশ হালদার হাসল।

'আমি চলি —'

'আসুন। আবার আসবেন। ছোট ভাইকে ভুলবেন না।'

'না না, ভুলব কেন? নিশ্চয় আসব।' বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আট

বাইরে এসে দেখলাম, পশ্চিম আকাশের পটে দিনান্তের শেষ আলোর ছটাটুকু আর নেই। তার বদলে পার্শি কলোনির রাস্তায় রাস্তায় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে।

আজকের এই ছুটির দিনটা রতীশ হালদার বিচিত্র এক ফাঁদে আমাকে আটকে রেখেছিল। কোথায় বিজলীর মুখোমুখি বসে তার তীব্র, উত্তেজক সান্নিধ্যের আস্বাদ নেব। তা ছাড়া চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের প্রলোভন তো আছেই। তা নয়, কোত্থেকে নাছোড়বান্দা লোকটা ছোঁ মেরে আমাকে তার আস্তানায় নিয়ে গেল, খাইয়ে দাইয়ে বন্দি করে রাখল। তার আদর এবং আপ্যায়নের মাশুল দিতে হল সারাটা দিন মাটি করে। অসম্ভব রাগ হতে লাগল রতীশের ওপর।

বিজলী সম্বন্ধে তার প্রাণে জোয়ার উথলে উঠেছে, খুব ভাল কথা। তা বাবু সোজা তার কাছেই চলে যা না। বুকের ভেতর ঝুড়ি ঝুড়ি যত কথা জমে আছে, সেখানে গিয়ে সব ঢেলে দে। আমার তাতে এতটুকু আপত্তি নেই। কিন্তু ছুটির দিনটা এভাবে নষ্ট করে দেওয়া কেন? কেন এক পেট পুরি-তরকারি খাইয়ে চক্ষুলজ্জার ফাঁসে আটকে রাখা?

ছুটির দিনে বিজলীর কাছে আসাটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অভ্যাস বললে যথেষ্ট হয় না। উগ্র, ঝাঁঝালো নেশা বলাই বোধ হয় সঙ্গত। এতদিন এ-ব্যাপারটা আমার কাছে ধরা পড়েনি। রতীশ হালদার তার আস্তনায় আমাকে অটকে না রাখলে আজও জানতে পারতাম না। আমার সত্তার সকল দিককে এই দু'মাসে কী আশ্চর্যভাবেই না নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছে বিজলী! ছুটির দিনে তার কাছে যেতে না পারলে এমন অস্থিরতা বোধ করব, কে ভেবেছিল!

নেশার সময় নেশার পাত্রটি ঠোঁটের প্রান্ত থেকে কেউ সরিয়ে নিলে যে অবস্থা হয়, আমার হয়েছে তাই। একটা উদ্‌ভ্রান্ত অতৃপ্তি ক্রমাগত আমাকে ধাওয়া করে চলল। ফল হল এই, রতীশ হালদারের বিরুদ্ধে আমার রাগ, বিরক্তি এবং অসন্তোষ স্ফীত হতে হতে পাহাড়প্রমাণ হয়ে উঠল।

রতীশের ভাবনাটার মধ্যে দোল খেতে খেতে কখন যে পায়ে পায়ে বিজলীদের সেই ম্যানসনটার সামনে এসে পড়েছিলাম, খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই থমকে গেলাম। এত কাছে এসে পড়েছি, একবার দেখা না করে চলে যাওয়া যায়? সারাটা দিন বিজলীর দু শ' গজের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম, অথচ চোখের দেখাটা মুখের কথাটা একবারও হবে না? ঠোঁটের প্রান্ত থেকে ফেনিল সুরাপাত্র, দু'হাতে ঠেলে দেব, এমন নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয় তো আমি নই।

বাড়িটার ভেতর দিকে পা বাড়াতে যাব, সেই মুহূর্তে থতিয়ে গেলাম। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ল, বিকেল হলেই আর একটা মুহূর্তও আমাকে তার ফ্ল্যাটে থাকতে দেয় না বিজলী। যে কোনো ছলে, যে কোনো কৌশলে বিদায় করে দেয়। বিকেলের পর থেকে সন্ধে, সন্ধের পর রাতের চারটে যাম তার সময় কিভাবে কাটে, আমি জানি না। এই দীর্ঘ সময়টা সে কী করে, কে বলবে। বিজলী বুঝিয়ে দিয়েছে, বিকেলের পর আমি যেন তার কাছে না আসি।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এই সন্ধেবেলা যদি তার ফ্ল্যাটে হানা দিই, বিজলী কি খুশি হবে? না কি বিরক্তিতে তার ভ্রূ কুঁচকে যাবে? কিংবা—হয়তো—হয়তো, ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় করে দেবে।

একবার ভাবলাম, বিজলীর কাছে আজ আর গিয়ে কাজ নেই; খারের সেই এজমালি বিবরেই ফিরে যাই। পরের ছুটির দিন না-হয় আসা যাবে।

কিন্তু না, অনিচ্ছুক মনকে কিছুতেই ঘরমুখী করতে পারলাম না। নিজের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুঝলাম। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বিজলীদের বিশাল বিল্ডিংয়ে ঢুকে ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম। এবং যত সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম ততই বুকের ভেতর দুরন্ত ঝড়ের দোলা শুরু হয়ে গেল। এখনও ফেরার সময় আছে, এখনও নিচে নেমে যেতে পারি। কিন্তু অমোঘ নিয়তি আমাকে তাড়া করে নিয়ে চলল। তার মুখোমুখি যে রুখে দাঁড়াব সে শক্তি আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। তার হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই।

প্রায় আচ্ছন্নের মতো, অনিবার্য কোনো আকর্ষণে একসময় বিজলীর ফ্ল্যাটের সামনে এসে পড়লাম। চেতনার সামান্য একটু তলানি তখনও বোধহয় অবশিষ্ট ছিল। তাই কলিং বেলটা টিপতে গিয়ে হাত গুটিয়ে আনলাম। অবচেতনার তলা থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ফিরে যা, ফিরে যা। বিজলী নিজের থেকে যেটুকু দেখিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক। যা সে গোপন করে রেখেছে সেদিকে চোখ না-ই ফেরালি। তার যখন আপত্তি তখন কৌতূহলটার গলায় শিকল এঁটে বাগ মানিয়ে রাখ। রাগ করে হয়তো বিজলী এমন কিছু বলে বসবে যাতে মুখ আর তুলতে পারবি না। হয়তো চিরদিনের জন্যে তার দরজা তোর কাছে বন্ধ হয়ে যাবে। লোভের বশে হঠকারিতা করিস না।'

কিন্তু সেই যে অমোঘ নিয়তিটা, সর্বনাশের শেষ কূলে টেনে নিয়ে সে আমাকে ফিরতে দিল না। একরকম জোর করেই আমার হাতটা তুলে নিয়ে কলিং বেলে বসিয়ে দিল। অন্ধের মতো, মরিয়ার মতো বেলটা বাজিয়ে দিলাম।

অন্য সব দিন কলিং বেলের আওয়াজ পেলেই দরজা খুলে বয়ের মুখ উঁকি দেয়। তার বদলে আজ বিজলীর সুরেলা গলা শুনতে পেলাম। ইংরেজিতে সে বলল, 'অনুগ্রহ করে ভেতর আসুন, দরজা খোলাই আছে।'

আমি ইতস্তত করতে লাগলাম।

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' বিজলী তার স্বরে সবটুকু সুধা ঢেলে দিয়ে আবার আমন্ত্রণ জানায়, 'আসুন।'

ইংরেজিতেই বলছে বিজলী এবং ইংরেজি 'ইউ' শব্দটা যদিও 'তুমি' এবং 'আপনি' দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তথাপি মনে হল, বিজলীর 'ইউ'-তে আপনিই ফুটে বেরিয়েছে।

বর্ধমানের দূর অভ্যন্তরে যখন আলাপ হয়েছিল তখন প্রথম প্রথম দিনকতক বিজলী আমাকে 'আপনি' বলত। তারপরই সম্বোধনের ভাষাটা বদলে 'তুমি' করে নিয়েছিল। দীর্ঘ একযুগ পর আরব সাগরের এই কূলে আবার যখন তাকে আবিষ্কার করলাম তখন থেকে 'তুমি'ই বলে আসছে সে।

আজ হঠাৎ 'আপনি' বলার কারণ কী? তা ছাড়া এমন আপ্যায়নের ঘটাই বা কেন? তবে কি সকালের দিকে আসিনি বলে পরিহাস করছে বিজলী? চকিতের জন্য মনে হল, এই মুহূর্তে অন্য কারও আসার কথা ছিল না তো? ভুলের বশে আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না তো বিজলী? আমার সমস্ত মন দ্বিধায় দুলতে লাগল। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে যে ভেতরে ঢুকব, পারলাম না। পেরেক ঠুকে কেউ আমার পা দু'টো আটকে রেখেছে।

বিজলী এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'কি আশ্চর্য, ভেতরে আসতে পারছেন না!' যদিও স্বরটা আগের মতোই সুধায় মাখানো তবু মনে হল, সে যেন একটু বিরক্ত হয়েছে।

আর পারলাম না! কী একটা যেন আমার ওপর ভর করে বসল। দরজাটা ভেজানো ছিল। মৃদু ঠেলা দিতেই সেটা খুলে গেল। আর সেই স্রোতটা এক ধাক্কায় আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

বাইরের দরজাটা ঠেললেই ড্রয়িং রুম। মার্কারি ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় ঘরখানা

উদ্ভাসিত। সোফা, ফ্যাশনেবল টি-পয়, কার্পেট, মৎস্যাধারে লাল-নীল মাছেদের খেলা। শুধু একটাই ব্যতিক্রম। অন্য দিন অন্তত গণ্ডাখানেক বয় কি বেয়ারা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে। কখন বিজলী অঙ্গুলি হেলনে তাদের ডাকবে কি কোনো কাজের কথা বলবে, সে জন্য সব সময় তারা উদ্‌গ্রীব, তটস্থ।

আজ এই সুসজ্জিত, রুচিশোভন ড্রইং-রুমটায় কোথায় বা বয়গুলো, কোথায়ই বা বিজলী! কারোকেই এখানে আবিষ্কার করতে পারলাম না। তবে কোত্থেকে বিজলীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল? বিমূঢ়ের মতো আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পর বিজলীর গলা আবার শোনা গেল, 'ভেতরে এসেছেন?'

আধফোটা স্বরে কী উত্তর যে দিলাম, ভাল করে নিজেই বুঝতে পারলাম না।

বিজলী বলল, 'এক কাজ করুন, ডানদিকে এগিয়ে এসে যে দরজাটা পাবেন সেটা ঠেললেই খুলে যাবে। আর খুললেই যে-ঘরটা পড়বে আমি সেখানেই আছি। অনুগ্রহ করে চলে আসুন।'

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই অকল্পনীয় এমন কিছু আছে যা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমার সমস্ত স্নায়ু কুকুরের মতো চকিত হয়ে উঠল। মন্ত্রচালিতের মতো পায়ে পায়ে ডানদিকের দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমি জানি দরজাটার ওপারেই বিজলীর শোবার ঘর।

চোখ-কান বুজে যেভাবে মানুষ অতলে ঝাঁপ দেয় ঠিক সেইভাবেই দরজাটা ঠেলে বিজলীর শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। আর ঢুকতেই সমস্ত সৌরজগৎ প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটায় দুলে উঠল। নাকমুখ দিয়ে সোডার ঝাঁঝের মতো তীব্র কিছু একটা বেরিয়ে আসতে লাগল। আর মেরুদণ্ড বেয়ে আগুনের দ্রুতবহ একটা স্রোত ছুটে গেল।

ঘরের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে চমৎকার একখানা খাট। তার ওপর উঁচু, নরম বিছানা। লাল রেশমি চাদরে সেটা ঢাকা। বেড-কভারের মতো ঝালর-দেওয়া বালিশগুলোও টকটকে লাল। মনে হয় একটা আগুনের সমুদ্র। আর তার মাঝখানে শ্বেতপদ্মের মতো বিজলীর প্রায় নিরাবরণ দেহটি অলস ভঙ্গিতে শায়িত। পরনের স্বচ্ছ শাড়িখানা তার এলোমেলো।

প্রথমে মনে হল, অবাস্তব একটা স্বপ্ন। মনে হল, আমার হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে গেছে এবং স্বয়ং মহাকাল পার্শি কলোনির এই ঘরখানিতে তার রথের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

অবিশ্বাস্য। তবু নির্নিমেষ চোখে খাটের সেই স্বর্গটাকে দেখতে লাগলাম। স্তম্ভের মতো দুই উরু, সুগভীর নাভি, সোনার কলসের মতো পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত বুক দু'টি যেন দুই গিরিচূড়া। অমন নিভাঁজ হাতের দিকে তাকিয়েই বুঝি বাহুলতার কল্পনা এসেছিল। পুরুষের বুকে যত প্রলোভন গুহায়িত হয়ে আছে সে-সব দিয়ে ওই সুচারু শরীরের সৃষ্টি।

কতক্ষণ আর। হঠাৎ অস্ফুট, ভীত শব্দ করে পায়ের কাছে থেকে একটা রক্তবর্ণ চাদর টেনে ক্ষিপ্র হাতে নিজেকে ঢেকে ফেলল বিজলী। ক্ষণিক স্বর্গটা মুহূর্তে অদৃশ্য হল।

আমার চেতনাও ফিরে এল যেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললাম। পায়ের তলায় মেঝেটা অশান্ত ঢেউ-এর মতো দুলছিল। পড়েই যেতাম। পাশের রেডিওগ্রামটা ধরে পতন রোধ কবলাম।

এতক্ষণে নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিয়েছে বিজলী। তড়িৎগতিতে বিছানায় উঠে বসে কর্কশ, রুক্ষ সুরে সে বলল, 'এ কি, তুমি!'

একটু আগে যা অনুমান করেছিলাম, তা-ই। অন্য কারও আসার কথা ছিল। বাঞ্ছিত অতিথির বদলে আমি এসে পড়েছি। কে আসত, জানি না। যে-ই আসুক, এই ঘরেই সে আসত। প্রায় অনাবৃত দেহে নিজের শোবার ঘরে ডেকে আনা কী ধরনের আপ্যায়ন! আমার রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

এ-সময় এখানে আমি অবাঞ্ছিত। সেটা বুঝে উঠতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। অবরুদ্ধ স্বরে কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করলাম। কথাগুলো স্পষ্ট হল না। গলার ভেতর থেকে গোঙানির মতো খানিকটা আওয়াজ বেরিয়ে এল মাত্র।

চাপা, তীব্র গলায় এবার চেঁচিয়ে উঠল বিজলী, 'কে, কে তোমাকে এখন আসতে বলেছে?'

থতিয়ে থতিয়ে কোনোরকমে বললাম, 'মানে এদিকে এসে পড়েছিলাম। তাই ভাবলাম তোমার—'

বিজলী ভেংচে উঠল। আগের মতো একই সুরে বলতে লাগল, 'তাই ভাবলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাও! খুব উপকার করেছ, একেবারে স্বর্গের সিঁড়ি খুলে দিয়েছ আমার।' শ্লেষে ব্যঙ্গে ঠোঁটের প্রান্ত দু'টো বেঁকে গেল তার।

এমন হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর চেহারায় আগে আর কখনও বিজলীকে দেখিনি। আমি মুখ তুলতে পারছিলাম না। একটা অপরাধী ভাব আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। সকল অস্তিত্ব চারদিক থেকে ক্রমাগত গুঞ্জন করতে লাগল, 'কেন আজ এখানে এসেছিলি? বিজলীর দরজার সামনে এসে যখন দাঁড়িয়েছিলি, তখনও ফেরার সময় ছিল। তখন ফিরে গেলে এই দুঃসহ অপমানটা তো মাথা পেতে নিতে হত না।'

বিজলী সমানে বলে যাচ্ছে, 'সন্ধেবেলা তুমি এখানে আসো, এ আমি চাই না। আভাসে-ইঙ্গিতে অনেক বার এ-কথাটা তোমাকে আমি বুঝিয়েছি। তবু তুমি কেন, কেন এলে?'

আমি নিশ্চুপ।

বিজলী বলতে লাগল, 'স্পষ্ট করে না বললে বুঝি কিছুই বুঝতে পারো না? অপদার্থ কোথাকার।'

এবারও কিছু বললাম না। ঘাড়টা আলগা হয়ে আরো একটু ঝুলে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ঘামতে লাগলাম। আর ভাবলাম, ঊর্ধ্বশ্বাসে এখনই এখান থেকে ছুটে পালাই। এই ঘরখানায় এয়ার-কুলার দিয়ে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও পরিবেশটা শীতল এবং আরামদায়ক তবু মনে হল, অসহনীয় উত্তাপ চারপাশ থেকে আমাকে বেষ্টন করতে শুরু করেছে।

দম বন্ধ করে দৌড়ই লাগাতাম কিন্তু তার আগেই বাইরের কলিং বেলটা বেজে উঠল। বিজলী চমকে আমার দিকে একবার তাকাল। বিচলিত সুরে বলল, 'তোমাকে নিয়ে এখন আমি কী করি!'

আমি চুপ।

বাইরে কলিং বেলটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বিরক্ত, বিপন্ন সুরে বিজলী বলল, 'কী বিপদে যে তুমি আমাকে ফেললে!' বলতে বলতে পরনের শিথিল শাড়িটা দ্রুত জড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে উঠে এল সে, 'এখন কোথায় তোমাকে লুকোই?'

যথারীতি আমি নিরুত্তর।

কলিং বেলটা একটানা তীব্র ঝঙ্কারে বেজে চলেছে। নিচের রক্তাভ, নরম ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে চোখ কুঁচকে কী যেন ভেবে নিল বিজলী। পরমুহূর্তেই সমস্যাটার যেন সমাধান করে ফেলেছে এমনভাবে বলে উঠল, 'এক কাজ কর ললিতদা, এস আমার সঙ্গে।' বলে ব্যস্তভাবে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাঁ দিকের একটা দরজার কাছে নিয়ে এল। সেটা খুলে আমাকে ওধারের ঘরে ঢুকিয়ে বলল, 'এখানে চুপ করে বসে থাক। যতক্ষণ আমি না ডাকছি, কোনোরকম শব্দ করবে না আর এখান থেকে বেরোবারও চেষ্টা করবে না। তুমি যে আছ, কেউ যেন টের না পায়।'

এটাও শোবার ঘর। কার্পেট, খাট, কৌচ আর টি-পয়ে চমৎকার সাজানো। আমাকে এখানে নির্বাসন দিয়ে নিজের শোবার ঘরে ফিরে গেল বিজলী। সেখান থেকে হাতল ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বুঝলাম, বন্দি হয়েছি। আমার মুক্তির চাবিকাঠিটা বিজলীর হাতে। যখন তার সময় হবে, আমি ছাড়া পাব।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। দরজা বন্ধ করে দিলে পাশের ঘরের শব্দ শোনা যায় না বললেই হয়। পার্শি কলোনির এই ফ্ল্যাটে এ-অভিজ্ঞতা আমার আগেই হয়েছিল।

বিজলীর শোবার ঘর থেকে ক্ষীণভাবে তার সুধায়-ডোবানো স্বর শুনতে পেলাম। ইংরেজিতে সে বলছে, 'কাম ইন প্লিজ। ফার্স্ট ইনসাইড দা ড্রইং রুম, দেন টার্ন রাইট—'

ভুল করে আমাকে যা-যা বলেছিল হুবহু তা-ই উচ্চারণ করে যাচ্ছে বিজলী। বুঝলাম, যে আগন্তুক অশান্ত হাতে কলিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছে এ-আহ্বান তারই উদ্দেশে।

হঠাৎ সেই কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। বিজলীর শোবার ঘরে ঢুকে যে অবস্থায় তাকে দেখেছিলাম, আগন্তুকটি কি সেইভাবেই তাকে দেখবে? নিজের উগ্র শরীর ঘিরে তেমন স্বর্গই কি সাজিয়ে রেখেছে বিজলী? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠলাম। সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় ভেঙে পড়ল আমার।

কুকুরের মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে দাঁড়িয়ে আছি। পাশের ঘরের অস্পষ্ট কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারছি, আগন্তুকটি সেখানে এসে গেছে।

উৎকর্ণ হয়ে থেকেও কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছি না। নিরেট দেওয়ালের ওপার থেকে চাপা ফিসফিসানির মতো শব্দ ভেসে আসছে মাত্র। বিজলীরা কী বলছে? কী করছে?

জানবার জন্য পিঁজরায়-বাঁধা পশুর মতো ঘরময় ছোটাছুটি শুরু করলাম। কিন্তু দুই ঘরের মাঝখানে কোথাও এমন কোনো ছিদ্র নেই যেখানে কান অথবা চোখ রাখতে পারি।

অবশেষে ক্ষিপ্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে দরজার পাল্লায় কান রাখলাম। টুকরো টুকরো, অসংলগ্ন দু-চারটে কথা শুনতে পেলাম। যেমন, 'কাস্টম অফিস', 'কাইন্ডলি', 'এয়ারপোর্ট', 'দশ লাখ'। খণ্ড খণ্ড সেই শব্দগুলিকে জোড়া লাগালে সম্পূর্ণভাবে কিছু বোঝা যায় না।

শুনতে শুনতে আমার চোখদু'টি আচমকা দরজার তলার দিকে চলে গেল। পাল্লা আর মেঝের মাঝামাঝি অংশে খানিকটা। বোঝা গেল, বিজলীর ঘরে নীল রঙের আলো জ্বলছে।

কিন্তু কতক্ষণ আর। সেই আলো সিনেমা হলের বাতির মতো ক্রমশ স্তিমিত হতে হতে একসময় গাঢ়, গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

নয়

এ-ঘর থেকে যখন মুক্তি পেলাম রাতের দ্বিতীয় প্রহর তখন শেষ, তৃতীয় প্রহর শুরু হয়ে গেছে। পুরো একটা রাতও নয়, রাতের খানিকটা ভগ্নাংশ। তবু মনে হল, একটা যুগ, নাকি একটা শতাব্দীই এ-ঘরে আটকে আছি।

দরজা খুলে দিয়ে বিজলী স্নিগ্ধ স্বরে ডাকল, 'এস ভাই ললিতদা—'

ভয় যে আমার ছিল না, তা নয়। এ-ঘরে পুরো দরজা বন্ধ করার আগে বিজলী আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যেভাবে আমাকে সে লাঞ্ছিত করেছিল সেটা শেষ হয়নি। নিশীথের সেই আগন্তুক এসে না পড়লে আমার অবস্থা কী হত, ভাবতে সাহস হয় না। ভয় ছিল এ-ঘর থেকে বাব করে অসমাপ্ত লাঞ্ছনার জের টানবে বিজলী। কিন্তু তার স্বরের স্নিগ্ধতা আমাকে আশ্বস্ত এবং বিস্মিত করে তুলল। বিস্মিত, কেননা একটু আগে যে উগ্র নিষ্ঠুর চেহারায় তাকে দেখেছি, এ-কণ্ঠস্বর তার সঙ্গে মেলে না।

বিজলীর শোবার ঘরে যেতে যেতে একবার চমকে উঠলাম। বুকের ভেতর হাজার কাঠিতে একটা দামামা গুর গুর করে উঠল। ও-ঘরে গিয়ে সেই আগন্তুকটিকে দেখতে পাব না তো?

বিজলী আবার বলে উঠল, 'ও কি, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এস। আমি তো আসতেই বলছি।'

আগন্তুকটি যদি ও-ঘরে থাকেই, তাতে আমার বুকের এ অস্থিরতা কেন? নিজের চেতনা এবং অবচেতনার সকল দিক বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু এ-অস্থিরতার কোনো ব্যাখ্যাই মিলল না।

বিজলীর শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, তার অতিথিটি নেই। তবে কি অন্য কোনো ঘরে রয়েছে?

এত রাতে স্নান সেরে বর্মী মেয়েদের মতো রঙিন লুঙ্গি আর ঢোলা টি-শার্ট পরেছে সে। চুলগুলো দ্রুত ব্রাশ টেনে পেছন দিকে ফেরানো। ভাল করে বোধ হয় গা মোছেনি।

কপালে -ঘাড়ে-গলায় জল রয়েছে। চুল থেকেও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। ডান হাতে:
তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে একটা জলন্ত সিগারেট। কড়া তামাকের ঝাঁঝালো গন্ধে ঘরে:
বাতাস আচ্ছন্ন।

আমার একটা হাত ধরে একেবারে তার বিছানায় নিয়ে বসাল বিজলী, তারপর মুখখান
কাঁচুমাচু করে বলল, 'আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না?'

অপমানটা আমার বুকে তপ্ত শেলের মতো বিঁধেছিল। আহত, রুদ্ধ স্বরে বললাম, 'না
রাগের কী আছে!'

'মুখে না বললে কি হবে, রাগ তুমি নিশ্চয়ই করেছ। দেখ ললিতদা, তখন আমা:
মাথার ঠিক ছিল না। কী বলতে কী বলে ফেলেছি।'

'ঠিকই বলেছ।' আমার অভিমানটা আর চাপা রইল না। ক্ষুব্ধ গলায় বললাম, 'তুমি
চাও না, বিকেলের পর তোমার এখানে আসি। এসে যখন পড়েছি তখন অমন কথ
শুনতেই হবে।'

'সত্যি বলছি, অন্যায় হয়ে গেছে।' আমার হাত ধরে মিনতি করতে লাগল বিজলী
'এবারকার মতো ক্ষমা করে দাও। প্লিজ, লক্ষ্মী দাদা আমার।'

কী আর করব। চুপ করে রইলাম।

আমার একটা হাত ধরে আদুরে, কচি মেয়ের মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বিজলী
বলতে লাগল, 'মুখ বুজে থাকলে চলবে না। বল, বল আমায় ক্ষমা করলে? নইলে
তোমাকে ছাড়ব না।'

এবার হেসে ফেললাম।

আমার হাত ছেড়ে দিল বিজলী। কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গলার সুরে টান দিয়ে বলে
উঠল, 'বাব্বাঃ, তোমার হাসি দেখে বাঁচলাম। যাক, তা হলে এবার থেকে সন্ধি তো?'

হাসতে হাসতেই বললাম, 'সন্ধি না করে উপায় আছে? তুমি যা মেয়ে—'

'একটু আগে তোমাকে যে-সব কথা বলেছি তা কিন্তু মনে পুষে রাখতে পারবে না।'

'বেশ, রাখব না। ভুলে যাবার ঐশ্বরিক একটা ক্ষমতা আছে আমার। ছেলেবেলায়
ক্লাসের পড়া ভুলে যেতাম। ফলটা কী হত জানো? বছর বছর ফেল। তোমার আজকের
গালাগালগুলো ভুলতে সময় লাগবে না।'

সত্যিই কি আজকের এই অসম্মান এবং লাঞ্ছনার ক্ষত আমার প্রাণ থেকে এত সহজে
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? এত দ্রুত বিজলীর সেই ক্ষিপ্ত, নিষ্ঠুর মুখটার কথা বিস্মৃত হব? যাই
হোক, এ-সব ভেবে দেখার অবকাশ আপাতত আমার নেই।

পরিহাস-তরল লঘু সুরে আরো দু-চার কথার পরই সময় সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে
উঠলাম, 'উরে বাবা, দেড়টা বেজে গেল। এবার আমি চলি বিজলী।'

আমি উঠতে যাব, বিজলী অবাক হয়ে বলল, 'এত রাতে কোথায় যাবে?'

'কেন, আমার আস্তানায়।'

'তুমি কি পাগল হলে ললিতদা! এই রাত দেড়টায় খার-এ যাবে কী করে? লাস্ট বাস,
লাস্ট ট্রেন—সব কখন চলে গেছে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। বরং রীতিমতো দুশ্চিন্তার। তবু বললাম, 'সে একরকম করে চলে যাব।'

'থাক. অত বাহাদুরি আর করতে হবে না।' আমাকে প্রায় ধমকই দিল বিজলী।

বিপন্ন সুরে বললাম, 'তাহলে থাকব কোথায়?'

'ও মা, মুখ দেখে মনে হচ্ছে জলে পড়েছ যেন।' ভ্রূ বাঁকিয়ে বিজলী প্রখর দৃষ্টি হানল।

'না মানে—'

'থাক, আর মিনমিন করতে হবে না। রাতটুকু কষ্ট করে আমার এখানেই কাটিয়ে দাও।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একসময় আমিই নীরবতা ভাঙলাম, 'আচ্ছা বিজলী—'

বিজলী তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'তোমার বেয়ারাগুলোকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তারা সব আজ গেল কোথায়?' জিজ্ঞাসু চোখে বিজলীর দিকে তাকালাম।

'আজ বিকেল থেকে কাল সকাল পর্যন্ত তাদের ছুটি দিয়েছি।' বলতে বলতে কী যেন মনে পড়ে গেল বিজলীর। সুর নামিয়ে চাপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ গো ললিতদা, হঠাৎ বেয়ারাদের খোঁজ নিচ্ছ যে?'

'এমনি—মানে—'

'মানেটা আর তোমাকে বলতে হবে না। আমি কষ্ট করে বুঝে নিয়েছি।' মুখটা আমার কাছাকাছি এনে বিজলী ফিসফিসিয়ে উঠল, 'কেন, একা বাড়িতে আমার সঙ্গে থাকতে ভয় করবে নাকি?'

আমি নিশ্চুপ।

কৌতুকের ছিলাটাকে কষে বেঁধে বিজলী শর হানল, 'হায় রে পুরুষ!' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তার মধ্যক্ষীণ, সুগঠিত শরীর ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।

আমি এবারও নিরুত্তর।

আচমকা হাসি থামিয়ে গলাটাকে অতল খাদে নামিয়ে দিল বিজলী, 'আমার যদি ইচ্ছে হয় যে-কোনো সময় তোমার সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়তে পারি। বেয়ারারা কি তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? ভয় নেই, তোমার কাছে অন্তত আমি রাতের বাঘিনী হব না।'

জড়িত স্বরে কোনোরকমে বললাম, 'না, সেরকম কিছু—' কথাটা অবশ্য শেষ করতে পারলাম না।

'থাক, আর তো-তো করতে হবে না। কত রাত হয়েছে খেয়াল আছে? খেতে চল।'

আমাকে নিয়ে ডাইনিং রুমে চলে গেল বিজলী। বাবুর্চিরা খাবার তৈরি করে রেখে গিয়েছিল। ক্ষিপ্র হাতে সেগুলো গরম করে নিল সে। তারপর দু'জনে খেতে বসলাম।

খেতে খেতে সাধারণ কথাবার্তা হতে লাগল। আর তারই ফাঁকে হঠাৎ নিশীথের সেই আগন্তুকটার কথা একসময় আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আচ্ছা বিজলী—'

'কী?'

'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভয়ানক লোভ হচ্ছে, অথচ ঠিক সাহস পাচ্ছি না।'

'সাহস পাচ্ছ না, কী এমন কথা?' সকৌতুক, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল বিজলী।

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'সন্ধের পর যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি কে?'

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং কঠিন হয়ে উঠল বিজলীর। সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলে উঠল, 'কেন বল তো ললিতদা? কিছু দরকার আছে?'

তার স্বরের উত্থানপতনে এবং চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু রয়েছে যাতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'না, দরকার আর কী। এমনি, নিছক কৌতূহল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজলী বলে উঠল, 'ভদ্রলোক আমার বিশিষ্ট বন্ধু।'

এ কেমন বন্ধু, যাকে আলুথালু পোশাকে শোবার ঘরে আমন্ত্রণ করে আনতে হয় এবং যার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরের আলো সিনেমা হলের আলোর মতো স্তিমিত হতে হতে নিভে যায়? প্রশ্নটা করতে গিয়েও থমকে গেলাম। জেনে বুঝেও বোকার মতো বললাম, 'তোমার সেই বন্ধুটি চলে গেছেন?'

বিজলী জানায়, 'অনেকক্ষণ।'

এরপর আর কোনো কথা হল না। নিঃশব্দে খাওয়া সেরে বেসিনে আঁচিয়ে বিজলীর সঙ্গে তার শোবার ঘরে এলাম।

বিজলী তার বিছানায় বসে সিগারেট ধরাল। মুখোমুখি একটা সোফায় বসে আমিও সিগারেট ধরালাম।

সিগারেট খেতে খেতে বিজলী বলল, 'তুমি তো খার-এ থাক, তাই না?'

শহরতলির কোন প্রান্তে থাকি, সেটুকুই শুধু বিজলীকে জানিয়েছিলাম। তাতেই সন্তুষ্ট ছিল সে। রাস্তার কী নাম, বাড়ির নম্বর কত, কিছুই তাকে বলিনি। এটা দমবন্ধ-করা বস্তিতে চার শরিকের এজমালি ঘরে থাকি, ঘটা করে এ-কথা জানাতে সঙ্কোচও হয়েছে। অবশ্য বিজলী জানার জন্য পীড়াপীড়িও করেনি।

বললাম, 'হ্যাঁ, খারেই থাকি। কেন বল তো?'

বিছানা থেকে উঠে প্যাড আর কলম নিয়ে এসে বিজলী বলল, 'তোমার ঠিকানাটা বল, লিখে রাখি।'

দু'মাস হল বিজলীর এই পার্শি কলোনির ফ্ল্যাটে যাতায়াত করছি, কিন্তু আমার ঠিকানা সম্বন্ধে কোনোদিন এত উদ্গ্রীব হতে তাকে দেখিনি। কিছুটা অবাক হয়েই বললাম, 'আমার ঠিকানা নিয়ে কী করবে?'

'আগে বলই না। তারপর বলছি কী করব।'

আমি টালবাহানা শুরু করে দিলাম, 'আমি যেখানে থাকি সেটা ভারি জঘন্য জায়গা। একটা বস্তিমতো—'

'জায়গাটার ব্যাখ্যা কে শুনতে চাইছে? আমি শুধু তোমার ঠিকানাটা চাই।' বিজলী বলল।

রাস্তার নাম, 'চাওল'-এর নম্বর—সব লিখতে লিখতে বিচিত্র একটু হাসল বিজলী। আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার ঠিকানা কেন নিলাম বল তো?'

বিমূঢ়ের মতো উত্তর দিলাম, 'কেমন করে বলব?'

'তোমার আস্তানায় কোনোদিন তো যেতে বলনি। ঠিকানাটা রেখে দিলাম, একদিন ঠিক গিয়ে হাজির হব। তোমার নেমন্তন্নের আশায় আর থাকব না।' বিজলী হাসতে লাগল।

ভয়ানক লজ্জা পেলাম। প্রায়ই এখানে আসি। আকণ্ঠ ভাল ভাল খাবার খেয়ে ফিরে যাই। অথচ ভুলেও কোনোদিন বিজলীকে আমার ঠিকানায় আমন্ত্রণ করিনি। পার্শি কলোনির এই উচ্চচূড়ের বাসিন্দাকে আমার সেই হট্টমন্দিরে কোথায় নিয়েই বা বসাব! ম্রিয়মাণ, শিথিল সুরে বললাম, 'তুমি তো জানো না, আমি কেমন পরিবেশে থাকি। খুব অল্প মাইনে পাই। তাতে বোম্বাই শহরে কী অবস্থায় থাকা যায়, নিশ্চয়ই সে-কথা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। সেখানে তোমার মতো মানুষকে নিয়ে যেতে কেন যে আমার সঙ্কোচ, ত:--'

আমাকে বাধা দিয়ে কপট অভিমানে বিজলী বলল, 'বুঝেছি বুঝেছি, আমি যাই, তুমি তা চাও না। তাই হাজারটা ওজর তুলছ।' একটু থেমে, জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে জেদী মেয়ের মতো আবার শুরু করল, 'তুমি যতই আপত্তি কর, আমি যাবই একদিন।'

আর কিছু বললাম না। বিজলী যেদিন সত্যিই খারের সেই এজমালি ঘরে হানা দেবে সেদিন আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে সে-কথা কল্পনা করে একেবারে কাঁটা হয়ে রইলাম।

একটু চুপ। তারপর বিজলীই আবার বলে উঠল, 'ঢের রাত হয়ে গেছে! চল, তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দিই গে।'

আমি উঠে পড়েছিলাম। হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল বিজলীর। ব্যস্তভাবে বলল, 'একটু বসো ললিতদা—'

নির্দেশমতো বসে পড়লাম।

ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ঘেঁষে চমৎকার একখানা আলমারি। সেটা খুলে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ এবং তরল ওষুধে ভর্তি কাচের অ্যাম্পুল নিয়ে এল বিজলী। অ্যাম্পুলের মাথা ভেঙে সিরিঞ্জে ওষুধ পুরতে পুরতে সে বলল, 'একটা উপকার কর তো।'

'কী?'

'আমার হাতে এই ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দাও দেখি।'

'আমি!' ভীত সুরে বললাম, 'কিন্তু কোনোদিন কারোকে তো আমি ইঞ্জেকশান দিইনি।'

'কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। নীডল্‌টা চামড়ার তলায় একটু ফুটিয়ে আস্তে আস্তে পুশ করে যাও।' বিজলী বলতে লাগল, 'অন্য দিন বেয়ারা টেয়ারারা কেউ দিয়ে দেয়। আজ তারা নেই, তাই মুশকিল হয়েছে। আর নিজেই যে নেব, তা আমি পারি না।'

কাচের আধারের তরলটুকু সিরিঞ্জে টেনে নিয়েছিল বিজলী। আমার হাতে সেটা দিয়ে নিজের অনাবৃত ধবধবে শুভ্র বাহু বাড়িয়ে দিল। বলল, 'দাও—'

প্রক্রিয়াটা আগেই বলে দিয়েছিল বিজলী। তা ছাড়া আশৈশব অসংখ্য বার ডাক্তার বা কমপাউন্ডারদের ইঞ্জেকশান দিতে দেখেছি। তবু হাত আমার কাঁপতে লাগল। কপালে কণা কণা ঘাম ফুটল। এর নামই বোধ হয় স্নায়ুভীতি।

বিজলী বলল, 'অত কাঁপছ কেন? তোমাকে কি খুন করতে বলেছি? বী স্টেডি—'

হাতের সেই অসহ্য থরথরানির বেগ কিছুতেই সামলাতে পারছি না। সজ্ঞানে নয়, যেন ঘোরের মধ্যে ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিলাম। বাহু থেকে সূঁচটা টেনে বার করতেই সেটা নিয়ে স্পিরিটে ধুয়ে বাক্সে পুরে রাখল বিজলী।

ইতিমধ্যে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছিলাম। উদ্বিগ্ন সুরে বললাম, 'তোমার কি কোনো অসুখ আছে?'

'কেন বল তো?' বিজলী জিজ্ঞেস করল।

'না, মানে ইঞ্জেকশানটা নিলে কিনা—'

হঠাৎ রাতের তৃতীয় প্রহরে পার্শি কলোনিকে চমকিত করে অপ্রকৃতিস্থের মতো খিলখিলিয়ে হেসে উঠল বিজলী। হাসতে হাসতে তার শরীর বেঁকেচুরে ভেঙে গলে পড়তে লাগল।

বিব্রত মুখে বললাম, 'হাসছ কেন?'

'হাসব না!' হঠাৎ হাসি থামিয়ে নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে বিজলী বলে উঠল, 'এই শরীরে তুমি রোগ দেখলে কোথায়?'

'তা হলে ওই ইঞ্জেকশানটা যে নিলে, সেটা কী জন্যে?'

আমার চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সকৌতুক, তরল সুরে বিজলী বলল, 'বুঝতে পারছ না?'

মাথা নেড়ে জানালাম, 'না।'

'আরে বাবু ওটা মরফিয়া।'

আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম, 'কী বলছ বিজলী! মরফিয়া ইঞ্জেকশান—মানে—'

চোখের কোণে একটু হাসল বিজলী। বলল, 'মানে মরফিয়া ইঞ্জেকশানই। আর কিছু নয়।'

কিছুক্ষণ থতিয়ে থেকে বলে উঠলাম, 'রোজ রাতেই তুমি মরফিয়া নাও নাকি?'

ঘাড় সামান্য হেলিয়ে সুর টেনে বিজলী বলল, 'রোজ—'

বলতে চাইনি তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'এ কী অভ্যাস করেছ বিজলী!'

'কী করব বল ললিতদা—' করুণ মুখে বিজলী বলতে লাগল, 'মদে আর আজকাল নেশা হয় না। আর নেশা না হলে ঘুম আসে না। হাজারটা উপসর্গ এসে জোটে। হজম হয় না। মাথার চাঁদিতে হাত দিলে দেখবে যেন পুড়ে যাচ্ছে। মরফিয়া না নিয়ে কী করি বল? ওটা নিলে তবু ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদুয়েক ঝিম মেরে পড়ে থাকতে পারি।'

আমি নিশ্চুপ।

বিজলী এবার বলে উঠল, 'আর কথা নয়। চল, তোমার শোবার জায়গা দেখিয়ে আসি।'

নিঃশব্দে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণ আগে যে-ঘরে বন্দি হয়ে ছিলাম, বিজলী আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। একটা খাট রয়েছে একধারে। নিপুণ হাতে বিছানা পেতে সে বলল, 'শুয়ে পড়। আমি চললাম।'

বিজলী তার ঘরে ফিরে গেল। বোতাম টিপে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চোখ বুজে কতক্ষণ ধরে যে এ-পাশ ও-পাশ করছি, খেয়াল নেই। নরম নিভাঁজ আরামদায়ক বিছানা, এয়ার-কুলারের কল্যাণে বছরের এই প্রথম ঋতুতেও সুখপ্রদ শীতলতা। খারের হট্টমন্দিরে আমার ছেঁড়া বেড-শিট আর চিটচিটে ময়লা বালিশের তুলনাটা পাশাপাশি মনে পড়ল। সে তুলনায় এ তো স্বর্গ।

এত অজস্র আরামের উপকরণ চারপাশে ছড়ানো, তবু ঘুমোতে পারছি না। নিবিড় কালো ডানা মেলে আমার চেতনার ওপর ঘুম নেমে আসছে না। ঘুরে ফিরে আজকের সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা ছায়াছবির মতো চোখের সামনে দিয়ে মিছিল করে যাচ্ছে। রতীশ হালদার তো আছেই। আমি শুধু ভাবছি, বিজলীকে আমি আজ কোন রূপে দেখলাম? এতকাল তাকে যেভাবে দেখেছি আজকের দেখাটা তার চাইতে একেবারেই আলাদা। এ কোথায় এসে পৌঁছেছে বিজলী!

চকিতের জন্য আরেকটা মুখ আমার স্মৃতির অতল থেকে উঠে এল। ধীরেশ। সেই ধীরেশ একদিন যে বিজলীর রক্তে এই ভয়াবহ জীবনের প্রথম জীবাণু ছড়িয়ে দিয়েছিল। এখন সে কোথায়? এই মুহূর্তে তাকে দেখার জন্য বুকের মধ্যে প্রবল আলোড়ন অনুভব করলাম।

পার্শি কলোনির এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, ধীরেশের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

সকালবেলা বিজলীর ডাকে ঘুম ভাঙল। কাল রাতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই।

ঘুম থেকে উঠেই খারে ফিরে যেতে চাইলাম। বিজলী বলল, 'সেখানে ফেরার এত গরজ কেন? যতদূর জানি পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকার কেউ নেই।'

বললাম, 'না, সে কথা নয়। কাল রাত্তিরে ফিরিনি তো—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই দু'চোখে ঝিলিক হেনে বিজলী বলে উঠল, 'তাই বল—'

'কী?' আমি সচকিত হয়ে উঠলাম।

'নিশ্চয়ই কেউ আছে। আমার কাছে এতদিন তুমি লুকিয়েছ।' বিজলীর ঠোঁটে আর চোখের প্রান্তে হাসি উথলাতে লাগল।

হতচকিতের মতো বলে উঠলাম, 'আরে না-না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। তোমাকে তো বলেছি, আমার ঘরে আরো তিনটি ছেলে আছে। আমি ফিরি নি দেখে নিশ্চয়ই তারা চিন্তা করছে। কোনোদিন তো এমন হয় না। রোজ রাতেই আমরা চারজন আস্তানায় ফিরে যাই। কেউ বাইরে থাকি না।'

'এই ব্যাপার!' বিজলী ঠোঁট ওলটাল, 'তিনটে পুরুষমানুষ ভাবছে! একটা মেয়ে যদি ভাবত তবু না হয় কথা ছিল। এখন তোমার খারে ফেরা হবে না ললিতদা। আজ অফিস যাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখান থেকে চান-খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়।'

একরকম জোর করেই আমাকে ধরে রাখল বিজলী। খাওয়া দাওয়া সেরে শেষ পর্যন্ত বেরোতে হল।

বিজলীদের বাড়ির নিচের তলায় আসতেই রতীশ হালদারের সঙ্গে দেখা। লোকটা যেন আমার জন্যেই ফাঁদ পেতে বসে ছিল। একটুক্ষণ থতিয়ে রইলাম। তারপর তাকে যেন দেখতেই পাইনি এমন ভান করে হাঁটতে লাগলাম।

কিন্তু রতীশকে এড়িয়ে যাব, সাধ্য কী। আমার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল সে, 'কি দাদা, চিনতেই পারছেন না যে?'

ঈষৎ লজ্জিত সুরে বললাম, 'কি আশ্চর্য, চিনতে পারব না কেন?'

'তা হলে অমন আড়াল দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন যে?'

'না না, পালিয়ে যাব কেন? সে কি কথা! সত্যি বলছি, তাড়াহুড়োয় আপনাকে খেয়াল করিনি।'

রতীশ হালদার অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে এল, 'অত তাড়াটা কিসের দাদা? আসুন আমার সঙ্গে।'

'এখন কোথায় যাব আপনার সঙ্গে!' আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

'খারাপ কোনো জায়গায় না, আমার ঘরে।'

'কী সর্বনাশ! এখন যেতে পারব না।' আমি দ্রুত পা চালিয়ে দাদার স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। সেখান থেকে বড়ী বন্দর, অর্থাৎ অফিস পাড়ার ট্রেন ধরব।

রতীশ হালদার আমার সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে চলল। বলতে লাগল, 'দাদা যে একেবারে তুফান মেলের মতো ছুটছেন। ব্যাপারটা কী?'

মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলাম, 'অফিস ভাই, অফিস—'

তৎক্ষণাৎ আর কিছু বলল না রতীশ। আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাদার স্টেশন এসে পড়ল। বললাম, 'এবার ফিরে যান রতীশবাবু, আপনার সঙ্গে এখন আর কথা বলতে পারব না। লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হবে। তারপর ট্রেন ধরব।'

'বড়ী বন্দর যাবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন তবে। আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে এক ট্রেনেই যাই।' রতীশ হালদার হাসল।

'আমার সঙ্গে যাবেন!' অপার বিস্ময় নিয়ে রতীশের দিকে তাকালাম।

রতীশ বলল, 'কেন, আপত্তি আছে?'

কাল একদিনের পরিচয়েই বুঝেছি রতীশ লোকটা সব সময়ই বকবকায়মান। দাদার থেকে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস অর্থাৎ বড়ী বন্দর পর্যন্ত রাস্তাটুকু এক মুহূর্তও সে থেমে থাকবে

না। কথার এই যন্ত্রটা অনবরত বকে বকে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। ভদ্রতা বজায় রাখতে বললাম, 'না, আপত্তি কিসের।'

আমার আপত্তি থাকলেও রতীশ যে সঙ্গ ছাড়ত না সে ব্যাপারে আমি নিঃসংশয়। জোঁকের মতো আমার গায়ে আটকেই থাকত। সম্মতি পাওয়ামাত্র এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করল না রতীশ। ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে বুকিং কাউন্টার থেকে বড়ী বন্দরের দু'খানা টিকিট কিনে আনল। তাকে বাধা দেবার সুযোগটুকু পর্যন্ত পেলাম না। আমার টিকিটের দাম দিতে গেলে এমন বিমর্ষ হয়ে পড়ল যে লজ্জা পেলাম। পয়সাসমেত হাতখানা পকেটে পুরে দ্বিধান্বিত সুরে বললাম, 'এটা কিন্তু ঠিক হল না রতীশবাবু। না, কিছুতেই না।'

রতীশ হাসল, 'আমি আপনার ছোট ভাই। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মনে খোঁচ রাখবেন না দাদা।'

রতীশ বলল বটে, তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এদিকে ট্রেন এসে গিয়েছিল। আমার সঙ্গীটি সোৎসাহে বলল, 'চলুন দাদা—' ট্রেনে উঠে একটা জানালার পাশে মুখোমুখি বসলাম। যদিও মুখোমুখি বসেছি তবু চোখ দু'টি আমার জানালার বাইরে ফেরানো। এই মুহূর্তে রতীশকে ভাল লাগছে না। তার অযাচিত, অবাঞ্ছিত সঙ্গ আমার সমস্ত চেতনাকে অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরে দিয়েছে। হয়তো অকারণেই। কারণ কিছু থাকলেও তা আমার অজানা।

বাইরে কোনো বিস্ময় নেই। বাড়িঘর, কারখানা আর হাউসিং কমপ্লেক্সের সারিবদ্ধ কোয়ার্টারগুলি অন্তহীন স্রোতের মতো ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে দৃশ্যপট বদলের জন্য ফাঁকা মাঠ, সমুদ্র থেকে উপচে আসা নোনা জলের বান, এক আধটা বস্তি। ইত্যাদি ইত্যাদি—

হঠাৎ রতীশ হালদার ফিসফিসিয়ে উঠল, 'দাদা—'

তার স্বরের মধ্যে কেমন একটা রনরনে, ধাতব রেশ মেশানো ছিল যাতে চকিত হয়ে মুখ ফেরালাম। উদ্বেগের সুরে বললাম, 'কী, কী বলছেন?'

'কাল রাতটা তা হলে ওখানেই কাটাতে হল?'

'কিসের—কার কথা বলছেন?'

'আপনার।' চোখের কোণে বিচিত্র হাসল রতীশ, 'বিজলীদেবীর ফ্ল্যাটেই তো ছিলেন কালকের রাতটা?'

'হ্যাঁ।' আস্তে আস্তে বললাম, 'কথায় কথায় অনেক রাত্তির হয়ে গিয়েছিল। বিজলী কিছুতেই ছাড়ল না। তাই—' সত্যি-মিথ্যে দুই মিশিয়েই বললাম। বিজলী আমাকে রাখার জন্য যে পীড়াপীড়ি করেছিল, সেটা পরের অংশ। আগের অংশে আমাকে দেখেই সে ক্ষিপ্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই লাঞ্ছনার ব্যাপারটা গোপন করে গেলাম।

আমার কথা যেন শুনতেই পায়নি রতীশ। দূরমনস্কের মতো বলল, 'রাতটা ভালই কাটল, কি বলেন?'

'ঘুমোতে অবশ্য বেশিক্ষণ পারিনি। দু'টো পর্যন্ত তো গল্প করেই কাবার করেছি। তবু রাতটা মোটামুটি খারাপ কাটেনি, বলতে পারেন।' মধ্য যাম পর্যন্ত যে একটা ঘরে বন্দি হয়ে ছিলাম, সে-কথাটা আর বললাম না। আমার বন্দিত্বের সময়টুকু গল্পের সমারোহে ভরিয়ে তুলেছি, এই মিথ্যেটা দিয়ে আসল সত্যকে আড়াল করলাম।

'গল্প করে রাত দু'টো পর্যন্ত কাবার করেছেন!' এমন সুরে রতীশ বলল, এমন চোখে তাকাল যাতে অনায়াসেই ভাবতে পারি, আমার কথাগুলো আদৌ সে বিশ্বাস করেনি।

অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বললাম, 'কেন, আপনার অবিশ্বাস হচ্ছে না?'

শান্ত, নিরুত্তেজ গলায় রতীশ বলল, 'না-না, তা কেন, তা কেন?'

বলল বটে, আমার সংশয় কিন্তু ঘুচল না। রতীশের মন থেকে যে অবিশ্বাসটা যায়নি, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। আর কিছু বললাম না। একটা বিচিত্র অবসাদ আমাকে যেন বেষ্টন করতে শুরু করেছে।

রতীশও চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। জানালার বাইরের চলমান দৃশ্য অখণ্ড মনোযোগে দেখতে লাগল।

আমাদের ট্রেন যখন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের কাছাকাছি, সেই সময় রতীশ হালদার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'আচ্ছা দাদা, কাল রাতে বিজলীদেবীর ফ্ল্যাটে যে লোকটা এসেছিল সে কে?'

মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে কী একটা যেন নেমে গেল। চমকে, উচ্চকিত স্বরে বলে উঠলাম, 'কার-কার কথা বলছেন রতীশবাবু?'

'বুঝতে পারছেন না?' চোখের তারায় অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়ে রতীশ হাসল।

বুঝতে ঠিকই পেরেছিলাম। এবং স্তম্ভিতও হয়ে গিয়েছিলাম। নিশীথের সেই আগন্তুক সম্বন্ধেই ইঙ্গিত দিয়েছে রতীশ। আমাকে আজ সকালে ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে না হয় অনুমান করেছে কাল রাতে বিজলীর ফ্ল্যাটে নিশিযাপন করেছি। কিন্তু সেই আগন্তুকটির কথা সে জানলো কেমন করে? যকের মতো দুই বাহু বিস্তার করে বিজলীকে সতর্ক, সজাগ দৃষ্টিতে পাহারা দিয়ে রাখছে কি সে? উপমাটা ঠিক হল না। যক তার একান্ত দুর্লভ সম্পদের কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। পৃথিবীর নিস্তব্ধ অন্ধকার কোনো গুহায় অজগর যেমন তার অজগরীকে শতপাকের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চায়, বিজলীকে ঘিরে রতীশেরও ঠিক তেমনই দুরন্ত অন্ধ জৈবিক কামনা। কিন্তু বিজলী তার আয়ত্তের বাইরে। তবু দূর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পাহারা দিয়ে তাকে নিয়ত ঘিরে রেখেছে রতীশ। আমার সংশয়, এই বোম্বাই শহরে আদৌ তার অন্য কাজ আছে কি-না। যদিও প্রাণধারণের জন্য মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের একটা চাকরি করে, আমার বিশ্বাস, সেটা রক্ষা করার জন্য তার বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা নেই। হয় চাকরিতে সে যায় না, নতুবা অফিস থেকে অনন্ত কালের ছুটি নিয়ে বসে আছে।

রতীশের এখন দু'টি মাত্র কাজ। দাদারের সেই চারতলা বাড়ির চিলেকোঠা ঘরখানিতে বসে সর্বক্ষণ বিজলীকে ধ্যান করা আর প্রতি মুহূর্তে তার দিকে তাকিয়ে থাকা

সম্ভবত বিজলীর কাছে যারা আসে তাদের দুর্লভ সৌভগ্যের কথা ভেবে সবসময় তার বুকে দুরন্ত, অক্ষম ক্ষোভ ফুলে ফেঁপে পাহাড়প্রমাণ হয়ে আছে। হায় প্রেমিক!

যেভাবেই হোক, নিশীথের সেই আগন্তুককে বিজলীর ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখেছে রতীশ। বুঝেও লুকোচুরি খেললাম, 'কই, কাল রাতে আমি ছাড়া কেউ বিজলীর কাছে যায় নি তো।'

রতীশ কিছু বলল না। শুধু তার কালো ঠোঁটের ফাঁকে চকিতের জন্য তীক্ষ্ণ হাসির একটি রেখা ফুটে উঠে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার মনে হল, সেই হাসিটিতে সূক্ষ্ম এবং মর্মান্তিক বিদ্রূপ মেশানো রয়েছে। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'ও কি, হাসলেন যে?'

রতীশ উত্তর দিতে গিয়েও থমকে গেল। সেই মুহূর্তে সাবার্বন ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। ট্রেনের সবাই অফিসযাত্রী। ট্রেন থামবার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বন্যার দুরন্ত ঢলের মতো তারা নামতে শুরু করেছে। রেসের ঘোড়ার মতো এখন তাদের একটিমাত্র লক্ষ্য, একটিমাত্র মন্ত্র—অফিস, অফিস। কোনোরকমে স্টেশনের সীমানাটা পার হলেই উর্ধ্বশ্বাসে তারা দৌড় লাগাবে।

ঢলটার সঙ্গে ভাসতে ভাসতে আমরাও বেরিয়ে এলাম। আমার সেই প্রশ্নটার কথা ভুলি ন। হাঁটতে হাঁটতে ফের জিজ্ঞেস করলাম, 'তখন হাসলেন যে?'

'এমনি।' নিস্পৃহ মুখে রতীশ বলল।

'না, এমনি নয়। কেন হাসলেন, বলুন।'

'শুনতে চান?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনার কিন্তু খুব খারাপ লাগবে।'

আমার ওপর অদম্য জেদ ভর করল যেন। বললাম, 'খারাপ-ভাল আমি বুঝব, আপনি বলুন।'

স্থির, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল রতীশ। মনে হল, আমার বুকের অতল পর্যন্ত সে দেখে নিচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তবে শুনুন, সেই লোকটার ব্যাপারে আপনি মিথ্যে বলেছেন।'

'মিথ্যে!' আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

'হ্যাঁ। রাগ করবেন না দাদা, একটা কথা বলি। আপনি খুব ভাল করেই জানেন, আপনি ছাড়াও বিজলীদেবীর ফ্ল্যাটে আরেকজন এসেছিল। তবে কে এসেছিল আপনার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। কেন, তা আমি জানি।'

'কেন?' নিজের অজ্ঞান্তে আমার গলা থেকে প্রশ্নটা ছিটকে বেরিয়ে এল।

রতীশ হাসল, 'কেন আবার। বিজলীদেবী বোধ হয় আপনাকে একটা ঘরে আটকে রেখেছিলেন, সেই জন্যে।'

আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। রতীশ হালদার লোকটা কি অন্তর্যামী, না চিলেকোঠার সেই ঘরখানিতে আড়ি পেতে বিজলীর ফ্ল্যাটের যাবতীয় খবর রাখে! বিজলী যে কাল রাতে তার

অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে মোহময়ী সেজে প্রায় নগ্ন, শিথিল শরীর বিছানায় এলিয়ে রেখেছিল, সে-কথাও কি রতীশ জানে? কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলাম। অবরুদ্ধ গোঙানির মতো একটানা খানিকটা শব্দ ছাড়া গলার ভেতর থেকে আর কিছুই বেরিয়ে এল না।

রতীশ আবার বলে উঠল, 'কাল রাতের সেই লোকটা যে কে, জানতে পারলাম না।' কথাগুলো কেমন যেন স্বগতোক্তির মতো শোনাল। তার স্বরের মধ্যে খানিকটা ক্ষোভ আর নৈরাশ্য মিশে আছে।

অক্ষমের ঈর্ষা। বুঝতে পেরেও বললাম, 'সেই লোকটাকে দিয়ে আপনার কী প্রয়োজন?'

রতীশ উত্তর দিল না। কথায় কথায় বড়ী বন্দর অর্থাৎ ফ্লোরা ফাউন্টেনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এখন যেদিকেই তাকানো যাক, অফিসগামী মানুষের স্রোত। হঠাৎ ব্যস্তভাবে রতীশ বলল, 'আচ্ছা দাদা, চলি। পরে আবার দেখা হবে।' বলেই মানুষের সমুদ্রে মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল।

দশ

আরো দু'টো মাস কাটল। প্রায় এক যুগ পর শীতশেষের এক সন্ধ্যায় আরব সাগরে এই কূলে বিজলীকে আবিষ্কার করেছিলাম। সেদিন সমস্ত প্রকৃতিতে ছিল ষষ্ঠ ঋতুর ঘো মেশানো, বাতাসের স্বভাব ছিল প্রমত্ত। কোনো শাসন-বন্ধনেরই অধীন ছিল না সে। আর সাগরের নোনা হাওয়া পুরো শীতের ঋতুটা কোনো একটা অদৃশ্য খাপে বন্দি হয়ে ছিল তারপর যেই ফাল্গুন পড়ল খাপের ভেতর থেকে মুক্তি পেয়ে অধীর চঞ্চলতায় পাক খেয়ে খেয়ে দিগ্বিদিকে দৌড় লাগাল। ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরিয়ে কি রাস্তার পাশের গাছগুলোর ঝুঁটি নেড়ে কিংবা হঠাৎ উচ্ছ্বাসে মেরিন ড্রাইভের বিলাসিনী মোহিনীদের বসন এলোমেলো করে দিয়ে তার যত আমোদ। সেই যে প্রগলভ রঙ্গিণী মেয়ে আছে হাজার কথাতেও যে রাগে না, হাজার গালাগালিতেও যার মুখ ভার নেই, বরং কী এক কৌতুকে সবার পেছনে লেগেই আছে, সেদিনের সেই বাতাস ছিল সেইরকম। সেদিন মহারাষ্ট্রের আকাশে কোথা এক টুকরো মেঘের চিহ্ন ছিল না। মাথার ওপরে যেখানে যতদূর তাকানো যেত, শুধু স্বচ্ছ নীলের চাঁদোয়া টাঙানো। আর ছিল পাখি। ফুলের রাশি রাশি পাপড়ির মতো রঙে সমারোহে আকাশকে তারা জমকালো করে রেখেছিল।

আর এখন? সেদিনের প্রগলভ বাতাসকে এখন চিনতেই পারা যায় না। লঘু পা নাচের ছন্দের যে পাক খেয়ে ফিরত সে নৃত্যপরা উধাও। বাতাস এখন আর শুধু বাতা নয়, এই আষাঢ়ে সেটা দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। লঘু চাপল্য তার নেই। আরব সাগরের কো কোটি জলকণা ধারণ করে সে কিছুটা মন্থর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বভাবটা গেছে অস্বাভাবি রকম বদলে। তাকে নিশিতে পেয়েছে যেন।

দিগন্তের ওপারে গর্ভিণী মহিষীর মতো কোথায় যে কালো কালো মেঘের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিল, কে বলবে। মৌসুমী বাতাস তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে বোম্বাই-এর মাথায় এনে স্তূপাকার করতে শুরু করেছে। গাঢ়, কালো, স্তরীভূত মেঘের তলায় মহারাষ্ট্রের আকাশ এখন অদৃশ্য।

মেঘস্তরের ওপারে কোথায় যেন জলসার আসর বসেছে একটা। বিরাট একটা মৃদঙ্গে দিবারাত্রি সেখানে গুরু গুরু ঘা পড়ছে। মাঝে মাঝে আকাশটাকে ফালা ফালা করে সরীসৃপের জিভের মতো বিদ্যুৎ চমকে যায়। পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডকে স্তব্ধ করে বাজ পড়ে। আরব সাগরের কূলে এই শহরটা সৃষ্টির প্রথম দুর্যোগের দিনে ফিরে যেতে শুরু করেছে বুঝিবা।

বৈশাখ থেকে আষাঢ়। এই তিনটে মাস যথারীতি পার্শি কলোনির সেই ঠিকানায় হানা দিয়েছি। বিজলীর সঙ্গে গল্প করেছি, দারুণ দারুণ খাবার খেয়ে অপার তৃপ্তি নিয়ে ফিরেছি। এই তিন মাসে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ঘটেনি। বিজলীর সেই অভ্যাসগুলির মনোযোগী নীরব সাক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। তিন মাসের নব্বই দিনে ক' হাজার সিগারেট সে পুড়িয়েছে, কত বোতল হুইস্কি খেয়েছে আর কত গ্রেন মরফিয়া নিয়েছে তা আমার মুখস্থ।

মাঝে মাঝে সংকল্প করেছি দু-চারটে ছুটির দিন আগের মতো সুধাংশুদের নিয়ে শহরের াইরে বেড়াতে যাব। এবং সে কথা তাদের বলেওছি। কিন্তু ছুটির দিনের ভোরে সযত্ন ালিত সেই সংকল্পটা নিঃশেষে মন থেকে মুছে গেছে। এ নিয়ে সুধাংশুরা প্রচুর ঠাট্টা রেছে। আমি লজ্জাও পেয়েছি। কিন্তু সমস্ত সান্নিধ্যের মধ্যে তপ্ত মাদকতার আস্বাদ ছড়িয়ে য মানবী পার্শি কলোনির ফ্ল্যাটে বসে আছে তার আকর্ষণ উপেক্ষা করব, এমন অপরিমেয় ানসিক শক্তি আমার নেই। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া অনেক করেছি। স্বৈরিণী, হ্যাঁ হুভোগ্যা স্বৈরিণী ছাড়া আজ আর কী-ই বা বিজলীকে বলা যায়? যত বার তার কাছে েছি, ফেরার সময় প্রতিজ্ঞা করেছি, এই শেষ, আর যাব না। কতকগুলো কদর্য অভ্যাসের াক্ষী থেকে জীবনের কোন চরিতার্থতায় পৌঁছব?

আশৈশব মেয়েমানুষের কোন রূপটি আমার চেনা? মাকে দেখেছি, বৌদিদের দেখেছি, বপাশের আরো কত মেয়ে দেখেছি, এমনকি শুশুরিয়ার মঠগামিনী, সন্ন্যাসিনী জলীকেও দেখেছি। তাদের কেউ মহৎ, কেউ নীচ অনুদার সঙ্কীর্ণমনা, কেউ উদাসীন। কউ ঈর্ষায় কুটিল, স্বার্থে হিংস্র।

নীচতা হীনতা মহত্ত্ব অনুদারতা—এই সব চিরদিনের চেনা লক্ষণগুলি ছাড়া তাদের ালমন্দের আর কোনো পরিচয় আমার জানা নেই। তাদের ভালত্ব বা মন্দত্ব, সমস্ত কিছুই ংসার এবং সমাজের নিয়ম কানুন মেনে। সামাজিক শাসন বা বন্ধনের বাইরে তাদের পা ফলতে দেখিনি।

কিন্তু আজকের এই বিজলীর পরিচয় কী? সে নীচ নয়, মহৎ নয়। সঙ্কীর্ণ বা ার্থসন্ধানী, কোনোটাই নয়। সমাজ বা সংসারের বন্ধন তার কোনোটাই নেই। অস্তিত্বের

গহন থেকে সরু সরু লতার মতো অসংখ্য জীবকোষ ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ সাগ্রহে, সবলে পরম তৃষ্ণায় সংসারকে আঁকড়ে ধরে। সংসারও তার কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে মানুষকে ছোট ছোট অণুর মতো তার অমোঘ আকর্ষণী শক্তি দিয়ে গেঁথে রাখে। পরস্পরের আকর্ষণে যত তীব্র হবে, ব্যক্তি এবং সংসারের পক্ষে ততই কল্যাণ। কিন্তু যেখানে তা শিথিল সেখানে প্রবল বিশৃঙ্খলা।

সাংসারিক বা সামাজিক, উভয় বন্ধন ছিন্ন করে আজকের বিজলী বেরিয়ে এসেছে। সে সংসারহীন, অসামাজিক। যে পারিবারিক শৃঙ্খলা মানুষকে তার কক্ষপথে ধরে রাখে তা থেকেও সে বিচ্ছিন্ন। সৌরমণ্ডলের নিয়মের বাইরে উদ্‌ভ্রান্ত একটা উল্কার মতো পার্শি কলোনির সেই মানবী অন্ধ গতিতে ছুটে চলেছে। পুরনো সব মূল্যবোধ যে পায়ে দলেছে নারীত্বের চিরন্তন স্বরূপটাকে খোলসের মতো দূরে ছুঁড়ে প্রমত্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে

সমাজবদ্ধ জীবনের বাইরে চূড়ান্ত অসংযম আর গাঁজলা তাড়ির মতো কোনো পঙ্কিলতার মাদক রসে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে বিজলী। লক্ষ্যহীন, নীতিহীন, শূন্যে ভাসমান এই দুরন্ত-গতি অসামাজিক রমণীটির কাছে নিজের বিবেকের সমস্ত শাসনকে দু'হাতে ঠেলে দিয়ে মোহাচ্ছন্নের মতো কেন ফিরে ফিরে যাই?

বাংলাদেশ থেকে বার শ' মাইল দূরের এই শহরে একটি স্বৈরিণীর কাছে যদি আমি যাই-ই, ভ্রূকুটি করার কেউ নেই। অবশ্য নিজের বিবেকটা বুকের ভেতরে মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠুর হাতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিই। কিন্তু কেন, কেন অজগরীর আকর্ষণে সম্মোহিত, আবিষ্ট কোনো প্রাণীর মতো পার্শি কলোনির বিবরে গিয়ে আমি ঢুকি?

সেখানে গিয়ে আমার কী লাভ? প্রথমত, স্বৈরিণীর উচ্ছিষ্টে উদর পূর্তি করতে পারি। দ্বিতীয়ত, দু-দশ টাকার জন্য কখনও যদি হাত পাতি সেটুকু অনুগ্রহ তৎক্ষণাৎ করবে বিজলী। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। স্থূলভাবে এর চাইতে বেশি আর কী পেতে পারি তার কাছে? জীবনের সমস্ত সুস্থতা থেকে ভ্রষ্ট একটি বিকৃত, নেশাগ্রস্ত গণিকা আমাকে এ ছাড়া আর কোন স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে?

সবই জানি, তবু আমার আসক্তি কেন ঘোচে না? আমার বিচার-বিবেক কেন বার বার বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হয়ে যায়?

তিন মাসে যতগুলি ছুটির দিন পেয়েছি, পার্শি কলোনিতে ছুটে গেছি। তা ছাড়াও বেশ ক'দিন অফিস কামাই করে হানা দিয়েছি। যতবারই গেছি, রতীশ হালদার আমাকে ধরে ফেলেছে। আমি গেলেই ধরবে বলে লোকটা অহরহ ফাঁদ পেতে বসে আছে বুঝি। নয়তো এমন একটা দুর্লভ মন্ত্র তার আয়ত্তে যাতে আগেভাগেই বুঝতে পারে আমি কখন বিজলীর কাছে যাব। যতই চুপিসারে লুকিয়ে চুরিয়ে আমি যাই না, রতীশের সজাগ চোখের দৃষ্টি এড়াতে পারিনি। অবশেষে যখন বুঝেছি, ওর পাল্লার বাইরে যেতে পারব না তখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল আর লুকোচুরি নয়, গোপনতা নয়, সকলের চোখের সামনে দিয়ে বিজলীর কাছে যাই।

তবে সব দিনই সরাসরি বিজলীর কাছে যেতে পারি না। মাঝপথ থেকে আমাকে তার ঘরে টেনে নিয়ে আটকে ফেলে রতীশ। যতই বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট হই না, রতীশকে এড়ানো অসাধ্য। ঝেড়ে ফেললেও সে সঙ্গ ছাড়ে না। মান-অপমান সম্মান-অসম্মানের মাঝখানে যে একটা সীমারেখা আছে সে সম্বন্ধে তার স্পষ্ট কোনো ধারণা বা বোধই নেই। রাগ অসন্তোষ বিরক্তি, কিছুই সে গায়ে মাখে না। দেহের চামড়া তার আশ্চর্য পুরু। কোনো সূক্ষ্ম খোঁচাই সেখানে বেঁধে না। আর চোখেরও পর্দা নেই। চক্ষুলজ্জা নামে বস্তুটিকে হাজার যোজন দূরে সরিয়ে রেখেছে সে।

শুধু কি পার্শি কলোনির সেই ম্যানসনেই, আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে একেক দিন খারে আমাদের হট্টমন্দিরে এসেও হানা দিয়েছে রতীশ। 'সব পথই নাকি রোমের দিকে ধাবিত'—এই প্রবাদবাক্যটির মতো রতীশের সমস্ত কথার কেন্দ্রে বসে আছে বিজলী। দিবারাত্রি তার এক জপমন্ত্র—বিজলী, বিজলী। এমন নিষ্ঠাবান ভক্ত ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। কাছে সে যায় না। দেখা হলেই বিজলী সম্বন্ধে প্রশ্নে প্রশ্নে ঝালাপালা করে ফেলে বটে, কিন্তু আরেক দিক থেকে সে আমাকে রক্ষা করেছে। কোনোদিন তাকে বিজলীর কাছে নিয়ে যেতে বলেনি। দূর থেকেই একাগ্রভাবে তপস্যা করে চলেছে। দেবী বরদা হবে কি না, সে ব্যাপারে কৌতূহল বা উৎকণ্ঠা কিছুই নেই।

মনে আছে, যেদিন রাত্রে শ্লথতনু নগ্নিকা বিজলীকে আমি তার শোবার ঘরে দেখেছিলাম তার দিনকয়েক পরে রতীশ বলেছিল, 'জানেন ব্রাদার সাহেব—'

মাঝে মধ্যে মজা করার জন্য সে আমাকে 'ব্রাদার সাহেব' বলে। সম্বোধনটা আমার ভাল লাগে না। রতীশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আমার রুচি নেই। কিন্তু মন্দ লাগার কথাটা তো আর সবসময় মুখ ফুটে বলা যায় না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী বলছেন?'

'বিজলীদেবীর ঘরে সেদিন রাতে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর পরিচয় তো বলতে পারেননি। আমি কিন্তু জেনে ফেলেছি তিনি কে।'

'কে তিনি?' উত্তেজিত স্বরে জানতে চেয়েছিলাম।

আমার কানে মুখটা গুঁজে দিয়ে ফিস ফিস করেছিল রতীশ, 'তবে যে বলেছিলেন সেদিন বিজলীদেবীর ফ্ল্যাটে আপনি ছাড়া আর কেউ যায়নি?'

থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। উত্তেজনার ঘোরে সেদিনের মিথ্যাভাষণের ব্যাপারটা খেয়াল ছিল না। বিব্রতভাবে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। কোন জবাবদিহিতে অসত্যটা খণ্ডন করা যায়, হাজার চেষ্টাতেও তা ভাবতে পারছিলাম না।

রতীশ আবার বলে উঠেছিল, 'সেদিন তা হলে মিথ্যে বলেছিলেন, না ব্রাদার সাহেব?'

'না, মানে এই—' থতিয়ে থতিয়ে কী যে উত্তর দিয়েছিলাম, নিজের কাছেই বোধগম্য হয়নি।

'লজ্জা পাবেন না। সেদিন আপনি যে অবস্থায় ছিলেন সে-কথা তো আর কারোকে বলা যায় না। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইওর ডিফিকাল্টি।' রতীশ হালদার আমার অস্বস্তি কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল বটে, আমি কিন্তু মুখ তুলতে পারিনি। কিছু বলিওনি।

রতীশ আবার বলেছে, 'সে-কথা থাক। সেদিন রাতে বিজলী দেবীর ফ্ল্যাটে যে অতিথিটি এসেছিলেন তার কথা শুনতে চান?'

একটু আগে যে অপ্রতিভ হয়েছিলাম, লজ্জা এবং অস্বস্তিতে মাথা নুয়ে পড়েছিল তা আর খেয়াল রইল না। নিশীথের সেই আগন্তুকটি সম্বন্ধে আমার প্রাণে অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল ছিল। চকিতে মাথা তুলে সাগ্রহে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, বলুন। লোকটি কে?'

'এয়ারপোর্ট কাস্টমসের একজন অফিসার।' রতীশ হালদার দাঁত বার করে হেসেছিল।

'কাস্টমস অফিসার?'

'হ্যাঁ, ব্রাদারসাহেব।'

চকিতের জন্য আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, সেদিন রাতে পাশের ঘরে আবদ্ধ থেকে অস্পষ্টভাবে কাস্টমস শব্দটা শুনেছি।

রতীশ আবার বলে উঠেছিল, 'আপনি যদি অনুমতি করেন, একটা গাঁইয়া রসের কথা বলতে পারি।'

'কী?' আমি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম।

'কাস্টমস অফিসার বিজলীদেবীর নাগর।'

'নাগর!' নিজের অজান্তেই রতীশের শেষ কথাটার প্রতিধ্বনি করেছিলাম।

'হ্যাঁ, ব্রাদারসাহেব।' কাছাকাছি এসে ফিসফিস করে ঘনিষ্ঠ সুরে রতীশ বলেছিল, 'দু'জনের মধ্যে খুব আশনাই।'

কথাটা মিথ্যে নয়। সেদিন রাতে চোখে কিছু না দেখলেও জন্তুর মতো আমার অন্য সব ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে উঠেছিল। পাশের ঘরে বন্দি থেকেও বিজলী এবং নিশীথের সেই আগন্তুকের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গ উত্তপ্ত কিছু একটা যে চলছে, তা নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলাম। রতীশের কথায় সায় দেওয়াই আমার উচিত ছিল। কিন্তু বিজলীর সঙ্গে সেই আগন্তুকটিকে একাকার করে কোনো কিছু ভাবতেই সমস্ত চেতনা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সুতরাং নীরব হয়েই ছিলাম।

রতীশ এবার আপন মনেই, অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে উঠেছিল, 'এর কোনো মানে হয়?'

'কিসের?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'এই কাস্টমস অফিসার মেনন মাদ্রাজী। বাঙালি হয়ে একটা মদ্রের সঙ্গে এমন ঢলাঢলি, নাচানাচি—ছিঃ!' রতীশ অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ সংগ্রহ করে রেখেছে। কথার মাঝখানে লাগসই একেকটা ছুড়ে দেয়। শব্দগুলো এমনই তীক্ষ্ণ, অর্থবোধক এবং তীব্র যে মুহূর্তে লক্ষ্যভেদ করে। সেগুলোর ধ্বনিমাহাত্ম্যও বিচিত্র। রতীশ যা বলেছিল তার মধ্যে ধিক্কার মেশানো তো ছিলই, তা ছাড়াও আরো কিছু ছিল। সেটা বুকের ভেতরকার নিরুদ্ধ, অনুচ্চার্য এক জ্বালা। জ্বালা না বলে তাকে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বলাই উচিত। বার শ' মাইল দূরের এই শহরে এক রূপসী বাঙালিনী তার স্বজাতির প্রতিনিধি রতীশের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একটি সাউথ ইন্ডিয়ানকে নিয়ে মেতেছে, রতীশ হালদারের ক্ষোভটা সেইখানে। নাঃ, বিজলীর স্বজাতিপ্রীতি নেই।

দারুণ বিতৃষ্ণা এবং মনস্তাপে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল রতীশ। তারপর হঠাৎ আবার বলে উঠেছিল, 'আচ্ছা দাদা—'

'কী?'

'সেদিন মাদ্রাজী বাচ্চার সঙ্গে বিজলীদেবীর কী কী কথা হয়েছিল, জানেন?' রতীশ আমার কানে মুখ গুঁজে দিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

তার ফিসফিসানি আমাকে উচ্চকিত করে তুলেছে। হকচকিয়ে গিয়ে বলেছি, 'কই, না—'

'পাশের ঘরের দরজায় কান রেখেও কিছু শুনতে পাননি?' ঠোঁটের দুই প্রান্ত কুঁচকে আর চোখের তারায় বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়ে নিঃশব্দে হেসেছিল রতীশ।

আগেও কয়েক বার আমার মনে হয়েছে, আজও আবার নতুন করে মনে হল, লোকটা কি অন্তর্যামী? দরজায় আমি কান পেতেছিলাম ঠিকই। কিন্তু অস্পষ্ট, অসংলগ্ন কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাইনি। অদম্য কৌতূহলে শেষ পর্যন্ত দরজা আর ঘরের মেঝের মাঝামাঝি যে সূক্ষ্ম ফাঁক আছে সেখানে চোখ রেখেছিলাম। রতীশ হালদার সে খবরও রাখে নাকি? আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলেনি রতীশ।

আরেক দিন রতীশ বলেছিল, 'আচ্ছা ব্রাদারসাহেব—'

ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে যখনই সে আমাকে ডাক দেয় তখনই বুঝতে পারি বিজলী সম্পর্কে কোনো গূঢ় প্রশ্ন এবার আসন্ন। মনে মনে প্রস্তুতও হয়ে যাই। মুখ তুলে সাড়া দিয়েছিলাম, 'কী?'

'বিজলীদেবী খুব সিগারেট খান, না?'

'হ্যাঁ, চেইন স্মোকার বলতে পারেন।'

'সারাদিনে আন্দাজ ক'টা?'

'শ'খানেক।' শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করেছিলাম যাতে রতীশ বুঝুক, বিজলীকে কোনোদিন যদি আয়ত্ত করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়, বিজলীর প্রতিদিনের শুধুমাত্র সিগারেটের খরচ যোগানো তার মতো মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের পক্ষে কত দুরূহ ব্যাপার।

একটু কী ভেবে রতীশ আবার বলেছিল, 'বিজলীদেবী খুব ড্রিঙ্কও তো করেন ব্রাদারসাহেব—'

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। নেশার কথা রতীশ যখন নিজের থেকেই উত্থাপন করেছে তখন সবিস্তার ঘটা করে আমি তা বলে যাব, যাতে অন্তত সে বুঝতে পারে পার্শি কলোনির সেই মোহময়ী মানবী কাম্য হলেও অলভ্য। আমি বলেছিলাম, 'ড্রিঙ্ক আবার করে না! মদে সারা দিনরাত একরকম ডুবেই তো থাকে।'

'মেয়েমানুষ। নিশ্চয়ই খুব মাইল্ড ড্রিঙ্ক করেন বিজলীদেবী, নয়?'

'মাইল্ড ড্রিঙ্ক মানে?'

'মানে এই ধরুন শেরি, বিয়ার, যার মধ্যে অ্যালকোহলের ভাগ কম। যা খেলে দারুণ একটা নেশা হয় না। অথচ বেশ একটু আমেজ মতো হয়, এই আর কি।' রতীশ হেসেছিল।

'কী যে বলেন—' রতীশের অজ্ঞতায় আমি কিছুটা ক্ষুব্ধই হয়েছিলাম, 'হুইস্কি, মশায় হুইস্কি। তা-ও আবার একেবারে নির্জলা, র। মাঝে মাঝে আবার 'রাম' 'কনিয়াক' আর ফরাসি মাল 'ক্রেম দ্য মন্থ ফ্রাপে' টানছে। মিডিল ইস্টের 'আরাক' পেলেও খায়। আলমারি ভরতি পেরনো, ভারমুথ আর ভ্যাট সিক্সটি নাইনের বোতল মজুদ।'

অকপট বিস্ময়ে রতীশের চোখের তারা কপালে গিয়ে ঠেকেছিল, 'বলেন কী ব্রাদারসাহেব!'

'ঠিকই বলি ভাই। শুধু কি তাই—'

'তবে?' এবার খুব কাছে এসে ঘন হয়ে বসেছিল রতীশ হালদার।

'মদে আজকাল আর নেশা হয় না বিজলীর।'

বিমূঢ়ের মতো আমার কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করেছিল রতীশ, 'নেশা হয় না!'

'না। এমন একটা স্টেজে বিজলী পৌঁছেছে, মদের সাধ্য নেই ওর চোখে রং লাগায়। এদিকে—'

'কী?'

'নেশা না হলে ওর ঘুম আসে না, ভাত হজম হয় না। বলুন তো কী সাংঘাতিক অভ্যাস!'

আমার কথা যেন শুনতেই পায়নি রতীশ। গোলাকার চোখের স্থির দৃষ্টি আমার মুখে রেখে বলে উঠেছিল, 'দিনের পর দিন ঘুম না হলে, হজম করতে না পারলে মানুষ তো বাঁচে না। বিজলীদেবী তা হলে কী করেন?'

রহস্যময় হেসে বলেছিলাম, 'আপনি আন্দাজ করুন দেখি।'

তক্ষুনি মাথা নেড়ে রতীশ হালদার বলেছিল, 'পারব না।'

'তা হলে শুনুন, রোজ রাত্তিরে শোবার আগে মরফিয়া ইঞ্জেকশান নেয় বিজলী।'

'বলেন কী দাদা!' বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রতীশ বলেছিল, 'শেষ পর্য মরফিয়া ইঞ্জেকশান!'

বিজলীর জীবন-চরিতের ব্যাখ্যাতা হিসেবে আমার উৎসাহ তখন শীর্ষবিন্দুে পৌঁছেছিল। তত্ত্বজ্ঞানীর মতো মৃদু হেসে বলেছিলাম, 'এতেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন! আর যদি শুনতেন—'

এবার চমকে উঠেছে রতীশ হালদার। শিথিল সুরে জিজ্ঞেস করেছে, 'এর ওপরে আর কিছু আছে নাকি!'

'আছে বইকি। যদি শুনতে চান—'

আমাকে বাধা দিয়ে রতীশ হালদার বলে উঠেছে, 'শুনব, নিশ্চয়ই শুনব। আপনি বলুন—'

'একদিন হুইস্কির ঘোরে বিজলী জানিয়েছিল, মাঝে মাঝে কোকেনও সে খেয়ে থাকে'

শুনে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল রতীশ, 'কোকেন!' স্বরের মধ্যে চাপা, তীব্র উত্তেজনা ছিল তার। চোখের তারা দু'টো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। একটু আগের সবিস্ময় বিহ্বলতা আর ছিল না।

রতীশের সমস্ত চোখমুখ আর অবয়ব ঘিরে ইঙ্গিতময় অথচ দুর্বোধ্য এমন কিছু ঘন হয়ে আসছিল যাতে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার স্নায়ুগুলো স্পষ্ট উচ্চারণে চিৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছিল, কী যেন একটা আসন্ন। ভীত সুরে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, কোকেন। তাতে কী হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়নি রতীশ হালদার। অনেকক্ষণ পর সমস্ত নিরুত্তেজ, স্বাভাবিক সুরে বলেছিল, 'না, কিছু হয়নি। তবে—'

'কী?'

'বিজলীদেবীর জন্যে ভারি দুঃখ হচ্ছে দাদা। হাজার হোক বাঙালি মেয়ে, তার ওপর আপনার আত্মীয়া। নেশা ওঁকে এমন করে মেরে ফেলছে! ভারি কষ্ট লাগছে দাদা।' বিষণ্ণ মুখে রতীশ বলেছিল। তার বুকের অতল থেকে অগণিত স্তর ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এসেছিল।

নেশাসক্ত, চরম উচ্ছৃঙ্খল একটি বাঙালি মেয়ের জন্য রতীশের বিষাদ যে আন্তরিক, তার দীর্ঘশ্বাসে যে কোনো ছলনার খাদ মেশানো নেই, সেটুকু অনায়াসেই অনুভব করা গিয়েছিল। মুহূর্তে রতীশের দুঃখের অংশীদার হয়ে গিয়েছিলাম। তার বিষাদ আমাকেও স্পর্শ করেছিল। গাঢ়, গভীর স্বরে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, মেয়েটা নেশা করে করেই একদিন মরে যাবে।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। বিজলীর জন্য আমাদের দু'জনের মিলিত কষ্টের চাপে সমস্ত আবহাওয়াটা বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল বুঝি। একসময় রতীশ স্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠেছিল, 'আচ্ছা দাদা—'

খুব মগ্ন হয়ে বিজলীর কথা ভাবছিলাম। রতীশের ডাকে আনমনার মতো সাড়া দিলাম, 'কী বলছেন?'

' বিজলীদেবী কোকেন পান কোথায়?'

'কোথায় আর পাবে? দোকানে টোকানে নিশ্চয়ই—'

'উঁহু—' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়েছিল রতীশ হালদার।

এবার আমার অন্যমনস্কতা কেটে গিয়েছিল। কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তা হলে?'

'দোকানে তো কোকেন মেলে না।'

'তবে অন্য কোনো জায়গা থেকে নিশ্চয়ই যোগাড় করে।'

'সেই জায়গাটা কোথায়, আপনি জানেন?'

'না।'

'জানবার চেষ্টা করুন না একটু। পারবেন?'

রতীশের প্রশ্নটাকে গুরুত্ব না দিয়ে খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই বলেছিলাম, 'কেন পারব না? এ আর কী এমন কঠিন কাজ?'

আমার চোখে চোখ রেখে রতীশ বলেছিল, 'কেমন করে পারবেন শুনি?'

'কেন, বিজলীকে জিজ্ঞেস করব।' সরলতম পন্থাটার কথাই সবার আগে আমার মনে এসেছিল।

'তা তো হবে না ব্রাদারসাহেব। বিজলীদেবীকে কোনো প্রশ্ন না করে ট্যাক্টফুলি জানতে হবে।'

'ট্যাক্টফুলি!'

'হ্যাঁ! এমনভাবে খবরটা যোগাড় করবেন যাতে বিজলীদেবী জানতে বা বুঝতে না পারেন।'

একটু আগে রতীশের বিষাদ, দীর্ঘশ্বাস আর আন্তরিক দুঃখবোধ আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। বিজলীর জন্য তার আন্তরিকতা আমার প্রাণের গভীরে দোলা দিয়েছিল। কিন্তু কোকেনের ব্যাপারে যখন সে কপটতার আশ্রয় নিতে বলল তখন আমার স্নায়ুগুলো আবার সজাগ হয়ে উঠল। সংশয়ের সুরে বলেছিলাম, 'কেন, বিজলী জানলে কী হবে?'

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয়নি রতীশ. 'একটু অসুবিধা আছে দাদা।'

'কী অসুবিধা?'

'ব্যাপারটা আমি বিজলীদেবীর কাছে গোপন রাখতে চাই।'

রতীশের লুকোচুরিটা আমার ভাল লাগছিল না। বেশ বিরক্তভাবে বলেছিলাম, 'তা তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু কেন?'

'সব জানলে আপনি খুশিই হবেন।' রতীশ হেসেছিল, 'আচ্ছা, খুলেই বলছি। বিজলীদেবী যেখানে থেকে কোকেন যোগাড় করেন সে-জায়গাটা কোথায় যদি জানতে পারি, আমি নিজে সেখানে যাব।'

বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

'আপনি নিশ্চয়ই বিজলীদেবীর শুভাকাঙ্ক্ষী?'

'তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি?'

'আরে ছি-ছি, আমি তা ভেবে বলিনি। সে যাই হোক, এখন শুনুন।'

'বলুন।'

'জানেন তো কোকেন এমনিতে পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই এটা স্মাগলিং-এর মাল। সেখানে গিয়ে ভয় দেখিয়ে বলব যদি কাউকে বিক্রি করে তা হলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। ভেবে দেখুন বিজলীদেবী যদি কোকেন না পান, অন্তত নেশার একটা বদভ্যাস থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। কাজটা ভাল হবে না?'

কোকেন কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে বিকিকিনি হয় সে-সম্বন্ধে আমার পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা। রতীশের কথাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে বুঝতে চেষ্টা করব তেমন প্রয়োজন বোধ

করলাম না। নেশার ভয়াবহ অভ্যাসগুলি বিজলীকে আত্মহননের হঠকারী জগতে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে চলেছে। মৃত্যুগামিনী সেই মেয়েটার দুরন্ত গতিতে সামান্য বাধাও যদি রতীশ দিতে পারে সেজন্য কৃতজ্ঞ, গাঢ় স্বরে বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বিজলী যাতে বুঝতে না পারে সেইভাবেই কোকেনের ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা করব। আসুন দু'জনে মিলে ওকে ফেরাতে চেষ্টা করি।' বলতে বলতে রতীশের দু-হাত জড়িয়ে ধরেছিলাম।

একটু পর উচ্ছ্বাসটা কেটে গেলে নিজের আচরণ এবং অধীরতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। পার্শি কলোনির সেই বিকারগ্রস্ত এক গণিকার জন্য আমার প্রাণে এত ব্যগ্রতা কেন? জীবনকে হাতের মুঠিতে পুরে মৃত্যুর সঙ্গে যে বাজি ধরেছে তার জন্য কেন আমি অস্থির, চঞ্চল? বুকের এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে, কোথাও বুঝি সদুত্তর নেই।

এগার

পার্শি কলোনির সেই ঠিকানায় নিয়মিত হানা দিয়ে যাচ্ছিলাম। রতীশ হালদার বাজপাখির মতো মাঝপথে ছোঁ মেরে আমাকে তার আস্তানায় নিয়ে যাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে খারে আমার এজমালি হট্টমন্দিরেও আনাগোনা করছিল।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু আচমকা সমস্ত কিছু অন্য দিকে ঘুরে গেল।

দিগন্তের ওপার থেকে গর্ভিণী মহিষীর মতো কালো কালো জলবাহী যে মেঘের টুকরোগুলো মৌসুমি বাতাসের তাড়া খেয়ে মহারাষ্ট্রের আকাশময় জমা হয়েছিল, একদিন তারা গলতে শুরু করল। বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। আনুষ্ঠানিকভাবে বোম্বাইয়ে বর্ষা এসে গেল।

বোম্বাইয়ের বর্ষা। ছেদ নেই, বিরাম নেই, প্রহর আর যাম দিয়ে ঘেরা সময়ের সূক্ষ্ম চুলচেরা কোনো হিসেব নেই। সমস্ত কিছু একাকার করে দিয়ে আরব সাগরের পারের এই শহরটায় অবিরত ঝরছেই। সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে সৌরলোক থেকে নিক্ষিপ্ত পৃথিবী নামে একটি অগ্নিপিণ্ডের সর্বদেহের দাহ জুড়িয়ে দিতে যে বিরতিহীন বর্ষণের আয়োজন হয়েছিল তারই কিছুটা আভাস বোম্বাইয়ের এই বর্ষায় যেন পাওয়া যায়।

এই শহরের জীবনযাত্রার কোনো প্রান্তেই ঢিলেঢালা ব্যাপার নেই। প্রত্যহের দিনযাপন এখানে যান্ত্রিক, উর্ধ্বশ্বাস। অলস শিথিল দেহ বিছিয়ে আয়েশ করে কিছু উপভোগ করার অবকাশ নেই। প্রাণধারণের জন্য এখানে শুধু বিরামবিহীন দৌড়।

আর কিছুতে না থাক, বোম্বাইয়ের বর্ষায় কিন্তু মহাকাব্যের সমারোহ। দীর্ঘস্থায়ী ধ্রুপদ গানের মতো এই বর্ষা আলাপ, বিস্তার আর তানে মহারাষ্ট্রের এই শহরকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এত বড় নগরী, পৃথিবীর মানচিত্রে একটা গৌরবময় স্থান তার জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে। জীবনধারণের সবরকম সুবিধাই তার করায়ত্ত। প্রকৃতির প্রায় সমস্ত দুর্জয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অপসারিত করে বিজ্ঞান তাকে আধুনিক জগতে পৌঁছে দিয়েছে। অথচ এই বর্ষায় বোম্বাই কত অসহায়! ট্রাম, বাস, ট্রেন—যোগাযোগের সমস্ত ব্যবস্থাই বিচ্ছিন্ন হয়ে

গেছে। ধস, তুষারপাত, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা একদিন তাদের নিজের নিজের গুহায় বন্দি হয়ে থাকত, অপরিসীম ভীতিতে বাইরে বেরুত না পর্যন্ত। ঠিক তাদেরই মতো বোম্বাইয়ের প্রতিটি নাগরিক এই বর্ষায় যে যার বিবরে আবদ্ধ। মহারাষ্ট্রের আকাশ গলে গলে রাস্তায় যেখানে প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে সেখানে পা বাড়ানো অসাধ্য ব্যাপার। অফিস-বাজার, দোকান-পসার, কল-কারখানা—সবারই দুয়ার বন্ধ। এই বিশাল জীবন্ত শহরের ধমনী একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বোম্বাই। বিশ শতকের আধুনিকতম এই মহানগর বর্ষায় প্রকৃতির কাছে কি করুণভাবেই না আত্মসমর্পিত!

আজ দশদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সীসের রঙের মতো নিশ্ছেদ এক যবনিকা মহারাষ্ট্রের আকাশকে আবৃত করে রেখেছে। কোনোকালে মাথার ওপর স্বচ্ছ নীলের একটা চাঁদোয়া টাঙানো ছিল কিনা, সে সম্বন্ধেই সংশয় জাগে। সন্দেহ হয়, এই নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ কোনোদিন শেষ হবে কি না।

সুধাংশু গণেশ রজত এবং আমি, খারের এজমালি ঘরের আমরা চার বাসিন্দা বর্ষার শুরুতে চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা এবং কয়েক লিটার কেরোসিন তেল—প্রায় মাসখানেকের রসদ সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। কেন না, আমাদের চারজনেরই খাওয়ার ব্যবস্থা যত্রতত্র। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, এই শহরে যত জাত আছে তাদের সকলের সরাইখানায় অবিরাম বৃষ্টিতে হোটেলের সদাব্রত প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ যদি না-ও হয়, এই বর্ষণের মাঝে এমন একটা ফাঁক হয়তো পাওয়া যাবে না, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে জন্মসূত্রে পাওয়া জঠরের আগুন নিভিয়ে আসতে পারি। এই একটি আদি সনাতন আগুন যা পাকস্থলীর মধ্যে পুরে আমরা পৃথিবীতে এসেছিলাম, বোম্বাইয়ের বর্ষার সাধ্য নেই তাকে নির্বাপিত করে। বৃষ্টিতে আদৌ যদি ছেদ পড়ে, সেটা কখন, মধ্যরাতে কি ভোরবেলায় সে-সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই। অতএব আগে থেকেই আমরা খাদ্য সঞ্চয় করে রেখেছি।

বৃষ্টির প্রথম দু-তিনটি দিন মোটামুটি ভালই কেটেছে। প্রথমত ছুটির আনন্দ তো আছেই, ফাউ হিসেবে আনাড়ি, অপটু হাতে খিচুড়ি রান্নার আনন্দ। চারজনে মিলেমিশে আমরা রেঁধেছি, হুল্লোড় করে খেয়েছি।

রাঁধা-খাওয়া আর ছুটি ছাড়াও অতিরিক্ত একটা আনন্দের কারণ আছে। সেটা অবশ্য গণেশ সুধাংশু আর রজতের। আমি সেখানে বিব্রত, নতমুখ, কোণঠাসা প্রাণীমাত্র। ওদের আনন্দে ভাগ বসানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ওদের পরিহাসে আর জ্বালাতনে আমি শুধু ঘেমেছি।

সুধাংশু মুখ টিপে বলেছে, 'বর্ষাটা ভারি বিপদে ফেললে দেখছি।'

রজত বলছে, 'বিপদটা আবার কিসের? দিনকয়েক তোফা ছুটি পাওয়া গেল। হাত-পা মেলে একটু আরাম করা যাবে।'

গণেশ বলেছে, 'সারা বছরই তো ক'টা টাকার জন্যে ঘানিতে ঘুরছি। বর্ষা এলে তবু কয়েকটা দিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।'

সুধাংশু চোখমুখের বিশেষ ভঙ্গি করে কপট হতাশার সুরে এবার বলেছে, 'দূর, তোদের কিচ্ছু হবে না।'

রজত, গণেশ সমস্বরে জিজ্ঞেস করেছে. 'কী ব্যাপার, কী বলতে চাস তুই?'

সুধাংশু বলেছে, 'আরে বাপু, কোনো কথার মানে তোরা তলিয়ে বুঝতে চাস না। আমাদের আবার বিপদ কী! বরং বর্ষার কল্যাণে ক'টা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির হাত থেকে বেঁচে গেছি। তবে—'

'তবে কী?' গণেশ, রজত আবার প্রশ্ন করেছে।

'কী আবার।' আমার দিকে চোরা চোখের কটাক্ষ হেনে ঠোঁটের প্রান্তে সূক্ষ্ম হাসির চকিত একটি রেখা ফুটিয়ে সুধাংশু বলেছে, 'আমরা তো বাঁচলাম। কিন্তু দাদার—দাদার কী হবে?' বলতে বলতে বুঝি সীমাহীন দুঃখে বুকের গভীর থেকে তার দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছে।

গণেশ, রজত এবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। সোল্লাসে বলেছে, 'ঠিক বলেছিস মাইরি, আমরা শালারা একটু লেটেই বুঝি।' বলেই আমার একটা হাত ধবে গলার স্বরটা অতল খাদে নামিয়ে দিয়েছে, 'সত্যি দাদা, তোমার কী হবে?'

কী যে আসন্ন, আমার স্নায়ুগুলো স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। ভেতরের অস্বস্তি অবশ্য মুখচোখের কোনো রেখায় বা আচরণে কি কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠতে দিইনি। আমি বলেছি, 'কী হবে মানে?'

গণেশরা আমার কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। সুধাংশুর দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'কী ন্যাকামিই শিখেছে দাদা! আবার জিজ্ঞেস করছে কী হবে?' পরক্ষণেই আমার দিকে ফিরে বলে উঠেছে, 'সব বুঝে ছলনা করছ কেন গুরু?'

অস্বস্তিটা ক্রমাগত আমাকে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল। তবু যতটা সম্ভব স্বাভাবিক সুরেই বলে উঠলাম, 'কিসের আবার ছলনা? ও-বস্তুটা আমার ধাতে নেই।'

'অ্যাইও—' তিনজনে একসঙ্গে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, 'মিথ্যে কথা এক্কেবারে বলবে না।'

'মিথ্যে!'

'নয়তো কী?'

হাজার চেষ্টাতেও শেষ পর্যন্ত নিজের স্বরটাকে স্বাভাবিক, সংযত রাখতে পারিনি। ঈষৎ উগ্র সুরেই বলেছি, 'আমার কথায় বা কাজে মিথ্যেটা তোরা কোথায় পেলি?'

'শুনতে চাও?' সুধাংশু সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছে।

এবার ভয় পেয়ে গেছি। আমার বুকের ভেতর যে দুর্বল একটা জায়গা আছে তা আমি জানি। গলা নামিয়ে বলেছি, 'শুধু শুধু আমাকে নিয়ে কেন পড়লি তোরা?'

'কী করব, এই পচা বর্ষায় আর কোনো কাজ নেই যে। বাইরেও বেরোতে পারছি না। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো।'

'তাই বলে আমার পেছনে লাগতে হবে? কাজ নেই তো তাস বার কর—'

'উঁহু—'জোরে জোরে প্রচণ্ড বেগে মাথা নেড়েছে সুধাংশু। বলেছে, 'তাসের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমাদের সঙ্গে কী মিথ্যের খেলা খেলেছ সেটা শুনে নাও।'

ফাঁসির আসামী বিচারকের রায় শোনার জন্য যেভাবে প্রতীক্ষা করে তেমনি উৎকণ্ঠিত ভাবে বসে থেকেছি।

সুধাংশু বলে যাচ্ছিল, 'দেশের লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ বলে ক'মাস ধরে আমাদের ছুটির দিনের আনন্দটা মাটি করে দিচ্ছ। তা দিচ্ছ দিচ্ছ, কিন্তু দেশের লোকটা যে দারুণ সুন্দরী এক যুবতী নিজের থেকে কোনোদিন তা জানিয়েছ? এমন ভাব দেখিয়েছ যেন কোনো ভদ্রলোকের কাছে জরুরি কাজে যাচ্ছ। সেদিন সবাই মিলে চেপে না ধরলে ব্যাপারটা জানতে পারতাম? তা ছাড়া—'

আরো কী বলতে যাচ্ছিল সুধাংশু, তাকে থামিয়ে দিয়ে গণেশ হঠাৎ বলে উঠেছে, 'ট্রেন যে মেইন লাইন ছেড়ে কর্ড লাইনে ঢুকিয়ে দিলি।'

একটু অবাক হয়ে সুধাংশু বলছে, 'সে আবার কী?'

'হচ্ছিল দাদার বিপদের কথা। তুই কিনা দেশের লোকটা মেয়েমানুষ না পুরুষমানুষ, তাই নিয়ে খেপে উঠলি! কোন কথায় যে কোন কথা এনে জড়াস, তার ঠিকঠিকানা নেই। যত সব—'

সুধাংশু এবার সচেতন হয়ে উঠেছে, 'তাই তো রে—' বলতে বলতে আমার দিকে ফিরেছে সে। চোখ কুঁচকে বলেছে, 'ভারি ফ্যাসাদে পড়ে গেছ, না?'

'ফ্যাসাদ! কিসের?' আমি চকিত হয়ে উঠেছি।

'এই বর্ষাটা হাত-পা ভেঙে তোমাকে ঘরে আটকে রেখেছে। বাইরে বেরোতে পারছ না।'

'তাতে ফ্যাসাদের কী হয়েছে?'

'কিচ্ছু হয়নি তা হলে?' নিরীহ ভালমানুষের মতো আমার চোখে চোখ রেখে সুধাংশু বলে উঠেছে, 'কিন্তু—'

লক্ষ করেছি, গণেশ এবং রজতের চোখমুখ থেকে একটা সকৌতুক হাসি ফেটে বেরোতে চাইছে। আর প্রাণান্তকর চেষ্টায় সেটাকে তারা আটকে রেখেছে, বাইরে উপচে পড়তে দেয়নি। বিচলিত, শিথিল সুরে বলেছি, 'কিন্তু কী?'

সুধাংশু আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। বলেছে, 'এক কাজ কর দাদা, একটা ওয়াটার প্রুফ মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়।'

'তোরা কি পাগল হলি! কোথায় বেরবো?'

'আমাদের বউদির কাছে।'

এতক্ষণ যে-হাসিটা গণেশ আর রজতের চোখেমুখে আটকে ছিল, প্রবল বিস্ফোরণের মতো এবার সেটা বেরিয়ে এসেছে।

বর্ষার প্রথম দু-তিনটে দিন আমার পেছনে লেগেই কাটিয়ে দিল সুধাংশুরা। কখনও তারা বলেছে, 'এভাবে বুকের ভেতর ছটফটানি নিয়ে ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। দাদার উচিত পার্শি কলোনিতে চলে যাওয়া।'

কখনও বলেছে, 'যা বর্ষা, ওয়াটার প্রুফে কি ছাতায় বাগ মানবে না। তার চাইতে দাদা এক কাজ করুক, সাঁতার দিয়েই বউদির কাছে চলে যাক। না কি বলিস তোরা? প্রেমিকদের কাছে ঝড়-ঝঞ্ঝা-প্রলয়-ভূমিকম্প, এ-সব কোনো বাধাই নয়।'

এর মধ্যে রজত এক কাণ্ডই করে বসেছে। কাগজের এক পাখি বানিয়ে আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে সুধাংশুদের কানে কানে বলেছে, 'যা পাখি বল তারে, সে যেন ভোলে না মোরে—'

গণেশ রসিকতাটাকে আরেক পর্দা উঁচুতে তুলছে। রজতকে সে বলেছে, 'এই বৃষ্টিতে পাখিকে তো পাঠালি। সে কিন্তু পৌঁছতে পারবে না, বলে দিচ্ছি।'

'পৌঁছতে পারবে না কেন?'

'বৃষ্টিতে ভিজে হয় ডানা ভেঙে, না হয় নিমুনিয়া হয়ে মরে যাবে।' আমার দিকে চোরা চোখের চাহনি হেনে রজত হেসেছে।

'তা হলে উপায়?' কপট দুর্ভাবনায় গালে হাত দিয়ে চোখ গোল করে তাকিয়েছে রজত।

'উপায় হচ্ছে এই।' বলেই কাগজের একটা নৌকো বার করে দেখিয়েছে গণেশ।

'এটা দিয়ে কী হবে?'

'দ্যাখ না কী হয়।' বলতে বলতে ঘরের দরজা খুলে ফেলেছে গণেশ। বাইরে তীরের ফলার মতো অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। আমাদের 'চাওল'-এর গলিটা যেন বেগবান এক নদী, দূরের বড় রাস্তাটা বুঝি সমুদ্র।

গণেশ করেছে কি, কাগজের নৌকোটা গলির স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে ভাটিয়ালি গান ধরেছে ঃ

'ও পরবাসী নাইয়া রে-এ-এ-এ-এ—
এই তো নদীর উজান বাকে
লতুন মাটির চর।
হেইখানেতে আছে আমার পরান-বন্দুর ঘর।
কইও কথা বন্দুর কাছে
জলছাড়া মীন কযদিন বাচে?
তার বিহনে পরান গেল—
গেল রে—এ-এ-এ-এ
ও পরবাসী নাইয়া রে—এ-এ-এ-এ—'

গণেশ পূর্ব বাংলার ছেলে। পার্টিশানের কল্যাণে দেশ ছেড়ে এসেছে। এখনও পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী তার স্বরে লহর তুলে যায়। এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, গণেশের গলাখানি চমৎকার।

আমার ঘরের তিন হিস্যাদার, বিশেষ করে গণেশ এবং সুধাংশু বাংলাদেশের কোন দিগন্ত থেকে এসেছে, তা তো আমার অজানা নয়। সুধাংশু তার কাকার সংসারে অসহনীয়

গ্লানির মধ্যে দিন কাটিয়েছে। অবশেষে শুধু বাঁচার জন্য রক্ত বিক্রির টাকা পর্যন্ত কাকিমার হাতে তুলে দিতে হয়েছে। গণেশের জীবন তো আরো অন্ধকার। সংসার বাঁচাতে গিয়ে তার দিদিকে শরীর বিকিয়ে দিতে হয়েছে। আর শরীর বেচতে গিয়ে একদিন ছুরির ফলায় প্রাণ দিতে হয়েছে। বাংলাদেশ নরকের কোন অতলে গিয়ে ঠেকেছে, গণেশদের দিকে ভাল করে তাকালে তা বুঝতে পারা যায়। সেখানে প্রাণ ধারণের জন্য মেয়ে হলে শরীর বেচতে হয়, আর ছেলে হলে রক্ত।

যাদের জীবনের পশ্চাৎপট নিদারুণ গ্লানি আর অন্ধকারে দিয়ে ঢাকা, খুব স্বাভাবিক নিয়মেই তো তাদের সর্বক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকার কথা। কিন্তু গণেশ, সুধাংশু এমনকি রজতের স্বভাবের মধ্যে এমন সতেজ ব্যাপার আছে যাতে সবরকম দুঃখের দিকে ওরা পিঠ ফিরিয়ে থাকতে পারে এবং যে-কোনো প্রসঙ্গ, সে যত তুচ্ছ আর অকারণই হোক না কেন, তা-ই নিয়ে অফুরন্ত হুল্লোড় বাধিয়ে দিতে পারে।

যত সরস আর মজাদারই হোক না, আমার পেছনে তিন দিনের বেশি রজতরা লেগে থাকতে পারল না। ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা তাস বার করল। তাসের পেছনে সমস্ত উদ্যম ঢেলে দিয়েও চারদিনের বেশি অপচয় করা গেল না। অপরিসীম অবসাদ আমাদের ওপর ভর করে বসল যেন।

তিন আর চার মিলে মোট সাতটা দিন। অর্থাৎ পুরোপুরি একটা সপ্তাহ। মাসের এক চতুর্থাংশ। সাতটা দিন নয়, মনে হল, সাত যুগ আমরা খারের এই ঘরখানায় বন্দি হয়ে আছি। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই নির্বাসনে সাত দিন পর এমন একটা সময় এল যখন কারও সঙ্গই কারও ভাল লাগছে না। বহু ব্যবহারে জীর্ণ, মলিন, রহস্যহীন পরস্পরের সান্নিধ্যগুলি কেমন যেন দুর্বহ, অসহনীয় মনে হতে লাগল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জেনেছি, সুধাংশু যখন হাসে দু'পাশের দাঁত বার হয়ে মুখখানা কুৎসিত দেখায়। আর পেটটা হাসির প্রবল তোড়ে দোল খেতে থাকে। রজত সিগারেট খেয়ে ছুঁচোর মতো মুখ সরু করে ধোঁয়া ছাড়ে। গণেশের গলার স্বর ফ্যাসফেসে। অনেকটা ফেঁসে-যাওয়া ঢাকের মতো। এতদিন এই ত্রুটিগুলো প্রায় চোখেই পড়েনি। পায়রার খোপের মতো আলোবাতাসহীন একখানা ঘরে পরস্পরের নিয়ত সান্নিধ্যে থেকে এদের এই তুচ্ছ ত্রুটিগুলো বিপুল হয়ে আমার চোখে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল। চোখ ফেরালে সেই একই দৃশ্য, একই পরিচিত মুখ। কোথাও কোনো রহস্য নেই। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। হয়তো আমার শারীরিক কোনো ত্রুটি বা মুদ্রাদোষ ওদের কাছেও অসহ্য হয়ে উঠেছে।

কিংবা এ-ই হয়তো সত্যি, পরস্পরকে বেশি করে ভাল লাগার জন্য মাঝে মাঝে কিছুটা দূরত্ব প্রয়োজন। কাছে থাকলে আমরা হাত দিয়ে একে অন্যকে ছুঁতে পারি, চোখ দিয়ে দেখতে পারি, পরস্পরের শরীরের ঘ্রাণ নিতে পারি। সমস্ত কিছুই হয়ে যায় স্থূল, ইন্দ্রিয়গোচর। ইন্দ্রিয় দিয়ে কতক্ষণ আর পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা যায়। একসময় তাদের

বন্ধন শিথিল হতে বাধ্য। কিন্তু দূরে থাকলে মাঝখানের ফাঁকটা মন দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে ভরাট করে নেওয়া যায়। কল্পনার রসে পরিপুষ্ট কোনো সতেজ লতার মতো আমাদের উন্মুখ প্রাণ একে অন্যের দিকে ছুটে যায়। এই ছোটাটাই পারস্পরিক সম্পর্ককে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় ঘন করে রাখে।

কিছুদিন হাত-পা ছড়িয়ে শিথিল আলস্যে ডুবে যাব বলে যে-বর্ষাকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়েছিলাম, সাতটা দিন পার হতে না-হতেই সেটা অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। এখন সে বিদায় নিলেই মুক্তি পাই।

অন্য সব বছর ছ-সাত দিন একটানা ঝরেই বৃষ্টির দাপট কমে যায়। এবার আরব সাগরের বায়ুমণ্ডলে কী যেন বিপর্যয় ঘটেছে। তার ফল হয়েছে এই, একঘেয়ে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। আকাশে মেঘের যে ঘটা তাতে আরো দশ পনের দিনের মধ্যে তার থামার লক্ষণ নেই।

এই বর্ষায় অন্যের কী প্রতিক্রিয়া, জানি না। তবে আমার চিন্তা বা ভাবনা স্পষ্ট কোনো আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। ক্লান্তিহীন বৃষ্টি সমস্ত কিছুকে দুরন্ত প্রবাহে একাকার করে ফেলেছে। দ্বীপের মতো সংযোগ-বিচ্ছিন্ন এই ঘরখানার বাইরে আগে আদৌ আমরা কোনোদিন পা বাড়িয়েছি বলে মনে করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা এখানে নির্বাসিত হয়ে আছি। অফুরন্ত আলো, রোদ আর ফুরফুরে বাতাস দিয়ে ঘেরা একটা কাম্য জীবন আমরা বোধ হয় কোনো বিস্মৃত স্বপ্নলোকেই দেখেছিলাম। আমাদের প্রসারিত নাগালের মধ্যে কখনও তা নেমে আসেনি।

দিনকয়েক পর মানসিক এমন একটা জায়গায় আমরা পৌঁছলাম যখন খারের এজমালি ঘরে এই বন্দিত্ব দুঃসহ হয়ে উঠল। গণেশ, সুধাংশু আর রজত তো ভিজতে ভিজতে সেই ঢল-নামা দুর্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। কোথায় গেল, কে জানে। আমি অবশ্য বেরোলাম না, যদিও বেরোবার জন্য আমার সমস্ত স্নায়ুগুলো উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

বার

বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!

মনে হয় দু-দশ দিন নয়, কোন অনাদি অতীত থেকে সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে এই বর্ষণ শুরু হয়েছে। কোন সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যে অন্তহীন ধারায় তা ঝরে যাবে, কে বলবে।

ক'দিন ধরেই সুধাংশুরা দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আজও তারা ঘরে নেই। আমি জানি তারা কোথায় যায়। পশ্চিম বোম্বাইয়ের এই সৃষ্টিছাড়া 'চাওল'-এর অন্য সব খুপরিতে ওরা হানা দিচ্ছে। তিনজন অবশ্য এক জায়গাতেই যায় না। আলাদা আলাদা ঘরে গিয়ে ওঠে। একঘেয়ে ক'টা মানুষ দেখে দেখে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অন্য ঘরে ভিন্ন মুখ দেখে, ভিন রসের আড্ডা জমিয়ে সেই ক্লান্তি ঘুচিয়ে আসে।

আমিও খানিকটা বেঁচেছি। আমাদের ছোট্ট ঘরখানায় চারটি মানুষের মুখর জনতা সবসময় হাট বসিয়ে রাখত। প্রতিদিন কয়েক লক্ষ কথায়, সিগারেট এবং বিড়ির কটু গন্ধে ও ধোঁয়ায় আর বিজলীকে নিয়ে পুরনো ক্লান্তিকর রসিকতায় আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত। সুধাংশুরা বেরিয়ে যাবার পর আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি ঠিকই, তবে এই একাকীত্ব আমার চারপাশে মুক্তির বাতাস বইয়ে দিয়েছে। একাকীত্বও যে কত কাম্য, বোম্বাইয়ের এই বর্ষা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খিচুড়ি রেঁধেই সুধাংশুরা বেরিয়ে গেছে। বৃষ্টির ছাটটা দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসের ধাক্কায় ভোর রাত্তির থেকেই বেঁকে আছে। অতএব উত্তরের জানালাটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পুব দিক অর্থাৎ শিয়রের জানালাটা অবশ্য খোলা। তার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ছিলাম।

বাইরে কিছুই স্পষ্ট নয়। বৃষ্টির তীব্র ফলাগুলির ওপারে পেন্সিলের অস্পষ্ট আঁচড়ের মতো সারিবদ্ধ অগণিত নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে শিশুর হাতের আঁকাবাঁকা অনিপুণ ছবির মতো বস্তির পর বস্তি।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিজলীর কথা মনে পড়ে গেল। এই মুহূর্তে পার্শি কলোনির সেই মানবীর কথা আমি সজ্ঞানে ভাবিনি। গুহাগোপন কোনো অবচেতন থেকে তার মুখটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছে।

কত দিন? প্রায় দু'টো সপ্তাহ। এর মধ্যে বিজলীর সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি। মেরিন ড্রাইভে তাকে আবিষ্কার করার পর থেকে এত দীর্ঘ সময় বিজলীকে না দেখে থাকিনি।

কয়েক দিন অবিরাম বৃষ্টির পর মনে হয়েছিল, আমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা আচ্ছন্ন, নিরাকার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে চেতনার পটে বিজলীর মুখ ভেসে উঠতেই মনে হল, সেটা মিথ্যে। সংক্রামক রোগের মতো বাইরের বর্ষা প্রাণের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামতে শুরু করেছিল ঠিকই, কিন্তু তা আর কতক্ষণ?

বিজলী! বিজলী! বিজলী! প্রায় দিন পনের তাকে দেখিনি, তার কথা ভাবিনি। সে জন্যই বোধ হয় এই মুহূর্তে প্রাণের হাজার দিক থেকে অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা আমাকে ঘিরে ধরতে লাগল। তার প্রতিদিনের অভ্যাসগুলি, তার কথা, হাসি—সব ঠেলাঠেলি করে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতো চোখের সামনে ভিড় করে এল।

বিজলী-চরিতের প্রায় সব দিকই আমার জানা হয়ে গেছে। তার খাদ্যরুচি, পোশাকরুচি, যৌন কদাচার, নেশার প্রতি তার প্রচণ্ড আসক্তি—কিছুই আমার অজ্ঞাত নেই। বিজলী সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রায় সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করে ফেলেছি।

শুশুরিয়ার যে বিজলী ছিল ঈশ্বরসন্ধানী, মঠ ছাড়া যার সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে আর কোনো আশ্রয়ই ছিল না, সেই বিজলী ইদানীং মরফিয়া ইঞ্জেকশান ছাড়া ঘুমোতে পারে না, শূকর এবং মুরগির মাংস ছাড়া তার খাদ্যতালিকা অচল। যে ছিল বিলাস-বর্জিত, সাদা থান আর গেরুয়া ছাড়া যার আর কোনো আচ্ছাদন ছিল না, সেই মানুষই এখন দামি দামি সিফন সিল্ক জর্জেট ছাড়া শাড়ি পরে না এবং শর্টসের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ।

কিন্তু এ-সবই বিজলী সম্পর্কে মোটা দাগের খবর। তার পরিবর্তন এত চড়া সুরে বাঁধা, তার অর্জিত নতুন অভ্যাসগুলি এত তীব্র, এত প্রখর যে সেগুলো কষ্ট করে আবিষ্কার করতে হয় না। বিজলীর সান্নিধ্যে এলেই সে-সব নিমেষে চোখে পড়ে।

এত তথ্য তো সংগ্রহ করেছি, কিন্তু এগুলো একত্র হয়ে তার জীবনের কোন সত্যকে নির্দেশ করছে? শুশুরিয়ার যে-মেয়েটিকে আমি জানতাম তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরসন্ধান। তার শুভ্র থানে, দিনান্তের হবিষ্যান্নে, তার সংযত চলাফেরায়, তার গম্ভীর শব্দহীন হাসিতে তা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল। ধীরে ধীরে সকল পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আর মোহ থেকে মুক্তির মধ্যেই ছিল তার জীবনের সত্য। কিন্তু পার্শি কলোনির মদালসা ব্যভিচারিণীর জীবনের সত্যটা কী?

মনে আছে, ছেলেবেলায় বাবার কাছে শুতাম। খুব ভোরে তিনি আমার ঘুম ভাঙিয়ে মুখে মুখে ছড়া, বিশেষ করে মূল সংস্কৃত মহাভারত এবং পুরাণের অনেক শ্লোক শেখাতেন। সেই বয়সে অনেক শ্লোক আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আজকাল সব মনে নেই, অনভ্যাসে ভুলে গেছি।

জানালার বাইরে ঘনবর্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে একটা শ্লোকের কথা মনে পড়ল। শ্লোকটা মুখস্থ নেই। তবে ভাবার্থটা মনে আছে।

দ্রব্য এবং অর্থের উপভোগে যে হর্ষ আর প্রীতি জন্মায় তার নাম কাম। শুধু তাই নয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় যখন উন্মত্তের মতো বিষয়ভোগে নিরত হয় তার নামও কাম। তবেই দেখা যাচ্ছে, মানুষের কামোন্মাদনা স্থূল শারীরিক উপভোগকে ঘিরে। দেহের পাত্র ছাপিয়ে যাবার সামর্থ্য তার নেই। দেহেই সে জাত, দেহের উত্তেজক ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মাদক রস শুষে শুষে তার পুষ্টি।

মানুষ মাত্রেরই বিনাশ আছে কিন্তু কাম এমন বস্তু যার লয় বা ধ্বংস নেই। প্রসঙ্গত আরেকটা শ্লোক আমার মনে পড়ে গেল। সেটা পুরোপুরি কণ্ঠস্থ আছে :

ন জাতু কামঃ কামানুমুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের ভূয় এবচভিবর্ধতে।।
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবৎ হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাৎ পরিত্যজেৎ।।

শ্লোককার বলেছেন, কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা প্রশমিত হয় না। ঘৃতাহুতি পড়লে যেভাবে জ্বলে ওঠে, কামনা ঠিক সেইভাবেই বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত শস্য যব ধান স্বর্ণ পশু এবং রমণীয় স্ত্রী আছে একজনের পক্ষেও তা পর্যাপ্ত নয়, অতএব ভোগেচ্ছা ত্যাগ করাই উচিত।

নিষ্কাম হবার পরামর্শ দিয়ে শ্লোককার তো খালাস, কিন্তু তৃষ্ণা মরে কই? বিজলীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে, নিদারুণ তৃষ্ণায় তার দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু প্রখর শিখার মতো সর্বক্ষণ জ্বলছে। তার ভেতরে আগুনের কুণ্ডের মতো কিছু একটা ব্যাপার আছে যেখানে পৃথিবীর সমস্ত কাম্য বস্তু ছুড়ে দিলেও তা নিভবে না, বরং আরো লেলিহান হয়ে উঠবে।

প্রমত্ত কামনার পিছু পিছু হাত ধরাধরি করে বিজলীর জীবনে যারা এসেছে তাদের নাম ভোগ, উত্তেজনা, নেশা। দিনের পর দিন রাহুগ্রাসের মতো এদের ছায়া বিজলীর জীবনে এসে পড়ছে, সাপের মতো হাজার পাকের কঠিন বন্ধনে তারা মেয়েটাকে ঘিরে ধরেছে। তাদের বেষ্টনী থেকে বিজলীর মুক্তি নেই।

কিন্তু এই প্রবল ভোগ, এত উত্তেজনা, উন্মত্তের মতো এত যৌনাচার—এ-সব বিজলীকে কোন সত্যে পৌঁছে দিয়েছে?

ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই দরজায় মৃদু ধাক্কা পড়ল। প্রথমটা গ্রাহ্য করলাম না। মনে হল জোরাল বাতাস টুঁ মেরে মেরে ভেতরের বাসিন্দাদের খবর নিচ্ছে।

পরক্ষণের ধাক্কাটা প্রবল হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে অসহিষ্ণু, অস্পষ্ট গলা শোনা গেল, 'কে আছেন, দরজা খুলুন—'

গণেশ, সুধাশু বা রজত—ওদের কেউ ফিরল না তো? কিন্তু ওরা তো আর আপনি করে বলবে না। তবে কে হতে পারে? যে-ই হোক, বিছানা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মতো যে ঘরে ঢুকল, সে বিজলী। তার সর্বাঙ্গ ধূসর রঙের বর্ষাতিতে মোড়া। সেটা খুলতে খুলতে বলল, 'যাক, তা হলে ঠিক ঠিকানাতেই এসেছি। ভয় ছিল, এত বৃষ্টিতে চিনে বার করতে পারব কি না। অবশ্য এ-ব্যাপারে তোমার কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। যে-ভাবে ডায়াগ্রাম এঁকে দিয়ে এসেছিলে অন্ধও একটা হোঁচট না খেয়ে এসে পড়তে পারে। খার স্টেশনে নেমে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে ঘোড় বন্দর রোড। সেটা পেরিয়ে সাতটা গলি বাঁয়ে রেখে এইটথ গলিতে ঢুকে গোমাচাঁদ মারোয়াড়ির চাওল। তার—'

পথের হদিস এত বিস্তারিতভাবে আমি তাকে দিইনি। সে-ই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে। কিন্তু সে-কথা আমি ভাবছি না। শুধু বিমূঢ়ের মতো বিজলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ঠিকানা সে নিয়েছিল ঠিকই। আমার ধারণা ছিল সেটা নিতান্তই তার খেয়াল, আমাকে খুশি করার জন্য একটা খেলা মাত্র। সত্যিই যে বিজলী আমার দেওয়া পথে নিশানা অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত খারের এই হট্টমন্দিরে, তা-ও এই নিদারুণ দুর্যোগে মধ্যে এসে হানা দেবে, এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়। তা ছাড়া, এইমাত্র তার কথা ভাবছিলাম। যার কথা ভাবা যায় হঠাৎ সে যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, স্বাভাবিক নিয়মে বিমূঢ় হয়ে পড়ার কথা।

বর্ষাতিটা খুলে ফেলেছিল বিজলী। সেটা ঘরের একপাশে রাখতে রাখতে হঠাৎ সচেত হয়ে উঠল। ব্যস্তভাবে বলল, 'শিগগির দরজাটা বন্ধ করে দাও ললিতদা। ঘর যে ভে গেল।'

দরজাটা দক্ষিণমুখী। বৃষ্টির ছাটও দক্ষিণ দিক থেকে। লহমায় ঘরের মেঝেতে বা ঢেকে গেছে। ঘোরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

বিজলী আবার বলে উঠল, 'গামছা-টামছা কিছু একটা দাও দিকি। হাত-পা মু ফেলি—'

লক্ষ করলাম, শুধুমাত্র ওয়াটার প্রুফ দিয়ে দুর্যোগ ঠেকাতে পারেনি বিজলী। হাত পা-ই নয়, মাথা-মুখ-চুল, পরনের শাড়ি-ব্লাউজ—সব ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

গামছা তো চেয়েছে বিজলী, কিন্তু সেটার যা অবস্থা, দিতে ইচ্ছে করে না। তেল চিটচিটে, দিন দশেক কাচা পর্যন্ত হয়নি। বিজলী এবার তাড়া লাগল, 'কী হল, দাও।'

কুণ্ঠিত সুরে বললাম, 'সেটা ভারি ময়লা যে—'

'দাও দিকি।' একরকম জোর করেই গামছা নিয়ে মাথা মুছতে শুরু করল বিজলী।

আর স্তম্ভিতের মতো আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। পার্শি কলোনির স্বর্গলোকের সেই বাসিন্দাটি বস্তির এই বিবরে কত সাবলীল, কত সহজ। কোথাও তার এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য নেই। আমি কিন্তু ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছি। নিজের দীনতায় সঙ্কোচে ঘাড় থেকে মাথাটা আলগা হয়ে যেন ঝুলে পড়ছে।

গা মোছা হয়ে গিয়েছিল। বিজলী বলল, 'শাড়িটা একেবারে ভিজে গেছে. একটা শুকনো কাপড়-টাপড় দাও দিকি ললিতদা।'

'কিন্তু শাড়ি যে নেই—' ইতস্তত করে বলে ফেললাম।

বিজলী হাসল, 'তা জানি। বিয়েই তো করলে না, শাড়ি পাবে কোত্থেকে? বিয়েটা করলে এ-সময় আমার একটু উপকার হত তো। সে যাক গে, তোমার ধুতিটুতিই একটা দাও।'

ফরসা শুকনো একখানা ধুতি বিজলীর হাতে দিতেই সে বলে উঠল, 'এখন কষ্ট করে একটু পেছন ফিরে দাঁড়াও। শাড়িটা বদলে নিই।' নির্দেশমতো দাঁড়ালাম। শাড়ি বদলে বিজলী বলল, 'এবার ফিরতে পার।'

ঘুরে দাঁড়াতেই বিজলীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সে হাসল। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ললিতদা?'

'কী?'

'ঠিক উত্তরটা দেবে?'

কী প্রশ্ন করবে বিজলী, কে বলবে। কিছুটা অনিশ্চিত সুরে বললাম, 'আমার যদি জানা থাকে, নিশ্চয়ই দেব।'

আমার চোখে তার দৃষ্টি স্থির হয়েই ছিল। খুব আস্তে বিজলী শুধলো, 'আমি আসতে তুমি খুশি হওনি, না?'

চমকে উঠলাম. 'কী আশ্চর্য! তা কেন, তা কেন?'

'এই বৃষ্টি মাথায় করে সেই পার্শি কলোনি থেকে এতদূর ছুটে এলাম। কই, একবারও তো আমাকে বসতে বললে না। আমাকে দেখামাত্র মুখখানা তোমার কেমন যেন বেজার হয়ে গেছে।'

বিজলীকে দেখে উচ্ছ্বসিত যে হয়ে উঠতে পারিনি সেটা আন্তরিকতার অভাবে নয়, আমার আর্থিক অক্ষমতার কারণে। যেখানে আমি থাকি সেই পরিবেশটার হীনতায় এবং যেভাবে থাকি সেই জীবনযাত্রার দারিদ্র্য আমাকে জড়সড়, কুণ্ঠিত করে রেখেছে।

তুলনামূলকভাবে পার্শি কলোনির সেই স্বর্গলোক আর বিজলীর উষ্ণ আপ্যায়ন প্রতি মুহূর্তে আমাকে পীড়িত, বিদ্ধ করছে। তবু আমার ঘরে বিজলীর প্রথম আসাটা নিয়ে যে হই চই করে উৎসব বাধিয়ে তুলব, সব দৈন্য আন্তরিকতা দিয়ে পূরণ করে নেব, তা পারছি না। যাই হোক, বিজলীর কথায় খুবই লজ্জা পেলাম। বিব্রত মুখে বললাম, 'আমার ঘরে কোথায় যে তোমাকে বসতে দিই! আচ্ছা আমার এই বিছানাতেই বস।'

লঘু সুরে বিজলী বলল, 'আমি বললাম বলে তবু বসতে বললে। নইলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।' বলতে বলতে সে বসে পড়ল।

আমিও একটু দূরে বসলাম। কিছুক্ষণ পর বললাম, 'আচ্ছা বিজলী—'

'বল।'

'এই বৃষ্টির ভেতর তুমি এলে কেমন করে? রাস্তাঘাট সব ভেসে গেছে। ট্রেন-বাস বন্ধ। অবশ্য তোমার নিজের গাড়ি আছে। কিন্তু এর মধ্যে গাড়ি চালানোও তো অসম্ভব ব্যাপার।'

'তবেই বোঝো, তোমার ওপর আমার টানটা কেমন। তাই প্রলয় মাথায় নিয়েও চলে এলাম।' আমার মুখে চোরা দৃষ্টি হেনে নিঃশব্দে রহস্যময় একটু হাসল বিজলী।

আমি একটু অসহিষ্ণুই হয়ে উঠলাম, 'ঠাট্টা নয়, কেমন করে এলে বল।'

তক্ষুনি উত্তর দিল না বিজলী। একটুক্ষণ দূরমনস্কের মতো কী যেন ভাবল। তারপর নিজের হাত-পা দেখিয়ে সকৌতুক, চপল সুরে বলল, 'এগুলো নেড়ে চেড়ে চলে এলাম।'

বুঝলাম এই দুর্যোগে নিজের আসা নিয়ে শুধু মজাই করবে বিজলী। কীভাবে এসেছে, কিছুতেই সেটা খুলে বলবে না। সুতরাং এ-ব্যাপারে আমি আর পীড়াপীড়ি করলাম না।

বিজলী কী বুঝল, সে-ই জানে। আবার বলে উঠল, 'কেমন করে এসেছি, সেটা কোনো কথা নয়। এসে যে পড়েছি, সেটাই আসল ব্যাপার। অনেক দিন থেকেই বড় সাধ, তোমার ঘর-সংসার দেখে যাব। সময় করে উঠতে পারছিলাম না। আজ সময় হল, চলে এলাম; তা হ্যাঁ গো ললিতদা—'

'বল—' উৎসুক দৃষ্টিতে বিজলীর দিকে তাকালাম।

'তোমার ঘরে আরো ক'জন থাকে, বলেছিলে না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সেই সাঙ্গোপাঙ্গদের তো দেখছি না। এই বৃষ্টির ভেতর তারা সব গেল কোথায়?'

'একঘেয়ে ঘরে বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল। 'চাওল'-এর অন্য ঘরে আড্ডা দিতে গেছে। খাওয়ার সময় আসবে।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। অবশেষে একসময় বিজলীই নীরবতা ভাঙল, 'বুঝলে ললিতদা—'

'কী?' আমি মুখ তুলে তাকালাম।

'তুমি তো কোনোদিন আমাকে নেমন্তন্ন করনি। সে-ত্রুটিটুকু আজ শুধরে দিতে চাই। তোমার হয়ে আমি কিন্তু নিজেকে নেমন্তন্ন করে ফেলেছি। আজ আমি এখানে খেয়ে যাব।'

চকিত হয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছায়াছবির পর্দার মতো পার্শি কলোনির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত খাওয়ার ঘরখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর মনে পড়ল, বিজলীর সেই খাদ্যতালিকাটা। পৃথিবীর তাবৎ সুস্বাদু পাখি আর পশুর মাংস ছাড়া তার খাওয়া অসম্পূর্ণ। শুধু কি পশু আর পাখিই, জলচর জীবেদের দেহও তার খাবার টেবলে পাওয়া চাই। মোট কথা, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যত ভোজ্য আছে তার বেশ ক'টা না হলে বিজলীর চলে না। শুধু কি তা-ই, সেই সঙ্গে চাই পুডিং-পোলাও-স্যালাড। আর চাই বীয়ার।

পৃথিবীর স্বাদুতম খাদ্যে আর পানীয়ে যে মেয়ে অভ্যস্ত, আমার ঘরে উপযাচক হয়ে সে এসেছে। আমার বলার অপেক্ষা রাখেনি। সে নিজেই নিজেকে নিমন্ত্রণ করে বসেছে। কিন্তু কী খেতে দেব তাকে? আজ তো খাবার বলতে এক ডেকচি স্বাদগন্ধহীন খিচুড়ি আর কিছু আলু পেঁয়াজ ভাজা।

নিজেদের রান্নার মহিমা তো জানি। একেক সময় সে-সব মুখে দিয়ে নিজেরাই মোহিত হয়ে যাই। খিচুড়ি আর আলুভাজা কেমন করে বিজলীর সামনে ধরে দেব!

বিজলী আবার বলে উঠল, 'কি গো ললিতদা, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে। অত কী ভাবছ?'

আমি তার কথা যেন শুনতে পাইনি। ঘোরের মধ্যে থেকে বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলাম, 'তুমি আমাদের এখানে খাবে!'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে থাকার পর হেসে ফেলল বিজলী, 'খাব বৈকি। নিজেকে যে নিজে নেমন্তন্ন করলাম, সে কি শুধু শুধু? খাব, একশ' বার খাব। কিন্তু ললিতদা—'

'কী?'

'আমি খাব বলে তুমি যেন বড্ড ভয় পেয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে। ভয় নেই গো, আমার পেটের ভেতর জালা-টালা কিছু পুরে আনিনি। কতটুকু খাই, তুমি তো জানো।'

আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কুণ্ঠিত সুরে বললাম, 'ছি ছি, সে কী। তুমি খাবে, সে তো আমার সৌভাগ্য। তোমার কাছে যেদিনই যাই গলা পর্যন্ত ভরিয়ে আসি। অথচ—যাক সে কথা। কিন্তু বিজলী—'

'কী?'

'আমার যে লজ্জার শেষ নেই ভাই। খিচুড়ি আর আলু পেঁয়াজ ভাজা, মাত্র এ-ই রয়েছে ঘরে। সেগুলোর যা রং, যা স্বাদ—কিছুতেই আমি তোমাকে সে-সব দিতে পারব না।'

'খিচুড়ি—এই বর্ষায়! চমৎকার!' বিজলী প্রায় লাফিয়ে উঠল। উল্লাসের সুরে বলল, 'দেশও ছেড়েছি, ও বস্তুটির স্বাদও ভুলে গেছি। আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম! দিনটা সত্যি সত্যি সুদিনই মনে হচ্ছে।'

কী বলব, ভেবে পেলাম না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রইলাম শুধু।

বিজলী এবার করল কি, আদুরে মেয়ের মতো গলা ফুলিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলতে লাগল, 'আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়ে গেছে ললিতাদা। তোমার নন্দী ভৃঙ্গীদের ডাক।'

নন্দীভৃঙ্গী, অর্থাৎ আমার ঘরের অন্য তিন বাসিন্দা। বললাম, 'ওদের দিয়ে কী হবে?'

'বা রে, মেয়েমানুষ হয়ে আগে ভাগে খেয়ে নেব নাকি?'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বলে কি বিজলী! যে-মেয়ে সমাজ সংসারের পরোয়া করে না, পৃথিবীর সমস্ত সুস্থতা থেকে বিচ্ছিন্ন, যে-মেয়ে নেশাসক্ত, স্বৈরিণী, কতকগুলো কদর্য অভ্যাসের যে ক্রীতদাসী মাত্র—তার গলায় এ কোন বিচিত্র উচ্চারণ? এতদিন তাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছিলাম তার মধ্যে বড় রকমের কোনো ফাঁক কি থেকে গেছে? বিজলী-চরিত কি আবার নতুন করে ভাবতে হবে? সাংসারিক এবং পারিবারিক কোনো শৃঙ্খলা এবং নীতিই যে মানে না, সে এ-সব কী বলছে? জ্বরের ঘোরে প্রলাপের মতোই মনে হচ্ছে। তবে কি, তবে কি, নেশা জুয়া আর হাজার উত্তেজনা দিয়ে ঘেরা তার আজকের জীবন পানের তবকের মতো? লহমায় সেটা উঠে গিয়ে বাংলাদেশের চিরকালের মেয়েটি বেরিয়ে এসেছে?

বিজলী তাড়া দিয়ে উঠল, 'কি, চুপ করে বসে রইলে যে? তোমার দলবলকে ডাকো। আমি কিন্তু আর পারছি না। এত খিদে পেয়েছে যে মাথা ঘুরছে।'

অগত্যা উঠতেই হল। দরজা খুলে নিজের কণ্ঠস্বর বাইরের অশ্রান্ত বর্ষণের আওয়াজের ওপর তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম, 'সুধাংশু—গণেশ—রজত, তোরা সব আয়।'

কিছুক্ষণের মধ্যে 'চাওল'-এর নানা প্রান্ত থেকে রজতরা ফিরে এল। আর ঘরে পা দিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিমূঢ়ের মতো বিজলীর দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল। তারপর তিনজনে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে প্রায় ডেলা পাকানোর মতো করে একধারে গিয়ে বসল। সুধাংশু, রজত বা গণেশ—চিরদিনই এরা প্রগলভ, চঞ্চল, ছটফটে। একটা মুহূর্ত মুখ বুজে বসে থাকতে পারে না। আশ্চর্য! কে এক জাদুকর মন্ত্র পড়ে তাদের একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছে যেন। অবশ্য মাঝে মাঝে বিজলীর দিকে চোরা দৃষ্টি হানছে। পশ্চিম বোম্বাই-এর এই 'চাওল'-এ এমন একটা অভাবিত বিস্ময় ঘরের ভেতর পুরে রেখে যে আমি তাদের ডাক দিয়েছিলাম, এ ছিল ওদের সুদূর কল্পনারও বাইরে।

রজতদের সমস্ত সঙ্কোচ আর আড়ষ্টতা স্বভাব-উচ্ছল কোনো পাহাড়ী ঢলের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিজলী। রজত, সুধাংশু আর গণেশ—তিনজনের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে ফেলে অবশেষে আমার দিকে তাকাল সে। ঠোঁটের প্রান্তদু'টো ঈষৎ টিপে, নিঃশব্দে একটু হেসে বলল, 'এ কোথায় এসে পড়লাম গো ললিতদা? বোবাদের রাজ্য নাকি? কথা-টথা বলতে পারে তো এরা? নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু দেখতেই জানে?'

মনে মনে খুশিই হলাম। বিজলী এবং আমার মধ্যেকার একটা কল্পিত সম্পর্ক নিয়ে সুধাংশুরা প্রায় সর্বক্ষণই আমাকে কোণঠাসা করে রাখে। আমি যত অসহায়ের মতো না-না করি, ওরা ততই প্রমত্ত হয়ে ওঠে, আর একসঙ্গে কোমর বেঁধে আমাকে নাজেহাল করে ফেলে। এই মুহূর্তে তাদের অপ্রস্তুত, বিব্রত, নত মুখগুলি দেখে করুণাই হল। হেসে ফেললাম। আড়চোখে রজতদের দেখতে দেখতে বললাম, 'বোবার রাজ্য হবে কেন? বাজিয়ে দেখ না, ঠন্ ঠন্ করে পাখোয়াজের মতো বেজে উঠবে।'

'তাই নাকি, তাই নাকি—' বিজলী উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'কিন্তু ললিতদা, দেখেশুনে তো মনে হয়, মুখে এখনও বোলই ফোটেনি।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'এস তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।'

পরিচয়-পর্বের পর বিজলী বলল, 'তোমাদের ঘরে বসে খাবার মতো আসন-টাসন আছে তো? না ও-সব বাহুল্য বলে বর্জন করেছ?'

'এই হট্টমন্দিরে ওগুলো বাহুল্যই। অতএব—'

'অতএব এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়।' বলেই গেয়েন্দা চোখে ঘরের চারদিক লক্ষ করতে লাগল বিজলী। হঠাৎ ডানধারের দেওয়ালের কাছে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। সেখানে একরাশ পুরনো খবরের কাগজ ডাঁই হয়ে আছে।

বিজলী করল কি, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। ঘরের কোণ থেকে খবরের কাগজ এনে আসনের মতো করে মেঝেয় পেতে ফেলল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের থালা-গেলাস কোথায়?'

বিব্রত মুখে বললাম, 'তুমি আবার কষ্ট করে এ-সব না-ই করলে। কখনও আসো না। একদিন যদিই বা এলে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই চোখ পাকিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে বিজলী বলে উঠল, 'চুপটি করে বসে থাক। মোটে সর্দারি করবে না। শুধু আমি যা বলি, লক্ষ্মী ছেলের মতো তা-ই করে যাও।'

মহারাষ্ট্রের বিরামহীন এই বর্ষণের মধ্যে আমাদের নিয়ে এ কোন খেলায় মেতেছে বিজলী! এই খেলা, এই কৌতুক, এই বাধাবন্ধহীন দুরন্ত উচ্ছলতা—এ তো তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। শুশুরিয়ার যে মঠগামিনী সন্ন্যাসিনী বিজলীকে আমি চিনতাম, তার পক্ষে এতখানি কৌতুকময়ী হয়ে ওঠা অসম্ভবই ছিল। আর বার শ' মাইল দূরে আরবসাগরের কূলের এই শহরে ক'মাস ধরে যে মেয়েটিকে আমি দেখছি তার পক্ষে পেগের পর পেগ হুইস্কি খেয়ে যাওয়া, দেহকে পণ্যের মতো অন্যের কাছে বিতরণ করা, এবং নানা উত্তেজনার আরকে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ডুবিয়ে রাখাই প্রতিদিনের অভ্যাস। এই অভ্যাসই তার আগেকার স্বভাব ভেঙেচুরে তাকে নতুন করে তৈরি করেছে। এই সব অভ্যাসের অতলে যে এ-রকম একটা উচ্ছ্বাসময়ী ঘরোয়া রূপ চাপা পড়ে ছিল, কোনোদিন তো আবিষ্কার করতে পারিনি। এই মুহূর্তে এতদিন বিজলী-চরিতের এই না-জানা চেহারাটা বিচিত্র বিস্ময়ের মতো হাজার রঙে আমার সমস্ত চেতনা রঙিন করে দিল।

বিজলীর সঙ্গে পেরে উঠব সাধ্য কি। তার ইচ্ছার কাছেই নিজেকে সঁপে দিতে হল। আমাদের থালা-গেলাস, হাঁড়ি-কুড়ি, সমস্ত সংসারখানাই রয়েছে আমার তক্তপোশের তলায়। সে-সব বিজলীকে দেখিয়ে দিলাম।

বিজলী হাঁড়ি-টাঁড়ি টেনে বার করল। কানাভাঙা এনামেলের থালায় থালায় খিচুড়ি নামে থকথকে হলুদবর্ণ তরল পদার্থ সাজিয়ে রজতদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হাতজোড় করে বলল, 'এবার দয়া করে আপনারা গা তুলুন। আয়োজন কিছুই করতে পারিনি। দেখতেই পাচ্ছেন, কেমন সাঙ্ঘাতিক বর্ষা! বাজারে বেরনো অসম্ভব ব্যাপার।

খিচুড়ি আর আলু পেঁয়াজ ভাজাই শুধু করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস আছে, নিজগুণে তৃপ্তি করে আপনারা তা খাবেন। আসুন—আসুন—'

হাসির একটা ঢল গণেশদের ভেতর এতক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে ছিল। প্রবল উচ্ছ্বাসে এবার সেটা ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতেই ওরা বলল, 'আপনি এত হাসাতেও পারেন!' বলতে বলতে তিনজনে খেতে বসল।

প্রথম থেকেই লঘু কৌতুকের একটা আবহাওয়া তৈরি করে রেখেছিল বিজলী। খেতে খেতে সেটা ক্রমাগত উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল।

আড়ষ্টতা আগেই কেটে গিয়েছিল। সহজ সুরে রজত বলল, 'জানেন, আপনার সম্বন্ধে আমাদের একটা অভিযোগ ছিল।'

চকিতে বিজলীর মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া খেলে গেল। পরক্ষণেই স্নিগ্ধ হেসে পরিহাস-তরল, চপল সুরে সে বলে উঠল, 'অভিযোগ!'

'হ্যাঁ, গুরুতর অভিযোগ।'

'কতখানি গুরুতর, যদি একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দ্যান—'

'দিচ্ছি।' রজত শুরু করল, 'ক' বছর ধরে আমরা চারজন এই ঘরখানায় আছি। শুধু আছি বললে ঠিক হয় না। আমরা অভিন্নহৃদয়। শুধু কাজকর্মের সময়টুকু বাদ দিলে চলা-ফেরা ওঠা-বসা, প্রায় সব কিছুই আমাদের একসঙ্গে। কিন্তু মাসকয়েক ধরে কী হয়েছে জানেন?'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে বিজলী তাকাল।

'আমাদের ফাঁকি দিয়ে ললিতদা আপনার কাছে যায়। আজকাল তাকে আর আমাদের মধ্যে আগের মতো পাই না।'

'তাই নাকি গো?' আমার দিকে ফিরে বিজলী বলল, 'ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়—বলেই জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল।

বিব্রত মুখে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলাম। গলায় স্বর ফুটল না।

বিজলীর উদ্দেশে রজত আবার বলে উঠল, 'আজ থেকে কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আমাদের আর কোনো অভিযোগ নেই।'

'হঠাৎ সেটা উবে গেল কী করে?' বিজলী প্রশ্ন করল।

'আপনাকে দেখে। এমন চমৎকার মানুষ আপনি!' মুগ্ধ রজত বলতে লাগল, 'আপনার কাছে না গিয়ে পারা যায়? ঠিকই করে ললিতদা।'

বিজলী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আচমকা সুধাংশু বলে উঠল, 'আপনার সম্বন্ধে আমাদের আর অভিযোগ নেই। কিন্তু ললিতদার সম্বন্ধে আছে।'

'কী অভিযোগ?' বিজলী সুধাংশুর দিকে ফিরল।

'আপনার কাছেই যে যায়, সে কথাটা ললিতদা অনেকদিন চেপে রেখেছিল। আমরা জিজ্ঞেস করলে শুধু বলত, দেশের একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। তারপর একদিন জোর করে ধরতে আপনার কথা বললে।'

'আমার কথা লুকিয়ে রাখত কেন?' বিজলী বলল, 'আমি গুপ্তধন নাকি, যে জানতে পারলে সবাই লুটপাট করে নিয়ে যাবে?'

'আপনিই সেটা বিবেচনা করে দেখুন। আপনার হাতেই বিচারের ভারটা ছেড়ে দিলাম।' সুধাংশু বলল।

বিজলী উত্তর দিল না। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

এবার গণেশের পালা। নিঃশব্দে এতক্ষণ খেয়ে যাচ্ছিল সে, আর মাঝে মাঝে বিজলীদের কথায় হাসছিল। হঠাৎ মুখ তুলে সে বলল, 'সে যা-ই হোক, কপালটা কিন্তু ললিতদার খুব ভাল। ললিতদার কপালগুণে আমাদের ভাগ্যও অবশ্য খারাপ নয়।'

'কিরকম, কিরকম?' বিপুল উৎসাহ নিয়ে গণেশের দিকে তাকাল বিজলী।

'কিরকম আবার। দু'মাস পর হোক ছ'মাস পর হোক, আপনি আমাদের বৌদি হয়ে তো আসছেন। স্ত্রী হিসেবে যে আপনাকে পাবে তার কপাল তো ভালই। বৌদি হিসেবে যারা আপনাকে পাবে তাদের সৌভাগ্যও কি কম?' অত্যন্ত সহজ সুরে বলে গেল গণেশ। তার স্বরে কোনোরকম উত্থানপতন, চড়াই উতরাই নেই। তার ধারণা, প্রায় নিশ্চিত একটা ঘটনাকে ততোধিক নিশ্চিত আর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে গেছে সে।

মুহূর্তে পরিহাসময় স্নিগ্ধ আবহাওয়া বদলে গেল। আমার মাথার ভেতর আগুনের একখানা চাকা দুরন্ত গতিতে ঘুরতে লাগল। চারপাশ দুলতে শুরু করেছে। অনুভব করলাম, বুকের ভেতর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে আর ঘাড়টা ক্রমাগত শরীর থেকে শিথিল হয়ে পাতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এমন একটা কুৎসিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত যদি আমার চেতনা বা অবচেতনার কোথাও টের পেতাম তবে কি বিজলীর কথায় গণেশদের এ-ঘরে ডেকে আনি? বিজলী হাজার জোরজার করলেও আমি ওদের ডাকতাম না। কৌশলে এড়িয়ে যেতাম।

কী ভাবল বিজলী? আমাকে এবং তাকে ঘিরে এ-সবই যে গণেশদের রঙিন কল্পনা এবং এতে যে আমার কোনো ভূমিকাই নেই, এ কথা কি সে বিশ্বাস করবে? এই হঠকারিতার ক্ষতিপূরণ কিসে? বিজলী হয়তো ভাববে, আমিই ওদের কল্পনাকে উসকে দিয়ে এমন একটা ধারণা ওদের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিয়েছি। এ কথা যে আমার নয়—কোন অজুহাতে কোন জবাবদিহিতে তা বিজলীকে বিশ্বাস করাব? হে ঈশ্বর, এখন আমি কী করব? কী করব?

ওদিকে বিজলীর টেপা ঠোঁটের হাসিও থমকে গেছে। দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে আমার দিকে আটকানো। নিশ্বাস সহজ, স্বাভাবিক ছন্দে বইছে না। অনেকক্ষণ নিঃসব্দে বসে রইল সে। একসময় তার স্খলিত স্বরের ভেতর থেকে একটিমাত্র শব্দই বেরিয়ে এল, 'বৌদি!'

এবার আর গণেশই শুধু নয়, সুধাংশু আর রজতও সমস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বৌদি বৈকি, নিশ্চয়ই বৌদি। একশ'বার বৌদি, হাজার বার বৌদি। দাদার বৌ বৌদি ছাড়া আর কী?'

চিৎকারটা থামলে গণেশ বলল, 'আপনি এলে 'চাওল'-এ আরেক খানা ঘর আমরা

ভাড়া করব। ললিতদা আর আপনি সেখানে থাকবেন। সুধাংশু, রজত আর আমি থাকব এ-ঘরে। আপনি এলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকবে না। হোটেলে খেয়ে খেয়ে একদম মরতে বসেছি। আমাদের পাকস্থলীগুলোর দায়িত্ব কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে বৌদি।' একটু থামল সে। খানিক পর কী যেন ভেবে নতুন উদ্যমে শুরু করল, 'বৌদি বললাম বলে আবার রাগ করবেন না যেন। দু'দিন পরে তো বলতেই হবে। আগেই মহড়া দিয়ে নিচ্ছি।'

বিজলী এবারও নিরুত্তর। তবে কিছুক্ষণ আগের স্তব্ধ কাঠিন্য আর নেই। যে চোখ দু'টি স্থির হয়ে আমার ওপর আটকে ছিল সে দু'টো এখন অন্য দিকে ফেরানো। হঠাৎ করল কি বিজলী, বিচিত্র হেসে সুধাংশু, রজত আর গণেশের পাতে হাতা হাতা খিচুড়ি ঢালতে লাগল।

ওরা প্রায় আঁতকে উঠল, 'আরে আরে, করছেন কী! গলা পর্যন্ত বোঝাই হয়ে গেছে। আর খেতে পারব না।'

'খেতেই হবে। দু'দিন পর আপনাদের পাকস্থলীগুলোর দায়িত্ব নিতে হবে তো। আগে থেকেই তার মহড়া দিয়ে রাখা ভাল।'

উত্তর বোম্বাইয়ের এই 'চাওলে'-এ বিস্ফোরণের মতো হাসি ফেটে পড়ল। রজতরা বলতে লাগল, 'মাইরি বৌদি, আপনার সঙ্গে পারার উপায় নেই। খুব দিলেন যা হোক।'

ওরা তুমুল হইচই করছে। আর আমার মাথাটা পাতের ওপর আরো ঝুঁকে পড়ছে। গণেশরা 'বৌদি' বলাতে প্রতিবাদ করেনি বিজলী। কিছুক্ষণ পলকহীন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল শুধু। এ ছাড়া তার মুখের একটি রেখাও স্থানচ্যুত হয়ে বিরক্তি, রাগ বা উত্তেজনা—কোনো কিছুই ফুটিয়ে তোলেনি। তার চোখে যা কিছু ছিল, তা হল বিস্ময়।

বিস্ময়ই শুধু। তা-ও ক্ষণকালের। তারপরেই রজতদের হাসি-পরিহাসে সে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। হাসি-গল্প-মজায় এমনভাবে মেতে উঠেছে বিজলী, যেন রজতদের সঙ্গে তার কতকালের পরিচয়। পরিহাস সে আগেও করছিল। গণেশরা 'বৌদি' বলার পর সেটা যেন আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

সবাই হাসছে, হল্লা করছে। শুধু আমি ছাড়া। ওদের অবাধ মুক্ত স্রোতে যে ভেসে যাব, কিছুতেই তা পেরে উঠছি না। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি বিজলীর এই উদ্দামতা, এই কৌতুক, সব কিছুর লক্ষ্যই আমি। আমার দিকে চোখ রেখেই একের পর এক তীর ছুঁড়ে যাচ্ছে সে। আর শরবিদ্ধ রক্তাক্ত একটা পশুর মতো আমি ছটফট করছি, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছি। বৌদি—বৌদি—বৌদি! দু'অক্ষরের এই শব্দটা প্রচণ্ড এক ঘূর্ণির মতো সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে অবিরাম পাক খেয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাব। কপালের দু'পাশের শিরাগুলো যেভাবে দপদপ করছে তাতে মনে হয়, যে-কোনো মুহূর্তে সেগুলো ছিঁড়ে যাবে।

একসময় আমাদের খাওয়া শেষ হল। বিজলীও খেয়ে নিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার আমি যাব।'

বিজলীর কাছে সহজ হতে পারছি না। তার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। আড়ষ্টের মতো কোনো রকমে বললাম, 'কিন্তু বাইরে যে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে।'

রজতরাও আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'এই বৃষ্টির ভেতর বেরুনো যায় নাকি?'

বিজলী আশ্চর্য সঙ্কোচহীন। আমার দিক থেকে চোখ সরায় নি। আমাকে লক্ষ করেই সে বলল, 'যখন এসেছিলাম তখনও তো বৃষ্টি হচ্ছিল। সে যাই হোক, তোমার যে ধুতিটা পরেছি ওটা পরেই আমি যাব। তুমি যেদিন আমার ওখানে যাবে সেদিন নিয়ে এস। কি, অসুবিধে হবে?'

'না, অসুবিধের কী।' নতমুখে উত্তর দিলাম।

'আরেকটা কথা--'

'বল।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না বিজলী। মনে আছে, ঘরে ঢুকেই ভেজা কাপড় বদলে ফেলেছিল সে। তারপর সেটা আর বর্ষাতিখানা একপাশে স্তূপাকার করে রেখেছিল। এখন সোজা সেগুলোর কাছে চলে গেল। স্তূপের ভেতর থেকে হাতড়ে একটা অ্যাটাচি কেস বার করে আনল।

যখন সে আসে, অ্যাটাচি কেসটা দেখেছিলাম কিনা মনে করতে পারলাম না। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই বৃষ্টির ভেতর অ্যাটাচিটা নিয়ে আর যাব না। কিছু দরকারি কগাজপত্তর আছে। ভিজে গেলে মুশকিল হবে। এটা তোমার কাছে রাখ। বৃষ্টি যেদিন থামবে সেদিনই ওটা আমার কাছে পৌঁছে দেবে। আর—'

'কী?'

আদুরে গলায় বিজলী বলল, 'ভেজা শাড়িটা কিন্তু আমি এখন বয়ে নিয়ে যেতে পারব না।'

আমার যে দিকটায় হাজার কুণ্ঠা আর সঙ্কোচ সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না বিজলী। কাজেই আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে গেল। মুখ তুলে প্রায় স্বাভাবিক সুরে বললাম, 'বেশ তো, ওটা থাক না। যেদিন যাব, ওটাও নিয়ে যাব।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল বিজলীর। ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'ওই দেখ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।'

'কী?'

'গণেশবাবুদের নিয়ে একদিন আমার ওখানে যেও।' আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে গণেশদের দিকে তাকাল বিজলী। তাদের বলল, 'আপনাদের নেমন্তন্ন রইল। যাবেন কিন্তু। নিশ্চয়ই যাওয়া চাই। 'না' বললে কিছুতেই শুনব না।'

'যাব বইকি। নিশ্চয়ই যাব। কবে যাব, বলুন?' রজতরা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

একটু ভেবে বিজলী বলল, 'বর্ষাটা একটু ধরুক। কবে যাবেন, আপনাদের ললিতদাকে জানিয়ে দেব।'

লক্ষ করলাম, বিজলী নিজে 'ললিতদা' বলল না। তাকে এবং আমাকে ঘিরে রজতদের যে কল্পনা, সেটা আরেকটু খুঁচিয়ে দিয়ে গেল মাত্র। এবং এটা যে ইচ্ছাকৃত, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। বুঝলাম, এখন থেকে রজতদের 'বৌদি' ডাকের প্রত্যুত্তর মারণ-বাণের মতো বার বার আমার দিকে ফিরে আসবে।

আর কোনো কথা হল না। দ্রুত বর্ষাতিখানা দিয়ে শরীর মুড়ে নিল বিজলী। তারপর বিদায় নিয়ে অশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে যেভাবে সে এসেছিল সেভাবেই আবার বেরিয়ে গেল

বিজলী চলে যাবার পর সুধাংশুরা আমার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। রজত বলল 'অ্যাদ্দিনে বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। ভেবেছিলে আমাদের কাছ থেকে বৌদিকে লুকিয়ে রাখবে, কিন্তু পারলে না। বৌদি নিজেই এসে দেখা দিলে। সে যাক তুমি কিন্তু দাদা সত্যিকারের হিরো। একেবারে কামাল করে দিয়েছ।'

সুধাংশু বলল, 'আচ্ছা ললিতদা—'

সুধাংশুর কী বক্তব্য, কে জানে। ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকালাম, 'কী বলছিস?'

'তোমার এখন কত বয়েস?'

'উনচল্লিশের মতো।'

'উনচল্লিশটা বছর কৌমার্য অটুট রেখে কাত হয়ে গেলে! অবশ্য—'

পাশ থেকে সুধাংশু চিপটেন কাটল, 'কী রে, কী?'

রজত বলল, 'বৌদির যা রূপ আর যা গুণ তাতে শ্রীমান ললিত চন্দর চৌধুরি তো নস্যি, কত শুকদেব পায়ে দাসখত লিখে দিত।'

'যা বলেছিস, যা বলেছিস—' হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল সুধাংশু।

গণেশ শুধু বলল, 'তুমি সুখী হবে দাদা। সত্যি বলছি, দেখে নিও।'

আমি শুধু ভাবছি, তিনটি ছেলের প্রাণে চতুর অভিনেত্রীর মতো কী আশ্চর্য খেলাই না খেলে গেছে বিজলী! সেই খেলাটার কতখানি সত্যি আর কতখানি ছলনা, তা শুধু আমিই অনুভব করতে পারছি। আর পারছি বলেই মনে মনে লজ্জায়, ধিক্কারে আর সঙ্কোচে একেবারে মরে যাচ্ছি।

বিজলীর ব্যাপারে অনেকক্ষণ আমাকে নাস্তানাবুদ করে রাখল রজতরা। তারপর বৃষ্টির মধ্যে যথারীতি 'চাওল'-এর অন্য সব প্রান্তে আড্ডা দেবার জন্য বেরিয়ে গেল। আর নিজের বিছানাটার ওপর বসে বাইরের অশ্রান্ত বর্ষণের শব্দ শুনতে শুনতে সেই নিপুণ ছলনাময়ীর কথাই শুধু ভাবতে লাগলাম। একটু আগে এই ঘরে কি বিচিত্র অভিনয়ই না সে করে গেছে!

কতক্ষণ নিজের মধ্যে মগ্ন ছিলাম, কে বলবে। একসময় দরজার বাইরের কড়া নড়ে উঠল। সেই সঙ্গে সুরহীন, ভারী পুরুষ-গলার নির্দেশ পাওয়া গেল, 'দরোয়াজা খুল দিজিয়ে।'

আমার চমকিত সত্তার অতল থেকে শব্দটা ছিটকে বেরিয়ে এল যেন, 'কে?'

'পুলিশ।'

লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম। সত্যিই পুলিশ। পুরু বর্ষাতিতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা একজন ইন্সপেক্টর আর জনচারেক কনস্টবল একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমি জানতাম রক্তের দাগ শুঁকে শুঁকে যেমন করে শ্বাপদ আসে তেমন করেই একদিন ওয়াগন-ব্রেকার আর মদ চোলাইকারী গণেশের খোঁজে পুলিশ আসবে। যে অন্ধকার পথে গণেশ চলেছে সেখান থেকে বহুবার তাকে ফেরাতে চেয়েছিলাম। সে ফেরেনি। অনেক খুঁজে এতদিনে পুলিশ কি তার সন্ধান পেয়েছে? ভীত, শঙ্কিত, বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলাম। আমার শ্বাস আটকে আসতে লাগল।

ইন্সপেক্টরটি বলে উঠল, 'আচ্ছা, এখানে একটি মেয়েকে দেখেছেন? বয়েস, ধরুন তিরিশ বত্রিশের মতো। খুব হ্যান্ডসাম দেখতে। গায়ের রং ভেরি ব্রাইট, চুল কোঁকড়া, চোখের তাবা নীল। সবুজ রঙের একটা ওয়াটার প্রুফ ছিল গায়ে—'

আমি হতচকিত। ইন্সপেক্টর যা বলল, সেটা অবিকল বিজলীরই চেহারার বর্ণনা। তা ছাড়া যে বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে সে এখানে এসেছিল, মনে পড়ছে সেটার রং সবুজই। তবে কি এরা গণেশের খোঁজে আসেনি? যে নিশ্বাস বুকের ভেতর আটকে গিয়েছিল, সেটা মুক্তি দিতে গিয়েও পারলাম না। গণেশের খোঁজে পুলিশ আসেনি বটে, এসেছে বিজলীর খোঁজে।

বিজলীর পেছনে পুলিশ! কিন্তু কেন? প্রাণপণে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে রুদ্ধ গলায় মিথ্যেটাই বললাম, 'কই না, তেমন কাউকে তো দেখিনি।'

স্থির দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'দেখেননি?'

এই মুহূর্তে পুলিশ যদি ঘরে উঠে আসে আর সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়, তা হলে অনায়াসেই একখানা ভেজা শাড়ি আর অ্যাটাচি কেসটা আবিষ্কার করতে পারে। যারা বিজলীর বর্ষাতির রং বলে দিয়েছে, শাড়ির রংটা কি আর তাদের অজানা? বিজলীর উপস্থিতির সেই চিহ্ন'টো পুলিশ যদি পেয়ে যায়, আমার অবস্থা কী দাঁড়াবে? যেমন করে মানুষ অতলে ঝাঁপ দেয়, অবিকল সেভাবেই মরিয়ার মতো বলে ফেললাম, 'না।'

'আচ্ছা, আপনি দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন।' আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের অনুচরদের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর, 'চল, উত্তর দিকটা একবার দেখা যাক।'

পুলিশ চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেলাম। ঝড়ো বাতাসের ঘাড়ে চেপে তীব্র, বাঁকা রেখায় বৃষ্টির ছাট ঘরের ভেতর চলে আসছে। হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে। আমার হুঁশই নেই। চেতনা আর অবচেতনায় যত অদৃশ্য দেওয়াল আছে তার সবগুলিতে সেই কথাটাই বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, পুলিশ বিজলীর পেছনে লেগেছে কেন? কেন? কেন?

তের

অন্য বছরের তুলনায় এবারের বর্ষার মাতামাতি কিছু বেশি। বছর তিনেকের মতো আমি বোম্বাইতে আছি। এই নিয়ে তিনটে বর্ষা দেখলাম। আগের দু'বার দিন দশেকের মতো ঘরে আটকে থাকতে হয়েছে। এ-বছর সে জায়গায় চোদ্দ দিন আমি বন্দি। অর্থাৎ প্রায় একটা মাসের প্রায় আধাআধি।

দু' সপ্তাহ পর আজ আমাদের বন্দিত্ব ঘুচল। এতকাল পৃথিবীর বেগবর্ণময় মুখর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদূরের একটা দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে ছিলাম যেন। আজ সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে আগের দ্রুত গতির জীবনে ফিরে এসেছি।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা যত্রতত্র। অতএব স্নান সেরেই বেরিয়ে পড়ব, ঠিক করলাম। প্রথমে যাব অফিসে। ছুটির পর পার্শি কলোনিতে একবার হানা দিতে হবে। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে নেমে যাবে। সন্ধের সময় পার্শি কলোনিতে হাজিরা দিলে বিজলী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার কিঞ্চিৎ নমুনা আমি একদিন পেয়ে এসেছি। তবু আমাকে যেতে হবে। কেন না, প্রবল দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেদিন আমাদের 'চাওল'-এ এসেছিল সে। যাবার সময় একটা অ্যাটাচি কেস আমার হাতে দিয়ে অনুরোধ করেছিল, বর্ষা থামলে যেদিন আমি প্রথম বেরুবো সেদিনই যেন সেটা পৌঁছে দিয়ে আসি। তা ছাড়া, একখানা ভেজা শাড়িও ফেলে গেছে।

অ্যাটাচিটার ভেতর কী আছে, জানি না। বিজলী অবশ্য বলে গিয়েছিল, দরকারি কাগজপত্র আছে। আমি সে সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় নই। কারণ অ্যাটাচিটার ওজন সের চারেকের মতো। কাগজের ওজন অত হয় না। আমার কৌতূহল হয়েছিল, একবার খুলে দেখি। খুলতে গিয়ে হতাশ হতে হয়েছে। অ্যাটাচিটার মুখ চাবি দিয়ে আটাকানো।

বিজলীর কথায় রাজি হয়েছিলাম। আজই অ্যাটাচি কেসটা দিয়ে আসার কথা। কিন্তু রাতের কথা ভাবতে গিয়ে সমস্ত উৎসাহ শিথিল হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, অদৃশ্য বেড়ি কঠিন নিষেধে আমার পা দু'টিকে আটকে ধরছে।

পরক্ষণেই অন্য একটা কথা মনে পড়ল। আজ সোমবার। একটানা অফিসে হাজিরা দিয়ে যেতে হবে। এর ভেতর একটা দিনও ফাঁকি দেবার উপায় নেই। অতএব পার্শি কলোনিতে যেতে হলে অফিসের ছুটির পর রাতের দিকেই যেতে হবে। আর দিনের বেলা যেতে হলে রবিবারের আশায় বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা বোধহয় সঙ্গত হবে না। আমি ঠিক করে ফেললাম, বিজলী যদি অসন্তুষ্ট হয়, হবে। আজই ছুটির পর তার ফ্ল্যাটে যাব।

এতদিন 'চাওল'-এর ছোট্ট খুপরিতে দমবন্ধ হয়ে আসছিল। স্নান সেরে বিজলীর শাড়ি আর অ্যাটাচি কেসটা খবরের কাগজে মুড়ে নিলাম। তারপর বাইরে এসে প্রথমেই আরব সাগরের বাতাস বুক ভরে টানলাম। চারদিকে তাকিয়ে সব কিছু আশ্চর্য নতুন মনে হল।

দিন চোদ্দ আগে বিলম্বিত লয়ের যে ধ্রুপদ গানখানা শুরু হয়েছিল তা অবশ্য কালই থেমে গেছে। তবু তার রেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। পাথরের কালো কালো চাঙড়ার মতো মন্থরগামী সেই মেঘগুলি যদিও গলে গিয়ে প্রায় ঝরে গেছে তবু আকাশের এ-কোণে সে-কোণে তাদের ছোটখাট কিছু টুকরো ছড়িয়ে আছে। রাস্তাগুলো এখনও ভেজা, কোথাও কোথাও জল জমে আছে। যে-সড়কটা সোজা স্টেশনের দিকে গেছে তার দু' পাশের গাছগুলো বৃষ্টির জলে এক মাস ধরে চান করেছে। এখন তাদের পাতাগুলো তীব্র সবুজ।

দু' সপ্তাহ পরে মহারাষ্ট্রের আকাশে রোদ উঠেছে। বর্ষার পর মেঘভাঙা সেই রোদ এত তীক্ষ্ণ, এত প্রখর যে সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। অনভ্যস্ত চোখে ধারাল ফলার মতো বিঁধে যায়।

মাত্র চোদ্দটা দিন। তবু মনে হল, কয়েক যুগ। নাকি একটা আলোকবর্ষই পার হয়ে গেছে। অভিভূতের মতো মেঘমুক্ত নীলাকাশ দেখলাম, গাছের পাতায় উজ্জ্বল শ্যামলতা দেখলাম, আর দেখলাম আকাশের ঝাঁঝরি দিয়ে চুঁইয়ে আসা গলানো সোনার মতো টলটলে রোদ। চিরকালের চেনা সেই গাছপালা, সেই রোদ, সেই আকাশ—তবু সব কিছু কেমন অচেনা মনে হল। মনে হল, পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে সে-সব এই প্রথম দেখছি। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

কিন্তু কতক্ষণ আর। এই নীরস, হৃদয়বর্জিত শহরে প্রকৃতিকে নিয়ে মগ্ন থাকার অবকাশ কোথায়? জীবনধারণ নামে নিষ্ঠুর ব্যাধটা পেছন থেকে ক্রমাগত ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে আমাকে স্টেশনের দিকে নিয়ে চলল। সেখান থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনের ঠাসাঠাসি ভিড়ে নিজেকে গুঁজে দিয়ে অফিসে চলে এলাম।

একটা গ্রহ দু'সপ্তাহের মতো তার ছক-কাটা জীবনযাত্রার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আবার সে তার নিজের কক্ষপথে ফিরে এসেছে।

অফিস ছুটির পর পার্শি কলোনিতে ছুটলাম। দাদার স্টেশনে নেমে বিজলীর ফ্ল্যাট পর্যন্ত আর পৌঁছতে হল না। রতীশ হালদার থাবা গেড়ে বসে ছিল। আমাকে দেখামাত্র ছোঁ মেরে তার ডেরার দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

অস্বস্তি হচ্ছিল। বললাম, 'আমার একটু তাড়া আছে। বিজলীর সঙ্গে দেখা করেই ফিরতে হবে।'

রতীশ কোনো ওজর শুনল না, 'আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি? বিজলীদেবীই শুধু আপন! আমি কেউ না?'

'না, সে কথা নয়।' আমি কিছুটা অপ্রস্তুত। 'বিজলীর সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে বলেই দেখা করতে এসেছি। পরে একদিন এসে আপনার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করে যাব।'

'তা হবে না দাদা। কদ্দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা। এতদূরে এসেছেন, আমার আস্তানায় একবার যেতেই হবে।' হাত ধরে একরকম টানতে টানতে আমাকে তার ঘরে নিয়ে ঢোকাল রতীশ।

বললাম, 'আমার কিন্তু ভয়ানক অসুবিধে হবে রতীশবাবু।'

আমার ইচ্ছা ছিল, অ্যাটাচি কেসটা বিজলীর হাতে দিয়ে একটা মুহূর্তেও আর অপেক্ষা করব না। দু'সপ্তাহ্‌ পর আজ অফিসে সাংঘাতিক পরিশ্রম হয়েছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙেচুরে আসছে। পার্শি কলোনি থেকে ফিরে সরাসরি বিছানায় নিজেকে সঁপে দেব। কিন্তু তার আর উপায় নেই।

রতীশ বলল, 'ছোট ভাইয়ের জন্যে যদি একটু অসুবিধে হয় তো হোক না।'

এরপর আর কী বলার থাকতে পারে? রতীশের ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিলাম।

রতীশ আমাকে তার ঘরের একমেব চেয়ারখানায় বসিয়ে বিছানায় গিয়ে মুখোমুখি বসল। তারপর বলল, 'এবার বর্ষাটা খুব ভুগিয়েছে, তাই না দাদা?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

'বম্বে এরিয়াতে কয়েক বছর আছি, কিন্তু এমন বর্ষা আর কখনও দেখিনি। আপনি যেন ক'বছর আছেন দাদা?'

'প্রায় বছর তিনেক।'

'এরকম বর্ষার কথা আর মনে পড়ে?'

'না।'

'লোকাল পিপলদেরও জিজ্ঞেস করে দেখেছি, কুড়ি বাইশ বছরের ভেতর এত বৃষ্টি নাকি তারাও দেখেনি। উঃ, হরিবল। আমি তো দাদা, ঘরে আটকে থেকে থেকে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।'

এ-সব আলোচনা আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। তবু কথার পিঠে কথা যোগানোই রীতি এবং সাধারণ ভদ্রতাও। অতএব বললাম, 'হ্যাঁ। আমারও সেই অবস্থা। কোথাও এক পা বেরুবার উপায় নেই। দিনরাত ঘরের মধ্যে আটকে থাকা। কীভাবে যে বর্ষাটা কেটেছে, আমিই শুধু জানি।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না রতীশ। জানালার বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন দূরমনস্ক হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পর মুখ ফিরিয়ে বলল, 'যাই বলুন দাদা, আমরা চাইতে আপনি কিন্তু ভাল ছিলেন।'

'ভাল ছিলাম!' আমার গলায় বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল, 'তার মানে!'

'মানেটা নিজেই চিন্তা করে দেখুন না।' বিচিত্র, রহস্যময় হেসে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল রতীশ।

অন্ধের মতো আকাশ-পাতাল অনেক হাতড়ালাম। কিন্তু না, কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না। বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না, না?' মুখের হাসিটিকে আরো একটু ছড়িয়ে দিল রতীশ, 'বেশ, আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বলেও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে।

'ঠিক আছে, বলুন।' আমি তাড়া দিলাম।

গলাটা অতল খাদে ঢুকিয়ে রতীশ বলল, 'বর্ষার মাঝামাঝি পর্যন্ত অবশ্য আপনার একঘেয়ে কেটেছে। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটেছে—'

'ঘটনা!'

'হ্যাঁ। বিস্ময়কর, চমকপ্রদ, ঘটনা।' নির্ভেজাল তৎসম শব্দ দিয়ে ব্যাপারটার ওজন বুঝিয়ে দিল রতীশ। একটু থেমে, কী ভেবে ফের বলল, 'সেই ঘটনাটার স্মৃতি মৌতাতের মতো বর্ষার বাকি দিন ক'টা আপনাকে বুঁদ করে রেখেছে। বৃষ্টির একঘেয়েমির কথা আর খেয়াল থাকেনি। তাই না দাদা?'

এত কথা বলার পরও আমি ধাঁধার মধ্যেই আছি। বললাম, 'কোন ঘটনার কথা বলছেন, আমি কিন্তু একেবারেই ধরতে পারছি না রতীশবাবু। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'বর্ষার ভেতর আমার ওখানে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই রতীশ বলে উঠল, 'ঘটেনি বলতে চান? আমি বলছি, ঘটেছে।'

'অত হেঁয়ালি না করে কী ঘটেছে, বলে ফেলুন না।' আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম।

'একদিন দুপুরবেলা ভিজতে ভিজতে বিজলীদেবী আপনার 'চাওল'-এ যান নি?'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। সেই সৃষ্টিছাড়া আদিম দুর্যোগের মধ্যে পৃথিবীর তাবত প্রাণী যখন যে-যার বিবরে আবদ্ধ, সেই সময় বিজলী গিয়েছিল আমার কাছে। কিন্তু রতীশ হালদার এ-খবর কোথায় পেল?

এতকাল রতীশকে যে-দিক থেকে দেখেছি, এবার তার উলটো প্রান্ত থেকে দেখতে হবে। তীক্ষ্ণ, বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। কিন্তু না, রতীশের দু'চোখে অপার সারল্য ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলাম না।

রতীশ ফের বলে উঠল, 'বিজলীদেবী বৃষ্টির ভেতর আপনার ওখানে গিয়েছিলেন। এটাকে আপনি ঘটনা বলে মানেন না? আমার মনে হয়, সারা জীবন ধরে উপভোগ করার মতো এ-একটা দুর্দান্ত ব্যাপার।'

অবরুদ্ধ, কাঁপা স্বরে গুঙিয়ে উঠলাম, 'বিজলী যে আমার ওখানে গিয়েছিল, আপনি জানলেন কেমন করে?'

'কীভাবে জেনেছি, সেটা কি খুব বড় কথা? জেনেছি যে, সেটাই আসল। আর সব তুচ্ছ।'

'না, বলুন কী করে জানলেন?'

'বলতেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপ করে থেকে রতীশ বলল, 'বেশ, তা হলে শুনুন। বিজলীদেবী আমার ধ্যান-জ্ঞান। দিনরাত ওঁর নাম জপ করে কাটিয়ে দিই। উনি কোথায় যান, না-যান, এই ঘরে সেই সব টের পাই।'

বুঝলাম, রতীশ হালদার না-ছোড় আশিক। ঝড়-বৃষ্টি-প্রলয়-জলোচ্ছ্বাস, যে কোনো

প্রাকৃতিক বিপর্যই ঘটুক না, ছায়ার মতো নিঃশব্দে বিজলীর পিছু পিছু সে ঘুরছেই। অথচ মুখোমুখি গিয়ে যে দাঁড়াবে, সে সাহসটুকু নেই। এভাবে চললে ক্লান্ত পদাতিকের মতো বিজলীর পেছনে সমস্ত জীবনই তাকে হাঁটতে হবে। দুই বাহুর বেষ্টনীর মধ্যে কোনোদিন তাকে পাবে না।

নিশ্বাস সহজ হল আমার। হেসে বললাম, 'তাই নাকি! খড়ি পেতে গুনতে জানেন বুঝি?'

'তা যা বলেছেন দাদা।' জোরে হেসে উঠল রতীশ।

আমিও হাসতে লাগলাম। পরিহাসের সুরে বললাম, 'এভাবে হবে না ব্রাদার। কপাল ঠুকে একদিন বিজলীর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এতদূরে বসে একনিষ্ঠ হয়ে পুজো করছেন। দেবী কি টের পাচ্ছে?'

আমার এ-কথার উত্তর রতীশ দিল না। লক্ষ করলাম, একটু আগের উচ্ছ্বসিত হাসিটাকে মুখের ওপর থেকে মুছে ফেলেছে সে। হঠাৎ আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'আচ্ছা দাদা—'

তার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল—ত্রস্ততা ভীতি সংশয় বা অন্য কিছু—যাতে চকিত হয়ে উঠলাম। চোরা চোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললাম, 'কী?'

'বিজলীদেবী সেদিন আপনার কাছে কতক্ষণ ছিলেন?'

'বেশ কিছুক্ষণ। ধরুন দশটা নাগাদ গিয়েছিল। দুপুর বেলা আমার ওখানেই তো খাওয়া-দাওয়া সারল। আমার ঘরের আর তিনটি ছেলে—সুধাংশু গণেশ আর রজত—ওদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করল। ফিরেছে বিকেলের একটু আগে। কিন্তু কেন বলুন তো?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রতীশ বলল, 'বিজলীদেবী চলে যাবার কতক্ষণ পর আপনার ওখানে পুলিশ গিয়েছিল? মনে আছে?'

বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। রক্তের দাগ শুঁকে শুঁকে যেমন করে শ্বাপদেরা আসে তেমন করেই পুলিশ সেদিন বিজলীর খোঁজে আমাদের 'চাওল'-এ হানা দিয়েছিল। সে-কথাটা সেদিনের পর আর বিশেষ মনে ছিল না আমার।

বিজলী চলে যাবার অনেক পরে এসেছিল পুলিশ। যদি ধরে নেওয়া যায়, রতীশ হালদার বিজীলর সঙ্গে সারাক্ষণ ছায়ার মতো লেগে থাকে, তা হলে বিজলীর পিছু পিছুই তার চলে যাবার কথা। পুলিশের খবর সে পেল কোথায়? আমার শ্বাস আবার রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। রতীশের দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরানো গেল না। আমি যেন একটা ফাঁদে আটকে গেছি। স্খলিত সুরে বললাম, 'পুলিশ! মানে?'

এবার এক কাণ্ডই করল রতীশ। আমার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'তাই তো, পুলিশ আবার কিসের? আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে আপনার সঙ্গে পুলিশটা জুড়ে দিয়েছি।'

রতীশ এড়িয়ে যাবার জন্য যে কৈফিয়ৎটা দিল তা কি সত্যি? না পুরোপুরি মিথ্যে? মিথ্যেও যদি হয়, তবু পুলিশের হানা দেওয়াটা মনে মনে স্বাকীর করতেই হবে। নিজের কাছে অস্বীকারের কোনো রাস্তাই কোনোদিকে খোলা নেই।

রতীশ পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'বিজলীদেবী খুব বিলাসিনী, না দাদা?'

বুকের মধ্যে হাতুড়ির আওয়াজ এখনও থামে নি। এলোমেলো স্বরে বললাম, 'তা বলতে পারেন।'

'খরচ টরচ দু'হাতে করেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি একদিন বলেছিলেন, বিজলীদেবী মস্ত একটা চাকরি করেন। তাই না ব্রাদার সাহেব?'

মনে পড়ছে, বলেছিলাম। আদৌ বিজলী কী করে, সে সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। সেই চাকরির ব্যাপারে রতীশ কী জানতে চায়, বুঝতে না পেরে দ্বিধান্বিত সংশয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কত ইনকাম ট্যাক্স দেন?'

নিশ্বাস ফেলার আগেই একটার পর একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। ভেবে চিন্তে, বিবেচনা করে যে উত্তর দেব, সে অবকাশটুকু পর্যন্ত পাচ্ছি না। বললাম, 'তা তো বলতে পারব না ভাই।'

তৎক্ষণাৎ রতীশ বলল, 'বিজলীদেবী কোন অফিসে চাকরি করেন দাদা?'

'ঠিক জানি না।'

'আচ্ছা, দেশে থাকতে উনি তো সন্ন্যাস নিতেই চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। তখন মঠেই ঘোরাঘুরি করত বিজলী। দিনে একবার হবিষ্যান্ন খেত। গেরুয়া ।দর আর সাদা চুল-পেড়ে ধুতি পরত। বন্ধন ছিল একমাত্র কাকা। তিনি মারা গেলে মঠে ।াওয়া স্থির করে ফেলেছিল ও।'

'আমি যদি বলি, বিজলীদেবী চাকরি করেন না।' হঠাৎ আক্রমণের সুরে কথা ক'টা বলে ।সল রতীশ।

'না-না, তা কী করে হয়! বড় চাকরি না করলে এমন রাজসিক চালে চলে কেমন করে?' পিছু হটার ভঙ্গিতে মিনমিনে, ক্ষীণ সুরে উত্তর দিলাম।

'অনেক ভাবেই চলা যায়। যত বড় চাকরিই হোক, ক'পয়সা আর মেলে!' বলতে বলতে একটু থামল রতীশ। কিছুক্ষণ পর আবার বলল, 'বিজলীদেবী যে বিলাসের ভেতর ।লেন, শুধু চাকরিতে তা কি সম্ভব? অন্য কিছু করেন না তো?'

'আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করেন রতীশবাবু? আমি যতদূর জানি বিজলী চাকরি ।রে। এর বাইরে আর কিছু করে কিনা, বলতে পারব না। আচ্ছা ঢের রাত হল, আমি ।লি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই শব্দ করে হেসে উঠল রতীশ। হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফের বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনি এ-সব খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছেন নাকি? বলেছেন, বিজলীদেবী চাকরি করেন। দ্যাটস এনাফ। আপনি কি আর মিথ্যে বলবেন?'

আমি নিশ্চুপ। এ-সব আদৌ ভাল লাগছে না। লোকটা এমন যে তাকে এড়ানোও যায় না, আবার সহ্য করাও অসম্ভব। মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল।

আমার চোখে তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি ফুটে বেরিয়েছিল। কপালে ধারাল ছুরি বসিয়ে কেউ যেন বিরক্তির ক'টি রেখা এঁকে দিয়েছে। আমি যে এ-সব পছন্দ করছি না, মুখচোখের ভঙ্গি এবং সমস্ত অবয়বের কাঠিন্যই তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু যেদিকে আমার অপার বিতৃষ্ণা সেদিকে ফিরেও তাকায়নি রতীশ। একরকম চোখ বুজেই সে ডেকে উঠেছিল, 'ব্রাদার সাহেব—'

নিরুৎসুক সুরে উত্তর দিলাম, 'বলুন—'

'বিজলীদেবী যদি কারও ওপর কৃপা করেন সে নিশ্চয়ই বড়লোক হয়ে যেতে পারে, কি বলেন?'

'হয়তো পারে। আমি জানি না।'

রতীশ একটুক্ষণ কী ভাবল; তারপর বলে উঠল, 'বিজলী প্রসঙ্গ থাক। বুঝতে পারছি, আপনার ভাল লাগছে না। ওই লেবুটা বড্ড কচলে ফেলেছি। তা আপনার নিজের খবর টবর বলুন।'

বিজলী সম্বন্ধে রতীশ যে আর কোনো প্রশ্ন করবে না, আপাতত এতেই আমি খুশি কিন্তু তবু মনে হল, বিরোধী পক্ষের উকিলের মতো উলটোপালটা প্রশ্ন করে যা জানবার সবই জেনে নিয়েছে লোকটা।

কী জেনেছে রতীশ? বুঝতে পারছি না। আর পারছি না বলেই বিচিত্র অস্বস্তিতে আমার সমস্ত চেতনা অস্থির হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, রতীশের এই অসংলগ্ন প্রশ্নগুলোর পেছনে নির্দোষ কৌতূহলই শুধু নেই। গূঢ়, গভীর এবং রহস্যময় কিছু আছে।

রতীশ তাড়া দিয়ে উঠল, 'কি দাদা, একেবারে মুখে চাবি মেরে রইলেন যে! খবর টবর বলুন। আচ্ছা দাঁড়ান, আগে একটু চা আনাই।'

আমার 'না-না' সত্ত্বেও একরকম জোর করেই চা, পাঁপর আর পকৌড়া নিয়ে এল রতীশ। তারপর নতুন পর্যায়ে আড্ডা শুরু হল। আড্ডা আর কি। একতরফা প্রায় সব কথাই বলে গেল রতীশ। আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে দিয়েও বলাল।

হাজার হাজার শব্দের মধ্যে থেকে যে নির্যাসটুকু ছেঁকে বার করা যায় তা এইরকম বোম্বাই থেকে খুব তাড়াতাড়িই গোন্ডিয়া অঞ্চলে রতীশকে বদলি হয়ে যেতে হবে। হেড অফিস থেকে সেইরকম নির্দেশ এসে গেছে। এদিকে দেশ থেকে সপ্তাহে নিয়মিত তিনখানা করে চিঠি আসছে। বাবা লিখছেন, মা লিখছেন, ঠাকুরদা লিখছেন। সমস্ত চিঠির সারমর্মই অভিন্ন। রতীশকে তাঁরা ফিরে যেতে বলছেন। উদ্দেশ্য— সেই সনাতন, সেই চিরাচরিত

কোথায় নাকি শাস্ত্র-সুলক্ষণা গৌরবর্ণা গুণবতী একটি মেয়ে খুঁজে পেয়েছেন। শুভকর্মের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। রতীশের পৌঁছবার শুধু অপেক্ষা।

এতক্ষণে রতীশের দম-আটকানো ঘরখানায় দক্ষিণা বাতাস বইল যেন। লঘু কৌতুকের সুরে বললাম, 'এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব রতীশবাবু। যান যান, মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কালই কলকাতার টিকিট কেটে ফেলুন।'

'না দাদা, তা হয় না।' প্রবলবেগে মাথা নাড়ল রতীশ, 'বিয়ে আমি করব না।'

'কেন?'

রতীশ উত্তর দিল না।

বললাম, 'বুঝেছি।'

'কী?' রতীশ দ্বিধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করল।

'ব্যাপারটা খুবই সোজা। এক কাজ করুন না, সামনের রাস্তটা পেরিয়ে সোজা বিজলীর ফ্ল্যাটে চলে যান। তারপর বিয়ের আর্জিখানা পেশ করে বলুন, 'দেবী প্রসীদ, দেবী প্রসীদ।' দেখবেন, দেবী বরদা হয়েছেন। আর যদি সাহসে না কুলোয়, আপনার হয়ে আমিই বলতে পারি।'

'কী যে বলেন দাদা—'

এ-ঘরে নিয়ে এসে বিজলী প্রসঙ্গে যখন উলটোপালটা প্রশ্ন শুরু করেছিল রতীশ, নিদারুণ অস্বস্তিতে ছটফট করছিলাম। এখন অবশ্য আবহাওয়া পুরোপুরি বদলে গেছে। হালকা মেজাজে দু'জনেই বেশ মজা টজা করছি।

রতীশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একসময় বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় নেমে বিজলীদের সুবিশাল ম্যানসনটার দিকে যেতে যেতে মনে হল, একটু আগের চপল পরিহাসের রেশটা দ্রুত কেটে যাচ্ছে।

প্রথমত, এখন প্রায় ন'টার মতো বাজে। এত রাতে বিজলীর কাছে যাওয়া বোধ হয় উচিত হবে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের 'চাওল'-এ পুলিশের হানা এবং রতীশ হালদারের সেই এলোমেলো অসংলগ্ন প্রশ্ন—সব একাকার হয়ে আমার চেতনায় অতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে। বিজলীকে ঘিরে দুর্জ্ঞেয়, ভয়াবহ কী যেন আছে। সেটা যে কী, বলতে পারব না। ব্যাখ্যা করে বোঝানোও আমার সাধ্যের অতীত। সজ্ঞানে নয়, পাঁচটি সচেতন ইন্দ্রিয়ের বাইরে নামহীন ষষ্ঠ যে ইন্দ্রিয়টি রয়েছে, অস্পষ্টভাবে কী যেন ধরা পড়েছে সেখানে। কী সেটা? কী?

আরো একটা ব্যাপার আছে। সেটা আমার সঙ্কোচ। সেদিন সুধাংশুরা বিজলীকে 'বৌদি' বলেছে। সেই সম্বোধনটা নিয়ে বিজলী আমার সঙ্গে নিষ্ঠুর কৌতুকের একটা খেলা খেলে এসেছিল। ছেলেবেলায় একটা বিড়ালীকে চড়াই পাখি ধরতে দেখেছিলাম। চোখ বুজে ছাদের কার্নিসের এককোণে বসে ছিল সেটা। আর চড়াইটা তার যোগনিদ্রা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে, উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। উড়তে উড়তে যখন সে পাল্লার মধ্যে এসে গেছে, ঠিক সেই সময় বিড়ালী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ধারাল নখে একবারেই পাখিটার

ধড় থেকে মাথা ছিঁড়ে ফেলে নি। ডানা ভেঙে দিয়ে থাবার কাছে রেখে আবার চোখ বুজেছিল। পাখিটা যখন বাঁচায় আশায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছে, মিটমিটিয়ে তাকাচ্ছিল বিড়ালী। পালাবার ইচ্ছাটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের দেখলেই থাবার একটি আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে দিচ্ছিল। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে শিকারটাকে নিয়ে খেলেছিল বিড়ালী। সেদিন বিজলী আমাকে নিয়ে ওই জাতীয় একটা নির্মম পরিহাসের মহড়া দিয়ে এসেছে।

আজ বিজলীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কীভাবে তার দিকে তাকাব? সুধাংশুদের 'বৌদি সম্বোধনটা নিয়ে কোনো কৈফিয়ত হয়তো সে চাইবে না, কিন্তু তার ঠোঁটের ফাঁকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শব্দহীন একটু হাসিও কি ফুটে উঠবে না? সরাসরি প্রশ্ন করলে একটা জবাবদিহি অন্তত দেওয়া যায়। কিন্তু সেই নিঃশব্দ হাসির মধ্যে যে ব্যঙ্গ, যে ধিক্কার মেশানো থাকবে তার উত্তর কিভাবে দেব?

বিজলীর কাছে যাব কি যাব-না, এই দ্বিধার মধ্যে দুলতে দুলতে কখন যে তার ফ্ল্যাটটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, খেয়াল নেই। সচেতনভাবে নয়, ঘোরের ভেতরেই বোধহয় পাঁচতলার শ'খানেক সিঁড়ি ভেঙেছি। ঘোরের মধ্যেই কলিং বেলে আঙুল রেখে চাপ দিলাম।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। তার ফাঁক দিয়ে পরিচিত একটি বেয়ারার মুখ উঁকি মারল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মেমসাহেব আছেন?'

'জি, হাঁ।' বেয়ারা ঘাড় কাত করল।

'কী করছেন?'

'তাস খেলছেন।'

'অন্য কেউ আছে?'

'জি, না। একা একাই খেলছেন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। তারপরেই কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। আজ আর ভেতরে ঢুকব না। শাড়ির প্যাকেট আর অ্যাটাচি কেস বেয়ারাটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এই দু'টো তোমার মেমসাহেবকে দিয়ে দিও। আর বোলো, ললিতবাবু দিয়ে গেছে। বুঝলে?'

বেয়ারা জানালো, 'জি।'

জিনিস দু'টো দিয়েই নিচের দিকের সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলাম। একতলায় এসে স্তম্ভিত হতে হল। সেই বেয়ারাটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আর উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিকে সেদিক কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার চোখেমুখে অপরিসীম উৎকণ্ঠা।

আমি এসেছি সিঁড়ি বেয়ে। বুঝলাম, বেয়ারাটা লিফটে ওপর থেকে নেমে এসেছে। আমাকে দেখে ছুটে এল সে। মনে হল, হাতের মুঠোয় আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছে। এক নিশ্বাসে বললে, 'ভাগ্যিস আপনাকে পেলাম, নইলে আজ আমার জান পায়মাল হয়ে যেত সাব।'

'কী ব্যাপার, তুমি আমাকে খুঁজতে এসেচ কেন?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

'আপনি তো প্যাকেট আর অ্যাটাচি কেস দিয়ে এলেন। আমি গিয়ে মেমসাবকে সে সব দিলাম আর বললাম, ললিতসাব দিয়েছেন। মেমসাব পুছলেন, আপনি কোথায়? আমি বললাম, চলে গেছেন। বলতেই খেপে গেলেন মেমসাব। বুরা (খারাপ) গালাগাল দিয়ে পায়ের স্লিপার ছুড়ে মারলেন।'

'কেন?'

'আপনাকে কেন বসাইনি, সে জন্যে। স্লিপার মেরে মেমসাব বললেন, যেখান থেকে পারি আপনাকে যেন ধরে নিয়ে আসি। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি। মেহেরবানি করে ওপরে চলুন সাব। নইলে মেমসাব আমার হাল খারাপ করে ছাড়বেন। আইয়ে সাব।' মুখচোখ করুণ হয়ে উঠল বেয়ারাটার।

সেদিন আকস্মিকভাবে রাতে হানা দেবার ফল হয়েছিল ভয়াবহ। আজ দেখছি একেবারে উলটো ব্যাপার। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বেয়ারাটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'চল।'

ওপরে এসে যা দেখলাম তা অভাবনীয়! দরজার কাছে বিজলী দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি যেতে আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে বসাল। অনুযোগের সুরে বলল, 'এটা কিরকম হল ললিতদা?'

সুধাংশুদের বৌদি বলার সেই সঙ্কোচটা আমার অস্তিত্বের সকল দিকেই ফাঁস পরিয়ে রেখেছে। কিছুতেই মাথা তুলে তাকাতে পারছি না। নতচোখে জড়িত সুরে বললাম, 'না, মানে—'

'ঘরের দোর পর্যন্ত এসে যদি পরের মতো ফিরে যাও, নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দিই, বল তো? আমার মুখ লুকোবার আর জায়গা রইল না তোমার জন্যে।' ক্ষোভ অভিমান আর দুঃখ, সব একাকার হয়ে বিজলীর গলা রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। কিছুক্ষণ পর একটু কেশে স্বরটাকে মুক্ত করে সে বলল, 'বেয়ারাটাও এমন হাঁদা গঙ্গারাম যে কেউ এলে ডেকে বসাবে, সে আক্কেল পর্যন্ত নেই। দিয়েছি বোকাটাকে কষে বকুনি।'

অবাক বিস্ময়ে আমি শুধু আরেক দিনের কথাই ভাবছি! তুলনামূলকভাবে আজকের এই উদার আমন্ত্রণ, এই সাদর উষ্ণ আপ্যায়ন কেমন যেন খাপছাড়া ছন্দোপতনের মতো মনে হচ্ছে। কোনটা সত্যি? আজকের এই অভিমান-গাঢ় কণ্ঠস্বর, এই ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণ, না সেদিনের সেই উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, কুৎসিত ব্যবহার?

বিজলী আবার বলে উঠল, 'বুঝেছি—'

তার গলায় এমন একটা ঢেউ ছিল যাতে চকিত হয়ে মুখ তুললাম, 'কী?'

'সেদিন রাত্তিরে তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্যে এখনও আমাকে ক্ষমা করতে পারনি। অথচ আমার বাইরের দিকটা দেখে আর মুখের ক'টা কথা শুনেই অভিমান পুষে রাখলে ললিতদা? আমার ভেতর দিকে যদি একবার চোখ ফেরাতে—' কথাটা অসমাপ্ত রেখেই থেমে গেল বিজলী।

বিব্রত, শিথিল সুরে কী উত্তর যে দিলাম, বুঝতে পারলাম না। নিজের কাছেই তা দুর্বোধ্য মনে হল।

বিজলী বলল, 'আমার একান্ত অনুরোধ, অভিমানটা পুষে রেখ না। যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে, ক্ষমা করে দিও।' একটু থেমে পরমুহূর্তেই ফের আরম্ভ করল, 'কাল বৃষ্টি থেমেছে। আমি জানতাম আজই তুমি আসবে। সেই সকাল থেকে 'এই আসো, এই আসো' ভেবে অস্থির হয়ে আছি। শেষ পর্যন্ত যা-ও এলে—যাক গে সে কথা। আমার একটা আবদার কিন্তু তোমায় আজ রাখতে হবে।'

'কী আবদার?' এতক্ষণে আমার গলায় স্বাভাবিক স্বর ফুটল।

'সকাল থেকেই ভেবে রেখেছি, তুমি এলে আজ আর যেত দেব না। চুটিয়ে আড্ডা দেব। তারপর পুণার দিকে বেড়াতে যাব। তা এলে কিনা একেবারে মাঝরাতে। এখন আর কোথায় বেড়াতে বেরুব!' একটু থামল বিজলী। পরক্ষণে কী ভেবে বলতে লাগল, 'না হয় না-ই বেড়াব। দু'জনে গল্প করে করে রাতটা কাটিয়ে দেব। কেমন?'

'রাত্তিরে থাকব?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী! না-না—'

'না কেন?'

দ্বিধান্বিত সুরে বললাম, 'রাত্তিরে থাকলে হয়তো তোমার অসুবিধে হবে। তার চাইতে কোন দরকারি কথা যদি থাকে, চটপট সেরে ফেল। ওয়েস্টার্ন রেল এ-মাস থেকে রাত বারটা পর্যন্ত ট্রেন দিয়েছে। খারে ফিরতে আমার কষ্ট হবে না।'

ক্ষুব্ধ স্বরে বিজলী বলল, 'নাঃ, সে-রাতের কথাটা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না দেখছি। যাও যাও, তোমার সঙ্গে কোনো কথা নেই। একটা অন্যায় করে ফেলেছি, তার জন্যে ক্ষমা আর পেলাম না। এর চাইতে হাজার গুণ অন্যায় করে লোকে পার পেয়ে যায়।'

বিজলীর চোখেমুখে আর কথাগুলিতে অভিমানিনী সরলা বালিকার ছাপ ছিল। আমি হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতেই বললাম, 'আচ্ছা বাপু, আমি থেকেই যাচ্ছি। তোমাকে আর মুখ ভার করতে হবে না।'

আগাগোড়াই লক্ষ করেছি, দূরে যখন থাকি, প্রায় সর্বক্ষণই বিজলী সম্বন্ধে দুরন্ত বিতৃষ্ণা অনুভব করি। ঘৃণা, ধিক্কার আর পৃথিবীর যাবতীয় 'ছি ছি' একাকার হয়ে আমাকে তোলপাড় করতে থাকে। প্রতিজ্ঞা করি, বিজলীর কাছে আর আসব না। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ তা মনে থাকে না। অজগরীর আকর্ষণে সম্মোহিত প্রাণীর মতো পায়ে পায়ে আবার পার্শি কলোনিতে চলে আসি। শুধু কি আসিই? বিজলীর ইচ্ছার কাছে নিজের সব কিছু সঁপে দিই। আমার ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা, প্রতিজ্ঞা—বিজলীর সামনে এসে দাঁড়ালে একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্ধের মতো, অসহায়ের মতো, আত্মসমর্পিতের মতো তখন তার নির্দেশে আমার চলাফেরা, ওঠা-বসা। একান্ত অনুগতের মতো বিমূঢ় সত্তা নিয়ে বিজলীকে অনুসরণ করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর খোলা থাকে না আমার সামনে।

বিজলী ছেলেমানুষের মতো আমার একখানা হাত তার কোলে নিয়ে আঙুলগুলো ফুটিয়ে দিতে লাগল। এটা তার খুশির প্রকাশ। আঙুল ফোটাতে ফোটাতে বলল, 'তুমি আমার সত্যিকারের আপন জন। নিজের লোক ছাড়া কেউ কারও দুঃখ বোঝে, না আবদার রাখে?'

রাত্রিবেলা খেতে বসে আমরা প্রচুর গল্প করলাম। হাসলাম প্রচুরতর। সুধাংশুদের জন্য আমার যে সঙ্কোচটা ছিল হাসির হাওয়ায় সেটা যে কখন উড়ে গেছে, টেরও পেলাম না। আমার যেখানে কুণ্ঠা আর আড়ষ্টতা সেদিকে একবারও চোখ ফেরায়নি বিজলী। যে-আশঙ্কাটা করেছিলাম, তার মুখেচোখে চাপা বিদ্রূপ ফুটে উঠবে, তা-ও দেখলাম না। আগের মতোই তার অকুণ্ঠ অন্তরঙ্গতার মধ্যে আবার ভেসে গেলাম।

কথায় কথায় নিজের অজান্তে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'আচ্ছা বিজলী—'

উৎসুক দৃষ্টিতে বিজলী তাকাল।

'রতীশ হালদার বলে তুমি কাউকে চেন?'

'না তো। কেন?'

'না, এমনি!' আমি ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলাম।

'এমনি নয়।' বিজলীর চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে।'

'কী আবার থাকবে?' আমার হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত হল।

'না থাকলে হাসছ যে? বল, রতীশ হালদার কে? কী করেছে?'

'তোমার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।'

'পাগল! আমার জন্যে!' বিজলীর চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটে ওঠে; 'তার মানে?'

'মানেটা হল, রতীশের বাবা-মা তার জন্যে মেয়ে ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে সে দিওয়ানা বনে গেছে। দূর থেকে সে জপ করছে, তুঁহু মম প্রাণ, তুঁহু মম জীবন, তুমি আমার আনন্দ, তুমি আমার সারাৎসার, তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি ছাড়া আমার বেঁচে থাকা মিথ্যে, আমার জগৎ অসার।'

'তাই নাকি, তাই নাকি?' বিজলী উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'এমন একটি নীরব ভক্ত যে এককোণে বসে আমার দিকে ফুল বেলপাতা ছুঁড়ে যাচ্ছে, টের পাইনি তো।'

'যাই বল, এটা হাসির কথা নয়। তুমি হলে তার জীবন-মরণ সমস্যা।' মুখখানা সকরুণ গম্ভীর করে তুলতে চেষ্টা করলাম।

'আমি হাসির কথা বলেছি?' বলেই হাসতে লাগল বিজলী, 'আচ্ছা ললিতদা, তা এই ভক্তটির বর্তমান অবস্থান কোথায়?'

'এই কাছাকাছি। তোমার বাড়ির উলটো দিকের বিল্ডিংয়ে।'

'কী করে?'

'মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ওটা নামেই। তোমাকে ধ্যান করা ছাড়া তো আর কিছু করতে দেখি না।'

'বাঃ, বাঃ। একসেলেন্ট। প্রাণনাথ বলে এখুনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি?'

'তা হলে তো ছোকরা বেঁচে যায়।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কী ভেবে একসময় বিজলী বলল, 'আচ্ছা ললিতদা, ছেলেরা বুি বিশেষ একজনকে না পেলে উন্মাদ বনে যায়?'

হালকা চালের প্রশ্নটার জবাব হালকা চালেই দিলাম, 'তা যায় বইকি।'

'তা হলে—' ঠোটের ফাঁকে অদ্ভুত একটা হাসিকে টিপে মেরে নিপাট ভালমানুযে গলায় বিজলী বলে উঠল, 'একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট করে বলতেই হবে। না বললে শুন না।'

'কী কথা?'

চোখের তারাদু'টো এককোণে এনে আমার দিকে তাকাল বিজলী। ফিসফিসিয়ে বল 'তুমি কার জন্যে এত বয়েস পর্যন্ত ব্রহ্মচারী হয়ে আছ?'

আমি যে এতদিন বিয়ে করিনি সেটা ইচ্ছার অভাবে নয়, আমার সামর্থ্যের অভাবে। য রোজগার করি তাতে আমার একার পক্ষে চলাই দুরূহ। তার ওপর 'শঙ্করা'কে ডে আনার দুঃসাহস হয়নি। কিন্তু বিজলী যে ইঙ্গিত দিয়েছে সেটা আমাকে ভীষণ অস্বস্তি ফেলে দিয়েছে। লঘুভাবেই যদিও সে বলেছে তবু তার বক্তব্য এইরকম। যেন তারই জ এতকাল কৌমার্য অটুট রেখেছি। বিব্রত সুরে বললাম, 'সবাই কি এক কারণে—'

আমার কথা শেষ হল না। তার আগেই উচ্ছ্বসিত পাহাড়ী ঢলের মতো খিল খিল ক হেসে উঠল বিজলী।

অনেকক্ষণ হাসির পর বিজলী থামল। কী ভেবে গম্ভীর ব্যগ্র স্বরে এবার বল 'তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব দরকারি কথা আছে ললিতদা। আসলে সেটা বলা জন্যেই তোমাকে আটকেছি। শুধু গল্প করার জন্যে নয়।'

'কী কথা?'

আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল বিজলীর। ব্যস্তভা সে বলে উঠল, 'ভাল কথা, আজকাল আমার মনটা কিরকম ভুলো হয়ে যাচ্ছে, দেখ এতক্ষণ এসেছ অথচ সুধাংশু, রজত আর গণেশের খবরটা পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। চমৎকা ছেলে ওরা। আছে কেমন সব?'

'ভালই আছে। ওরা কোনো সময়েই খারাপ থাকে না।' আমি বললাম।

'ওদের সেদিন নেমন্তন্ন করে এসেছিলাম। তোমাকে একটা কাজ করতে হ ললিতদা—'

'বল।'

সামনের দেওয়ালে বিদেশি এয়ার লাইনসের সুদৃশ্য একখানা ক্যালেন্ডার টাঙানো ছিল তার পৃষ্ঠায় দৃষ্টি রেখে বিজলী বলল, 'আসছে শনিবারের গায়ে লাল রঙের জামা দেখি যেন। ওটা নিশ্চয়ই ছুটির দিন।'

অপ্রত্যাশিত একটা ছুটি যে ক্যালেন্ডারের পাতায় লুকিয়ে ছিল, এ-খবর জানতাম দেখে শুনে তদন্ত করে সোল্লাসে সায় দিলাম, 'তাই তো!'

'সেদিন দুপুরবেলা আমার এখানে সুধাংশুদের নেমন্তন্ন। ওদের নিয়ে আসার দায়িত্ব তোমার। দুপুরে খাওয়া বলে একেবারে বারটার সময় এনে তুলো না। সকালের দিকেই নিয়ে এস। বুঝলে?'

মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম, বুঝেছি। তারপরেই নিজের অজান্তে সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রসঙ্গ পেড়ে বসলাম। কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই, তবু বললাম, 'জানো বিজলী, সেদিন আমাদের চাওল থেকে তুমি চলে আসার পর একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।'

'কী?'

আমার অবচেতনে কোথায় যে কথাগুলি পাক খাচ্ছিল, টের পাইনি। বলে ফেললাম, 'পুলিশ এসেছিল।'

'পুলিশ!' বিজলী চকিত হয়ে উঠল।

লক্ষ করলাম, বিজলীর চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছে। হাত-পা কেমন যেন শিথিল। কণ্ঠার কাছটা অল্প অল্প কাঁপছে। কপালে মুক্তোর দানার মতো কণা কণা ঘাম দেখা দিয়েছে। বললাম, 'হ্যাঁ, পুলিশ। তারা একটি মেয়েকে খুঁজছিল। নাম অবশ্য বলেনি। আমি বলে দিয়েছি, আমার এখানে কোন মেয়েটেয়ে আসেনি।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই প্রায় চিৎকার করে উঠল বিজলী, 'কেন, কেন তুমি মিথ্যে বলেছ পুলিশকে? তোমার কি ধারণা পুলিশ আমার পেছনে লেগেছে আর তাদের ভয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি তোমার ঘরে গিয়ে উঠেছিলাম?'

খুব স্বচ্ছভাবে না হলেও অস্পষ্টভাবে এরকম একটা ভাবনা যে আমাকে পীড়িত, বিদ্ধ এবং আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছিল, সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। মনের ভেতরকার সেই সংশয় এই মুহূর্তে কেমন যেন এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হয়ে যেতে লাগল। তবে কি আমি যা কল্পনা করেছি তার মধ্যে সত্যের এতটুকু অবকাশ নেই? বিজলী চলে আসার পরই পুলিশ হানা দিয়েছে—এই দু'য়ের যোগাযোগে আমার মন দ্রুতবহ দুরন্ত ঢলের মতো স্বাভাবিক একটি সিদ্ধান্তের দিকে ছুটতে শুরু করেছিল। এই মুহূর্তে সেটা থমকে দাঁড়াল। আড়ষ্ট গলায় কোনওরকমে বলতে পারলাম, 'মানে—সেদিন—'

বিজলী আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন মেয়ের পেছনে পুলিশ লাগলেই কি ধরে নিতে হবে সে মেয়ে বিজলী। ছি ছি, তুমি আমাকে কী ভাব!'

আর কিছু বলতে সাহস হল না। নতচোখে ম্রিয়মাণ বসে রইলাম।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। মাথা না তুলেও টের পেলাম, অস্থির আঙুলে একটা ফর্ক ধরে প্লেটের খাবারগুলো নাড়াচাড়া করছে বিজলী। সুদৃশ্য গেলাসে রক্তবর্ণ যে তরল সাজানো রয়েছে সে-সম্বন্ধে এখন তার নিদারুণ উদাসীনতা। বুঝলাম, কিছুক্ষণ আগে যে অন্তরঙ্গতার স্রোতে আমরা ভাসছিলাম সেটা আর নেই। একটু আগের সুর একেবারেই কেটে গিয়েছে।

কতক্ষণ পর মনে নেই, ডান কাঁধে কোমল হাতের স্পর্শ পেলাম। মুখ তুলতেই বিজলীর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। ঘনিষ্ঠ, নরম গলায় সে বলল, 'ওই দেখ, আবার তোমাকে বকাবকি করলাম।'

বললাম, 'আমারই তো দোষ। বকেছ, ঠিক করেছ। ওটা আমার প্রাপ্য।'

'প্রাপ্য!'

'নিশ্চয়ই। তুমি চলে এলে। তারপর এল পুলিশ। পুলিশ এল বলেই তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে, এটা ধরে নিতে হবে নাকি?'

'দেখ ললিতদা, কথাটা শুনে ভারি রাগ হয়েছিল।' বিজলী বলতে লাগল, 'এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, তোমার কোনও দোষ নেই। তোমার জায়গায় আমি থাকলেও ওই ধারণাই করতাম। সে যাক গে—' আমার একটা হাত তুলে নিজের মুখটা বাড়িয়ে সে বলল, 'তুমি আমাকে মার ললিতদা—'

'মারব!' আমি চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ, মারবে। টেনে টেনে চড় কষাবে। তোমার ওপর বার বার অন্যায় করে ফেলছি আমার শাস্তি পাওয়া দরকার। একান্ত দরকার। কই চুপ করে রইলে যে? মার—মার—'

বিজলীর ছেলেমানুষিতে হেসে ফেললাম, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

'যাক বাবা, হেসেছ তা হলে। বাঁচলাম। মুখখানা যা করে রেখেছিলে!' বলতে বলতে সচেতন হয়ে উঠল বিজলী, 'ও কি, কিছুই যে খাওনি। নাও নাও, চটপট হাত চালাও।'

খেতে খেতে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আজেবাজে ঝামেলার ভিড়ে আসল ব্যাপারটাই কিন্তু তুমি ভুলে গেছ বিজলী।'

জিজ্ঞাসু সুরে বিজলী বলল, 'কী ব্যাপার, বল তো—'

'কী একটা দরকারি কথা বলার জন্যে আমাকে আজকের রাতটা আটকেছ যেন? সেটা তো বললে না।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজলী বলল, 'দেখ ললিতদা, কোনো সিরিয়াস কথা বলতে হলে মানসিক একটা পস্তুতির দরকার হয়, মানো তো?'

স্বীকার করলাম, 'মানি।'

'আজকে এমন সব আলোচনা হল যাতে মনটা সিরিয়াস ব্যাপারের জন্যে তৈরি নেই। তুমি তো সুধাংশুদের নিয়ে শনিবার আসছই। সেদিন বলব।'

চোদ্দ

আজ শনিবার।

বিজলী বলেছিল, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই যেন আমরা পার্শি কলোনিতে চলে আসি। আমরা অর্থাৎ আমি এবং আমার ঘরের আর তিন শরিক। বিজলীর ফ্ল্যাটে আমাদের সবার আজ নেমন্তন্ন।

সকালে উঠেই আসতে বলেছিল কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। স্নান সেরে বেরোতে বেরোতে রীতিমতো বেলাই হয়ে গেল। সূর্যটা সরাসরি মাথার ওপর না এলেও মহারাষ্ট্রের আকাশ বেয়ে অনেকখানি উঁচুতে উঠে এসেছে।

সেদিন পার্শি কলোনি থেকে এসে সুধাংশুদের বলেছিলাম, 'শনিবার কেউ কোনও কাজ রাখবি না। সকালবেলা উঠে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'কোথায় যাব তোমার সঙ্গে?' সুধাংশুরা সমস্বরে জানতে চেয়েছিল।

'নেমন্তন্ন খেতে।'

'নেমন্তন্ন! বল কি!' পৃথিবীর সবটুকু বিস্ময় চোখের তারায় জড়ো করে কিছুক্ষণ নিষ্পলক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল সুধাংশুরা। তারপরেই সোল্লাসে গেয়ে উঠেছিল, 'সখিরে কিবা শুনাইলে শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল আকুল করিল মনপ্রাণ।'

উল্লাসটা কিঞ্চিৎ থিতিয়ে এলে গণেশ বলেছিল, 'দু'বছরের ওপর বোম্বাইতে আছি। এর মধ্যে কেউ একবেলা ডেকে খাইয়েছে বলে মনে করতে পারছি না। তা হ্যাঁ গো ললিতদা—'

'বল— জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম।

'এই বোম্বাই শহরে এমন মহাত্মাটা কে আছে যে আমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়ার দলকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে চায়?'

সুধাংশু বলেছিল, 'তার নাম বল। নাম শুনে মন-প্রাণ সার্থক করি।'

বলেছিলাম, 'তার নাম বিজলী। মনে নেই, বর্ষার ভেতর যেদিন সে এখানে এসেছিল সেদিন তোদের নেমন্তন্ন করে গেল? আমাকে বার বার করে বলে দিয়েছে, শনিবার তোদের যেন তার ওখানে নিয়ে যাই।'

আমার ঘরের তিন শরিক এবার হুল্লোড় শুরু করে দিয়েছিল। 'তাই বল দাদা, বৌদি আমাদের খাওয়াবে। বৌদি যে সেদিন নেমন্তন্ন করে গিয়েছিল, সেটা একদম ভুলে গেছলাম। দাদা-বৌদি কি জয়।'

জয়ধ্বনি দিয়ে সুধাংশুরা আমাকে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করেছিল। আর বিব্রত, সন্ত্রস্ত আমি—ললিত চৌধুরি, সমানে চিৎকার করেছিলাম, 'ওরে ছাড়-ছাড়-ছাড়।'....

এখন সাবার্বন ট্রেনে দাদার স্টেশনে নেমে আমরা 'ফোর মাস্কেটিয়ার্স' পার্শি কলোনির কাছাকাছি এসে পড়েছি।

হঠাৎ পাশ থেকে সুধাংশু ডেকে উঠল, 'আচ্ছা দাদা—'

'কী?' আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলাম।

'বৌদি তো আমাদের খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কারণটা কী?'

'কারণ আবার কী। ইচ্ছা হয়েছে, খাওয়াচ্ছে। কারণ ছাড়া কেউ খাওয়ায় না নাকি ?'

আরেক পাশ থেকে রজত চেঁচিয়ে উঠল, 'তোকে আর কারণ খুঁজতে হবে না সুধা। পাঞ্জাবি-সিন্ধি-গুজরাটি-মারাঠিদের হোটেলে খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে। জিভ গিয়েছে বোদা মেরে। বৌদি নেমন্তন্ন করেছে, মুখে একটু-আধটু ভাল-মন্দ পড়বে। তা উনি গেলেন কারণ খুঁজতে!'

সুধাংশু কিঞ্চিৎ দমে গেল, 'আমি ভাবছিলাম, এই নেমন্তন্নটা যদি একেবারে শুভকাজ উপলক্ষে হত, তাহলে চুটিয়ে আনন্দ করা যেত।'

'শুভকাজটা কী রে?'

'কী আবার, দাদা-বৌদির বিয়ে।'

'আরে আহাম্মক, বিয়ের নেমন্তন্ন তো পাবিই।' রজত বিজ্ঞের মতো বলল, 'আমরা ছাড়া দাদার বিয়ে দেবে কে? এই বোম্বাই শহরে এমন বন্ধু আর কেউ আছে দাদার? তা ফাউ একটা যখন পেয়ে গিয়েছিস চোখকান বুজে সেটা সেঁটে নে। বুঝলি?'

'বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। ওটুকু না বোঝার মতো গাধা ঠাওরালি নাকি আমাকে? তবে কথাটা কী জানিস?'

'কী?'

কিছুদিন কলেজে যাতায়াত করেছে সুধাংশু। সেই সময়টায় যুক্তিবিজ্ঞানের দু-চারখানা পাতা তাকে ওলটাতে হয়েছিল। গম্ভীর চালে সে বলল, 'দ্যাখ রাজু, কারণ ছাড়া কোনো কার্যই হয় না। ললিতদা বলেছে, নেহাত অকারণে বৌদি আমাদের খাওয়াচ্ছে আজ। তা আমি কী বলি জানিস?'

'কী?'

'আজকের এই খাওয়ানোটার পেছনে আমরাই একটা কারণ জুড়ে দিই না কেন। তা হলে লজিকটা অন্তত বাঁচে।'

'কী কারণ?'

'দাদার বিয়ে তো একদিন হবেই। বিয়ের আগে পাকা দেখা হয়, জানিস?'

'বাঙালির ছেলে হয়ে জানব না?'

'ধর আজ পাকা দেখা। আর সেই উপলক্ষেই আমাদের নেমন্তন্ন।'

'মন্দ বলনি ব্রাদার।' রজত উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'বৌদিকে গিয়ে এ-কথাটা বলব। শুভস্য শীঘ্রম। পাঁজি-টাঁজি যোগাড় করে আজকেই বিয়ের ডেটটা ঠিক করে ফেলতে হবে। হাজার হোক, আমরাই যখন বরকর্তা।'

চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা জমাট বেঁধে গেল। বিজলীর ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে এরা কী জাতীয় মাতামাতি করবে, তার ফলে আমার অবস্থাখানা কিরকম দাঁড়াবে তার একটা স্পষ্ট চেহারা চোখের ওপর ভেসে উঠছিল। যতই তা ভাবছি ততই শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

দেখাদেখি সুধাংশুরাও থেমে গিয়েছে। বলল, 'কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে পড়লে যে?'

শঙ্কিত, কাঁপা সুরে বললাম, 'বিজলীর ওখানে গিয়ে তোরা কিন্তু এমন চ্যাংড়ামো করবি না। সে এ-সব পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করে কি করে না সেটা আমরা বুঝব। তোমার উপদেশের প্রয়োজন নেই। দু'দিন পর যে আমাদের বৌদি হবে, তার কাছে কোন উপনিষদ পাঠ করতে হবে, তা আমরা

জানি। নাও, চল—' বলেই আমার হাত ধরে টান লাগাল সুধাংশুরা। আর তাদের টানে টানে আমার আড়ষ্ট পা দু'টো এগিয়ে চলল।

খানিকটা এগোতেই গণেশ বলল, 'আচ্ছা ললিতদা, বৌদি খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা করেছে? মাংস-টাংস হবে তো?'

'গেলেই দেখতে পাবি।' অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিলাম।

একসময় পার্শি কলোনিতে সেই সুবিশাল ম্যানসনটার কাছে পৌঁছে গেলাম। ফটকের ভেতর পা বাড়াতে যাব, সেই সময় সুধাংশু শুধলো, 'এখানে ঢুকছ যে!'

তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বা রে, তা হলে কোথায় ঢুকব! এখানেই তো তোদের নেমন্তন্ন। এই বাড়িটার সব চেয়ে উঁচু ফ্লোরটায় বিজলী থাকে।'

সমস্ত ম্যানসনটার দিকে চকিতে দৃষ্টিক্ষেপ করে সুধাংশু বলল, 'এখানে থাকে!' গলার স্বর কেমন যেন শিথিল শোনাল তার।

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই দু'টো বয় মাটি ফুঁড়ে সামনে উঠে এল। পরনে ধবধবে উর্দি, মাথায় নীল টুপি। উর্দির ক্রিজগুলো নির্ভুল, উদ্ধত।

বয় দু'টো অপরিচিত নয়। বিজলীর ফ্ল্যাটে যেদিন আসি, তাদের দেখি। লম্বা সেলাম ঠুকে তারা বলল, 'সেই সুবহ (সকাল) থেকে আমরা ইন্তেজার করছি।'

ব্যাপারটা অভিনব বটে। পার্শি কলোনির এই বিল্ডিংয়ে আমি প্রায়ই আসি। ক'মাস ধরে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছি। কিন্তু অভ্যর্থনার এমন রাজকীয় সমারোহ আগে আর কখনও দেখিনি।

যতবার এসেছি, সরাসরি এক শ'খানা সিঁড়ি ভেঙে, হাঁটুতে খিল ধরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠেছি। কোনওদিন একতলার গেটের কাছে সারি সারি বেয়ারাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি নি। ধাতস্থ হতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। তারপর বললাম, 'কী ব্যাপার, সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

'মেমসাব বলেছেন, আপনারা এলে যেন লিফ্‌টে চড়িয়ে ওপরে নিয়ে যাই। আইয়ে—' বয় দু'টো পথ দেখিয়ে লিফ্‌ট বক্সের দিকে এগিয়ে চলল।

পাশ থেকে রজত ফিসফিসিয়ে উঠল, 'মেমসাব কে দাদা?'

'বিজলী।'

'বয় দু'টো?'

'তারই।'

'বিজলী দেবী খুব বড়লোক?' রজতদের চোখেমুখে অস্বস্তি-মেশানো কৌতূহল ফুটে বেরুল।

লক্ষ করলাম, এবার আর বৌদি বলেনি রজত। সজ্ঞানে কি অবচেতনে জানি না, তার মুখ থেকে 'বিজলী দেবী' বেরিয়ে এসেছে। বললাম, 'আর মিনিট দু'য়েক ধৈর্য ধর না। তারপর নিজের চোখেই দেখতে পাবি, বিজলী বড় লোক না গরিব লোক।'

লিফ্‌টে উঠবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মসৃণ আরামে পৌঁছে গেলাম। পৃথিবী থেকে প্রা
একশ' ফুট উচ্চতায় উঠে এসেছি। এত অনায়াস গতিতে এসেছি যে টেরই পেলাম না।

লিফ্‌টটা থামতে প্রথমে নামল বয় দু'টো। তাদের পিছু পিছু নিঃশব্দে আমরা চারজন

নেমেই বয় দু'টো ছুটে গেল বিজলীর ফ্ল্যাটের দরজার দিকে। গিয়েই কলিং বেলে চাপ
মুহূর্তে দরজাটা খুলে গিয়ে যে বেরিয়ে এল সে বিজলী।

শুশুরিয়ার মঠযাত্রিণী সন্ন্যাসিনী মেয়েটিকে নানাভাবে, নানা পরিবেশে নানা বিচি
রূপে দেখেছি। কিন্তু আজ সে অভাবনীয়। চিরদিনই সে সুরূপা, সুমধ্যমা, সুস্তনী। আজ সে
আশ্চর্য সুবেশা।

বিজলীর পরনে সাদা সিল্কের শাড়ি আর ব্লাউজ। শাড়ি এবং ব্লাউজের মধ্যবর্তী
অনেকটা অংশ উন্মুক্ত। সেখানকার স্বর্ণাভ রংটা রৌদ্রঝলকের মতো মনে হয়। পায়ে সাদ
ঘাসের সিঙ্গাপুরি চটি। বাঁ হাতের কবজিতে সাদা ব্যান্ডে ঘড়ি বাঁধা। ডান হাতের অনামিকা
চোখের আকারে দীর্ঘ হীরে-বসানো আংটি। ডান হাতে একখানা জড়োয়া ব্রেসলেট, কানে
দক্ষিণীদের মতো মুক্তোর ইয়ার-রিং। সত্যিই সারসী, শ্বেত সারসী।

মেরিন ড্রাইভে এক যুগ পর যেদিন বিজলীকে প্রথম অবিষ্কার করি সেদিন চোখে
পড়েছিল, ব্রোঞ্জ রঙের দীর্ঘ চুলগুলো ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। পরে পার্শি কলোনিতে এসে মাঝে
মাঝে তাকে হেয়ার টনিক ব্যবহার করতে দেখেছি। আজ সেগুলো টনিক বা সবরকম তেল
বর্জিত। রুক্ষ হলেও চুলগুলোতে সযত্ন শাসন আছে। ফলে যদিও ফুলে ফেঁপে চামরের
মতো হয়ে আছে তবু একটি চুলও এলোমেলো বিশৃঙ্খল হয়ে মুখ বা গালের দিকে এসে
পড়েনি। সব মিলিয়ে কেমন অলৌকিক মনে হয়।

শরীরময় শুভ্রতার পটে বিজলীর চোখদু'টি কিন্তু রক্তাভ। রক্তাভ কেন, বেশ লালই
বলা যায়। সেটা যে লৌকিক পানীয়ের প্রভাবে তা আমার অজানা নয়। সুধাংশুদের সঙ্গে
যদিও দীর্ঘকাল একই 'চাওল'-এ একই ঘরের সামান্য কয়েক বর্গফুট জমির মধ্যে আমার
চলাফেরা, ওঠাবসা, ঘুম, তবু তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। চক্ষু নামক
ইন্দ্রিয়টি যদি তাদের তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে, বিজলীর চোখের রক্তাভার হেতু অনায়াসেই বুঝে
নিতে পারবে।

এই ফ্ল্যাটের দিকে চোখে ফেরালে নিতান্ত অর্বাচীনও ধরে ফেলবে কতখানি বিলাসের
মধ্যে বিজলী দিন কাটায়। তাকে স্ল্যাকস পরতে দেখেছি, সালোয়ার-কুর্তা পরতে দেখেছি,
পেশোয়ারি মুসলমানিদের বেশে দেখেছি, কিন্তু শুভ্রতার প্রচ্ছদে এমন বিলাসিনী সাজতে
আগে আর কখনও দেখিনি।

তুলনামূলকভাবে নিজের পোশাকের দৈন্যটা বার বার আমাকে বিদ্ধ করছিল। যদিও
ফর্সা তবু আমার জামাখানা দেড় টাকা গজের লংক্লথের, মিলের ধুতিটার দাম সাত টাক
আর পায়ে যে কোলাপুরি চটিজোড়া রয়েছে সে দু'টো এই সেদিন ফ্লোরা ফাউন্টেনের
ফুটপাথ থেকে সাড়ে পাঁচ টাকায় কিনেছি।

আমার এই দীনতা নিয়ে অজস্র বার পার্শি কলোনিতে এসেছি। কিন্তু সঙ্কোচ আজ ছাড়া সেভাবে কখনও টের পাই নি। সে সুযোগই দেয়নি বিজলী। আন্তরিকতা আর অকুণ্ঠ প্রীতির স্রোতে আমার সমস্ত আড়ষ্টতা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সে।

কিন্তু আজ বার বার এত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছি কেন? এমন বিলাসিনী সেজে কেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিজলী? আর্থিক দিক থেকে আমরা যে বিপরীত মেরুর তা কোনওদিন কোনও ছলেই বুঝতে দেয়নি সে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সমস্ত শরীরে বড়মানুষির প্রদর্শনী সাজিয়ে ইচ্ছে করেই সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এতকাল সরাসরি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেছি। মনে হয়েছে ঘনিষ্ঠ কারও অন্তঃপুরে গিয়ে ঢুকেছি। কিন্তু আজ ফটকের কাছে বয় দাঁড় করিয়ে রাখার ঘটা, কলিং বেলে চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ছুটে আসা, সমস্ত কিছুর মধ্যেই কি একটা ছলনা, নাকি কপটতা কিংবা লোক-দেখানো সমারোহ রয়েছে? বুঝতে পারছি, এ-সব একটা দুস্তর দূরত্ব দিয়ে ঘেরা। চিরদিনের চেনা বিজলীকে আজ বড় অপরিচিত মনে হচ্ছে। তার আজকের এই আচরণ, সাজসজ্জা, সমস্তই ইচ্ছাকৃত, অনেক আগে থেকেই পরিকল্পিত। কিন্তু কেন? কেন?

আমার পাশে সুধাংশুদের দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিজলী, 'আপনারা এসেছেন, কী খুশি যে হয়েছি! না এলে ভারি দুঃখ পেতাম।'

রাস্তায় আসতে আসতে ক্ষণে ক্ষণে প্রগলভ হয়ে উঠছিল সুধাংশুরা। আমাকে জ্বালিয়ে মারার নানা পরিকল্পনা নিয়েছিল। লক্ষ করলাম, তাদের চাপল্য আর প্রগলভতার চিহ্নমাত্র নেই। আশ্চর্য রকমের স্তব্ধ তারা। দারুণ জড়সড়। আধফোটা গলায় গুডিয়ে গুডিয়ে বিজলীর কথার যে জবাব দিল রজত, তা আদৌ বোধগম্য হল না।

বিজলী বলল, 'আসুন ভাই, সবাই ভেতরে আসুন।'

ভেতরে ঢুকে আবার স্তম্ভিত হতে হল। এতকাল মেঝেতে যে কার্পেট বিছানো ছিল সেটা ছিল লুধিয়ানার, তার রং ছিল সবুজ। তার জায়গায় হলুদ রঙের নতুন জয়পুরি কার্পেট এসেছে। একটার জায়াগায় দু'টো অ্যাকুয়েরিয়ম। দিনদু'য়েক আগেও যে সোফা দেখে গিয়েছিলাম, সেগুলো আর নেই। তার বদলে নতুন আরেক সেট এসেছে। রেডিওগ্রাম একটা ছিল, আজ দেখছি দু'টো।

বিজলী বলল, 'বসুন।'

পশ্চিম বোম্বাইয়ের এক 'চাওল'-এর আমরা চার বাসিন্দা পরস্পরের কাছে ঘন হয়ে প্রায় জড়াজড়ি করেই বসলাম। এই ফ্ল্যাটে বহুবার এসেছি। এখানকার ঐশ্বর্য এবং ভোগের সঙ্গে আমার তবু পরিচয় আছে। সুধাংশুদের কাছে এ একেবারে অভাবিত। বিমূঢ়ের মতো তারা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

আমরা বসলে বিজলী বলল, 'আজ বেশ গরম, না?'

এক মাস অবিরাম ঝরার পর বৃষ্টি থেমেছে। সেই ধারাবর্ষণেও মহারাষ্ট্রের কর্কশ পাথুরে মাটির উত্তাপ আদৌ জুড়োয়নি। আশ্বিন মাস প্রায় এসে গেল। রোদ এখনও তপ্ত। পৃথিবীর দাহ কমবার কোনও লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যাবে না এখানে। বিজলীর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে এয়ারকুলারটা চালিয়ে দিই?'

'দাও।'

আমার সম্মতি পাবার পর সুধাংশুদের দিকে ফিরল বিজলী, 'কি, দেব? আপনাদের আপত্তি নেই তো?'

জড়িয়ে জড়িয়ে সুধাংশুরা কী যে বলল, বুঝতে পারলাম না।

একটা বয়কে ডেকে ঘরখানা শীতল করার নির্দেশ দিল বিজলী। তারপর বলল, 'ঘর তো ঠাণ্ডা হল। এবার শুকনো গলাগুলোকে একটু ভিজিয়ে নিলে হত না? ক'টা বাজে?' বাঁ হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে আমার উদ্দেশে বলল, 'সবে সাড়ে এগারটা। খিদে পেয়েছে নাকি? তা হলে চল, একেবারে ডাইনিং টেবলে গিয়ে বসি।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না না. এত শিগগির খিদে পায় কি? পরে খাব।'

'গুড। তা হলে গলা ভেজাবার ব্যবস্থাটা করি। তুমি তো চরাচরে পানীয় বলতে একটি মাত্র বস্তুকেই বোঝ। সেটা জল। তা জল আর তোমাকে দেব না। কফি আনতে বলি তোমার জন্যে?' বলতে বলতে সুধাংশুদের দিকে তাকাল বিজলী, 'আপনারাও আপনাদের ললিতদার গোত্রের নাকি?'

কোনওরকমে গলার ভেতর থেকে স্বরটাকে বার করে এনে সুধাংশু বলল, 'ললিতদার গোত্র মানে?'

'জানেন না?'

'কই না তো।'

'স্কুল কলেজে পড়তে চিরটা কাল আপনাদের ললিতদা গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পেয়েছে।'

তৎক্ষণাৎ আমি প্রতিবাদ জানালাম, 'আমি আবার কবে গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পেলাম?'

এক মুহূর্ত না ভেবে বিজলী বলল, 'না পেলেও তোমার যা স্বভাব-চরিত্র তাতে পাওয়া উচিত ছিল। তা বুঝলেন সুধাংশুবাবু, আপনাদের ললিতদা বিড়ি খায় না, সিগারেট খায় না। মদ তার অস্পৃশ্য। স্কুল-কলেজের বাইরে গুড কন্ডাক্টের জন্যে প্রাইজ দেবার ব্যবস্থা থাকলে ও সবগুলো ব্যাগ করে ফেলত। তা জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনারাও ওই দলেরই নাকি?'

লক্ষ করলাম, আজও আমাকে সরাসরি 'দাদা' ডাকল না বিজলী। মনে মনে শঙ্কিত হলাম। আমি জানি সুধাংশুরা আমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে বিড়ি-সিগারেট খায়। আমি যে বয়সে তাদের চাইতে বড়, সেটুকু সম্মান অন্তত তারা দিয়ে থাকে। অতএব বিজলীর প্রশ্নে সুধাংশুর মাথা ঝুঁকে পড়ল। বিড় বিড় করে অস্পষ্টভাবে কী যে সে বলল, একমাত্র সে-ই জানে।

বিজলী এবার বলে উঠল, 'গলা ভেজাবার ব্যাপারে আপনাদের দাদার মতো কফিই আনতে বলব? না, তার চাইতে ঝাঁজালো-টাজালো অন্য কিছু?'

চকিতে মুখ তুলল সুধাংশু, 'ঝাঁজালো?'

'হ্যাঁ, এই ধরুন বিয়ার।'

'বিয়ার!'

'নইলে রাম?'

'রাম!'

'কিংবা হুইস্কি?'

'হুইস্কি!'

'তাতেও যদি গলা না ভেজে রাশিয়ান ভদকা আছে, ফ্রেঞ্চ কনিয়াক আছে, অ্যারেবিয়ান আরাক আছে। আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই। যেটা চাইবেন সেটাই পাবেন।' বিজলী হাসতে লাগল।

'ভদকা, কনিয়াক, আরাক—' বিজলীর মুখ থেকে যে-সব নাম বেরিয়ে এসেছে, বিমূঢ়ের মতো সেগুলো প্রতিধ্বনি করতে করতে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল সুধাংশু, 'না না, ও-সব চলবে না।'

'বুঝেছি বুঝেছি।' মৃদু অর্থময় হেসে আমাকে দেখিয়ে বিজলী বলল, 'এই লোকটার সঙ্গে এক গোয়ালে থাকেন তো। সঙ্গদোষের রং তো ধরবেই। জিজ্ঞেস করাটা আমারই ভুল হয়েছিল।' একটু থেমে, কী ভেবে আবার আরম্ভ করল, 'তা হলে আপনাদের সবার জন্যেই কফি আনতে বলি। আমার কিন্তু ও-সব নিরামিষ গঙ্গাজলে চলবে না। আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, আমার জন্যে হুইস্কিই আনাব।'

সুধাংশু স্পষ্ট করে কিছু বলল না। তার গলার ভেতর থেকে কাতরানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল মাত্র।

একটা বয়কে ডেকে কফি আর হুইস্কি আনতে বলে দিল বিজলী। সে-সব এলে আমাদের সামনে কফির কাপ সাজিয়ে নিজে হুইস্কির গেলাস তুলে নিল। চুমুক দিতে দিতে সুধাংশুদেব উদ্দেশে বলল, 'সেদিন আপনাদের ওখানে গিয়ে কত আনন্দ করে এলাম। কত ঠাট্টা, কত হুল্লোড়। আজ সবাই এমন চুপচাপ কেন?'

উত্তরে আড়ষ্ট একটু হাসল সুধাংশু।

ওদের আড়ষ্টতার কারণ মোটেই অবোধ্য নয়। আমাদের 'চাওল'-এ সেদিন যে বিজলীকে তারা দেখেছিল সে তাদের আজন্মের চেনা। সেবায়-প্রীতিতে, হাসি আর পরিহাসে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত উচ্ছলিত রঙ্গিণী মেয়েটা তাদের প্রাণে তরঙ্গ তুলে দিয়ে এসেছিল। আর অস্থির দোলায় তারা যত দুলেছিল, মেতে উঠেছিল ততোধিক। সেই সেবাময়ী মরমী রূপটি বাঙালির ছেলে চিরদিনই ধ্যান করে এসেছে। এ শুধু চিন্ময়ীই না, প্রত্যহের ধরাছোঁয়ার সীমার ভেতর নিয়তই একে পাওয়া যায়। কখনও বউদি রূপে, কখনও শ্যালিকা রূপে এই সহজ প্রাণবন্ত মূর্তিটি বার বার ধরা পড়ে।

সেই বর্ষায় বিজলী আর সুধাংশুদের অপরিচয়ের কোনও সঙ্কোচ ছিল না। সেখানে ছিল তারা অকুণ্ঠ। বাংলাদেশ থেকে বার শ' মাইল দূরে চিরন্তন এক বাঙালিনীকে আবিষ্কার করে তারা প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল। অবাধে অসঙ্কোচে প্রাণটাকে মেলে দিয়ে পরিহাসের উৎসবে মেতে উঠতে তাদের এতটুকু অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু আজকের বিজলী তাদের অপরিচিত। আজন্মের চেনা সেই সব রমণীরূপের স
এর কোথাও মিল নেই। চারপাশে অফুরন্ত ভোগ আর ঐশ্বর্যের মেলা সাজিয়ে রেখে
বিজলী হুইস্কি নিয়ে বসেছে। সেদিন যে-মেয়েটি আমার একখানা ধুতি গাছকোমর ক
পরে পশ্চিম বোম্বাইয়ের 'চাওল'-এ চারটি পুরুষকে খাওয়াতে বসিয়েছিল, সে কি এই
অনেকখানি আশা নিয়ে পার্শি কলোনিতে এসেছিল সুধাংশুরা কিন্তু আসামাত্রই মোহভ
হয়ে গিয়েছে। আজকের বিজলী হাজারো অপরিচয় দিয়ে ঘেরা।

তা ছাড়া যে-মেয়ে সেদিন অমন হুল্লোড় বাধিয়েছে, হাসিমুখে স্বাদগন্ধহীন বিস্বাদ খিচু
পেট পুরে খেয়ে এসেছে তার সম্বন্ধে কী কারণা করেছিল সুধাংশুরা? যদিও আমাকে কি
জিজ্ঞেস করেনি তবু মনে হয় তারা অনুমান করেছিল, বিজলী আমাদেরই মতো মধ্যবি
সমাজের একেবারে নিচুতলার জীব। কিন্তু এখানে এসে দেখেছে ঘরের মেঝে কার্পে
মোড়া, এয়ার কুলারে তাপ জুড়োবার ব্যবস্থা, ডজন খানেক বয় হুকুম তামিলের জন্য এ
পায়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া বাংলাদেশের কুলের বালা হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়েছে
এতগুলো অভাবিত বিস্ময় তারা সামলাতে পারেনি। বকবকায়মান প্রগলভ ছেলে তিনা
একেবারে নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

বিজলী আবার বলল, 'আপনাদের সব খবর টবর বলুন।'

সুধাংশু চুপ। গণেশ চুপ। রজত শুধু কোনওরকমে বলতে পারল, 'কী আর খবর বল
দিন আনি, দিন খাই। সমস্ত দিন অসুরের মতো খেটে রাত্তিরে মোষের মতো ঘুমুই। আবা
সকালে উঠে ঘানি কাঁধে তুলি।'

হুইস্কির গেলাসটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বিজলী বলল, 'দি
আনা দিন খাওয়া, আপনাদের আর আমার সবারই এক অবস্থা। এ-বাজারে পায়ের ওপ
পা তুলে কে আর আছে বলুন?'

এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের শীতল আরামে তার কথাগুলো ভয়ানক ঠাট্টার মতো
শোনাতে লাগল।

এরপর হাসিতে-পরিহাসে আসর জমাবার চেষ্টা করল বিজলী। বার বার কোনও সর
প্রসঙ্গের খেই সুধাংশুদের দিকে এগিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু কুণ্ঠিত ছেলে তিনটি হা
বাড়িয়ে খেইটা ধরে হাসির বাষ্পে সেটাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, তা
কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। বিজলীর সঙ্গে তারা সঙ্গৎ ধরতে পারল না। ফল হল এ
আসর জমল না।

কিছুক্ষণ বিফল প্রচেষ্টা চালিয়ে অবশেষে বিজলী বলল, 'একটা প্রায় বাজে। নিশ্চয়
এবার খিদে পেয়েছে?'

সুধাংশুরা সাড়া দিল না। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি জানালাম, 'পেয়েছে।'

'চল, খাবার ঘরে যাওয়া যাক।' আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজলী সুধাংশুদে
দিকে তাকাল। বলল, 'আসুন।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে।

দেখাদেখি আমরাও উঠলাম।

উৎসব নয়, অনুষ্ঠান নয়, নিতান্তই ক'জনে মিলে এক ছুটির দিনে একসঙ্গে বসে
াওয়ার আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। কিন্তু ভোজের যা আয়োজন করেছে বিজলী তা
াতিমতো রাজকীয়।

বিজলীর খাদ্যরুচি আমি জানি। তার মেনুতে ইউরোপিয় খাবারের সঙ্গে খানিকটা
াগলাই আমেজ মেশানো থাকে। আজ শুধু মোগলাই আর ইউরোপিয় নয়, হিন্দু-বৌদ্ধ-
সলিম আর খ্রিস্টান জগতের যেখানে যত সুখাদ্য আছে সব এনে টেবলের ওপর সাজিয়ে
য়েছে সে। খাবারগুলোর কোনও কোনওটার নাম-গোত্র এবং স্বাদ আমি জানি।
াধিকাংশই অবশ্য অজ্ঞাতকুলশীল। অজানা হলেও তাদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমার সংশয়
নই।

সুস্বাদু উষ্ণ খাবারগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আর উঠছে সুগন্ধ। সেই গন্ধটা ডাইনিং
মের বাতাস ম ম করে রেখেছে। আর নাকের মধ্যে দিয়ে পাকস্থলীতে ঢুকে একটা বিপর্যয়
াও বাধিয়ে তুলছে। খিদেটা এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল। লোভনীয় খাদ্যের সুঘ্রাণ সেটাকে
সকে দিতে শুরু করেছে।

সদাব্যস্ত বয়গুলোর ছোটাছুটির বিরাম নেই। প্লেটের পর প্লেট তারা শুধু আনছেই।

পৃথিবীর সমস্ত সুখাদ্য হাতের সামনে সাজানো। আসার সময় লুব্ধ স্বরে রজত জিজ্ঞেস
রেছিল, খাবারের তালিকায় মাংস আছে কিনা। আছে বৈকি। জলচর স্থলচর নভোচর,
ন রকম জীবের মাংসই রয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ প্রাণ ভরে খেতে পারছে না। ঘাড়
াচু করে খাবারগুলো ভয় ভয়ে নাড়াচাড়া করে চলেছে শুধু।

বিজলী বলল, 'ও কি, কেউ যে কিছুই খাচ্ছেন না!'

একেক বার বিজলী তাড়া লাগায় আর সেই তাড়ায় ভেঙে ভেঙে একটু করে খাবার
খে দেয় সুধাংশুরা। সম্ভবত, এই সুখাদ্যগুলোর পাশে তুলনামূলকভাবে সেদিনকার বিস্বাদ
িচুড়িটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তাদের।

এইভাবে প্রায়-নিঃশব্দে খাওয়ার পর্ব চুকল। খাওয়ার পর আবার আমরা বাইরের ঘরে
সে বসলাম। কিছুক্ষণ বসতে না-বসতেই সুধাংশু বলল, 'এবার আমরা যাব।'

'সে কী!' বেশ অবাক হয়েই বলল বিজলী, 'এর ভেতর যাবার কী হল! এই তো খেয়ে
ঠলেন। একটু বিশ্রাম করুন। এসে তো শুধু ড্রইং রুম আর ডাইনিং রুম দেখলেন। আমার
্যাটের আর সব ঘরগুলো তো দেখানোই হল না। কীভাবে আছি, দেখবেন না?'

কীভাবে বিজলী আছে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার বা দেখাবার বোধ হয় আর
য়োজন নেই। ড্রইং রুম আর ডাইনিং রুমের চেহারা থেকে আমার ঘরের তিন শরিক
নায়াসেই তা অনুমান করে নিয়েছে। সুধাংশু বলল, 'আমাদের একটু কাজ আছে।'

'আজ ছুটির দিনে কিসের কাজ? কিছুতেই এখন আপনাদের যাওয়া হবে না।'

একরকম জোর করেই সবাইকে আটকে রাখল বিজলী। এলোমেলো কিছুক্ষণ কথা বলে
আমাদের নিয়ে গেল শোবার ঘরে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দামি দামি আসবাব দেখাল, শাড়ি

দেখাল হাজার রকমের, স্ল্যাকস দেখাল তারও বেশি। ওয়ার্ডরোব থেকে সালোয়ার পাঞ্জাবি-ব্লাউজ-কার্ডিগান-কোট—সব টেনে টেনে বার করে মেঝেতে স্তূপাকার করল অবশেষে বসল গয়নার বাক্স নিয়ে।

সে কি এক আধটা, পর পর সাজানো অসংখ্য ভেলভেটের বাক্স। সেগুলোর ভেতর থেকে বাঙালি রুচি অনুযায়ী শুধু সোনার চুড়ি-দুল-চিক-হার বেরলো কয়েক প্রস্থ দক্ষিণীদের মতো মুক্তো-বসানো, পার্শিদের মতো হীরে-বসানো জড়োয়া গয়না বেরলে অগণিত।

গয়না দেখাতে দেখাতে একটা হীরের নেকলেস তুলে ধরল বিজলী। সুধাংশুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই হারটা আমার এক পার্শি বন্ধু প্রেজেন্ট করেছে।'

দেখতে দেখতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল সুধাংশুদের। দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তারা বিজলীর কথার উত্তরে কিছু বলল না। শুধু বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল।

একটুক্ষণ কী ভেবে বিজলী বলল, 'হারটা কেন দিয়েছে জানেন?'

সুধাংশু ফিসফিসিয়ে উঠল, 'কেন?'

পাশ ফিরে নতচোখে আস্তে আস্তে বিজলী বলল, 'সে আমাকে বিয়ে করতে চায় তাই—' বলতে বলতে সে থামল। মুখখানা সলজ্জ এবং আরক্ত দেখাল তার।

মুখের ওপর এই লালিমা ঘনিয়ে আনা যে রীতিমতো একটা উঁচু দরের অভিনয়, সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বিজলীর অসমাপ্ত কথা শেষ হবার আগেই আমার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। ফটকের কাছে বয় রেখে অভ্যর্থনা রাজকীয় ভোজের আয়োজন, শাড়ি-গয়নার এই বিচিত্র প্রদর্শনী—সব একাকার হয়ে একটা অনিবার্য ইঙ্গিতই দিচ্ছে। সেটা এইরকম। তার এবং আমার মধ্যে কতখানি ব্যবধান, আর সেই দূরত্বটা কতটা দুস্তর সেটাই নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইছে বিজলী। তার এবং আমার, এই দুই অসবর্ণের বিয়ে যে অসঙ্গত এবং অসম্ভব সেটাই তার ব্যাখ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, একসময় সুধাংশুরা মুক্তি পেল। বিদায় নেবার সময় বিজলী বলল, 'আবার আসবেন কিন্তু—'

গুঙিয়ে গুঙিয়ে সুধাংশুরা কী বলল, বোঝা গেল না। তবে এটুকু আঁচ করা গেল, তারা আর কোনওদিনই এখানে আসবে না। এক বর্ষার দুপুরে বিজলীকে 'বৌদি' ডাকার সাংঘাতিক চড়া দাম দিতে হয়েছে তাদের।

সুধাংশুদের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়ছিলাম। বিজলী বলল, 'এ কি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'বা রে, বাড়ি ফিরতে হবে না!' আমি বললাম।

'কী ভুলো মন গো তোমার!'

'ভুলো মন?'

'নয়তো কী? সেদিন কী বলেছিলাম তোমাকে? মনে পড়ে?'

'কী বল তো?' স্মৃতির ভেতর হাজার তোলপাড় করেও কিছুই মনে করতে পারলাম না।

'তোমার সঙ্গে খুব দরকারি একটা ব্যাপার আছে।'

এতক্ষণে মনে পড়ল। দিনকয়েক আগে বিজলী বলেছিল, যেদিন সুধাংশুরা তার এখানে আসবে সেদিন কিছু বলবে। বললাম, 'বল কী দরকার।'

'হুট করে কি বলা যায়! ধীর স্থির হয়ে বসে মন দিয়ে শুনতে হবে।'

সুতরাং আমাকে থেকে যেতে হল। সুধাংশু গণেশ এবং রজত, তিনজন নিঃশব্দে খারে ফিরে গেল।

আজ পার্শি কলোনির এই ফ্ল্যাটটা আমার অসহ্য লাগছে। বিজলী এতকাল আন্তরিকতার যে খেলাটা খেলেছে তার নেপথ্যে এমন ছলনা ছিল, কে জানত! কে জানত, সহৃদয়তার আবরণের তলায় বিজলীর আরেকটা চেহারা ছিল? তবে কি এতদিন আন্তরিকতার ছদ্মবেশে করুণাই করে এসেছে সে?

ক'টা মাস ধরে বার বার পার্শি কলোনিতে আমাকে হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে এসেছে বিজলী। আর লোলুপ একটা কুকুরের মতো ল্যাজ দোলাতে দোলাতে আমি ছুটে এসেছি। সে-ও আমার সামনে কিছু খাবার আর মিষ্টি কথার বকশিস ছুড়ে দিয়েছে। আমি কৃতার্থ হয়েছি, বিগলিত হয়েছি। কিন্তু বিজলীর আপাতমধুর ব্যবহারের ভেতরে বা বাইরে কী মেশানো ছিল, একবারও সেটা খুঁটিয়ে দেখিনি। দেখার অবকাশই পাইনি। সে-জন্য অনুতাপের শেষ নেই আমার, নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। আগেই যদি মোহভঙ্গ হয়ে যেত, আজকের এই অপমানটা মাথা পেতে নিতে হত না।

এত সত্ত্বেও আমি বিজলীর ফ্ল্যাটে থেকে গেলাম। প্রবল বিতৃষ্ণায় সমস্ত অস্তিত্ব যদিও বিরূপ হয়ে উঠেছে তবু মুখ ফুটে বিজলীকে বলতে পারলাম না, আমি চলে যাব। কোনও ছলেই তুমি আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। মনের বিরূপতা আর বিজলীর সামনে তা প্রকাশ করতে না পারার অক্ষমতা, এই দুইয়ের মাঝখানে আমার চেতনা অস্থিরভাবে দোল খেতে লাগল।

সুধাংশুরা চলে যাবার পর আবার ড্রইং রুমে এসে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে একসময় নীরস সুরে বললাম, 'কী বলবে, তাড়াতাড়ি বল—'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অলস ভঙ্গিতে সোফায় শরীর এলিয়ে বসে ছিল বিজলী। চোখ দু'টো অর্ধেক বোজা। সেই অবস্থাতেই বলল, 'অত তাড়া কিসের?'

'আমি খারে ফিরে যাব।'

'সে তো ফিরবেই। সন্ধের পর ফিরো।'

'এত দেরি করা যাবে না। তোমার কথাটা শুনেই চলে যাব।' একটু অসহিষ্ণু সুরেই বললাম,' সুধাংশুরা চলে গেল। আমি এখানে থেকে গেলাম। এটা ভারি খারাপ হল।'

আস্তে আস্তে উঠে বসল বিজলী। নিষ্পলক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে

বলল, 'খারাপ হল বুঝি?'

'হল কিনা, নিজেই বিবেচনা করে দেখ। হাজার হোক, চারটে দুঃখী গরিব মানুষ দু'বছর ধরে একসঙ্গে আছি। একসঙ্গে আমাদের চলাফেরা, ওঠাবসা। একজনের নিশ্বাসের শব্দ শুনে আমরা তার মনের কথা বুঝতে পারি। আমার কোনও কাজে বা ব্যবহারে তারা অসন্তুষ্ট হয় কষ্ট পায়, এ আমি চাই না।'

বিজলীর পলকহীন দৃষ্টি আমার মুখে স্থির হয়েই ছিল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে বলল, 'গরিব, দুঃখী—এসব কী বলছ! আজ তোমার কথাগুলো অন্যরকম লাগছে।'

বিজলী শাড়ি-গয়নার মেলা সাজিয়ে সুধাংশুদের 'বৌদি' ডাকার জন্য নিপুণ নিষ্ঠুর একটা প্রতিশোধ নিয়েছে। তা ছাড়া, কে এক পার্শির বাগ্‌দত্তা হিসেবে হীরের নেকলেস যে উপহার পেয়েছে, তাও জানিয়ে দিয়েছে। এতটা বাড়াবাড়ির দরকাব ছিল না। এমন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আসল লক্ষ্যে পৌছনোও ছিল অপ্রয়োজনীয়। সোজা কথাটা সহজভাবে অনায়াসেই বুঝিয়ে দেওয়া যেত। বিজলীর কাছে আসি, যাই। তার জন্য প্রাণের দুর্জ্ঞেয় কেন্দ্রে আকর্ষণ অনুভব করি। তাই বলে আমি তার প্রণয়প্রার্থী নই। তার আর আমার ভেতর যে যোজন যোজন দূরত্ব সে-ব্যাপারে আমি অতিমাত্রায় সচেতন। নিজের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে এখনও আমি এতটা সন্দিহান হয়ে পড়িনি যে বিজলীকে বিয়ে করতে চাইব।

সব একাকার হয়ে একটা অসহ্য ক্ষোভের চেহারা নিয়ে বুকের ভেতর টগবগ করে ফুটছিল। তারই কিছুটা আমার কথায় বেরিয়ে এল, 'আমরা যে গরিব, একেবারে নিচুতলার মানুষ—সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে কি?'

'ওরে বাবা, এ যে একেবারে আত্মদর্শন শুরু করে দিলে ললিতদা!' লঘু সুরে বলল বিজলী।

'আত্মদর্শন-টর্শন বুঝি না। যা সত্যি তাই বলেছি।' শুকনো গলায় বলতে লাগলাম. 'তোমার দরকারি ব্যাপারটা চটপট সেরে ফেল। খারে ফিরে আমার কাজ আছে।'

'তোমার আবার কী কাজ! এক তো জানি অফিস করা আর আমার এখানে আসা। এর বাইরে আর কিছু আছে নাকি?' আলাপের মধ্যে কৌতুকের একটু রং মেশাতে চাইল বিজলী।

'তুমি আমার কতটুকু জানো?'

'বটে, বটে। আমি জানি না তোমার এমন আরও অনেক দিক আছে বুঝি!' কৌতুকের রংটাকে গাঢ়তর করতে চেষ্টা করল বিজলী। ঠোঁটের প্রান্তে ইঙ্গিতময় একটু হাসি আটকে রেখে বলল, 'তোমার সেই গোপন ব্যাপারগুলো আমাকে বলবে?'

উত্তর দিলাম না।

ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের তারাদু'টো এক কোণে এনে আদুরে কচি খুকির মতো বিজলী ফের বলল, 'ও ললিতদা, বল না—'

আমি এবারও নিশ্চুপ।

'বুঝেছি, তুমি আমাকে বলবে না। বেশ বোলো না। জানি জানি, আমি তোমার পর।' কপট অভিমানে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে বসল বিজলী।

বিজলীর বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। বাংলাদেশের যৌবন তো পঁচিশেই শেষ। সেদিক থেকে বিজলীকে ঠিক তরুণী বলা যায় না। তিরিশোত্তর এক রমণী দশ বার বছরের এক অভিমনিনী বালিকার অভিনয় করছে—এ অসহ্য। ভীষণ বিরক্তি হচ্ছিল। তবু চুপ করেই রইলাম।

কিছুক্ষণ পর বিজলী আবার মুখ ফেরাল। আশ্চর্য, এবার আর তার মুখে চোখে আগের নকল অভিমান বা আদুরে খুকিত্বের চিহ্নমাত্র নেই। এমন সুরে সে আমাকে ডাকল যাতে চকিত হয়ে উঠলাম।

বিজলী বলল, 'এখন তা হলে কাজের কথাটা শেষ করে নিই?'

'নাও।' আমি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না বিজলী। একটুক্ষণ কী ভেবে শুরু করল, 'তোমার তো দশটা-পাঁচটার অফিস?'

'হ্যাঁ।'

'একটা পার্ট টাইম কাজ করবে?' বলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিজলী, 'তুমি আবার মনে করো না যেন, আমি তোমাকে কাজটা দিয়ে অনুগ্রহ দেখাতে চাইছি। আমার একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার। তোমাকে পেলে খুব উপকৃত হব।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললাম, 'কী কাজ?'

'কঠিন কিছু নয়। খুবই লাইট জব। আমার একটা বিজনেস আছে—'

বিজলীর কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলাম, 'বিজনেস!'

'হ্যাঁ।'

'কিসের?'

'সামান্য ব্যাপার। কিছু কিছু মাল বাজার থেকে যোগাড় করে সাপ্লাই দিয়ে থাকি।'

'কী কী মাল?' জিজ্ঞেস করেই বুঝলাম আমার প্রশ্নটা উকিলের জেরার মতো শোনাল।

অনেকক্ষণ এয়ার-কুলারের রুপোলি বাক্সটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল বিজলী। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তার কি কিছু ঠিক আছে? কখনও গয়না-টয়না, কখনও কিউরিও জাতের কিছু, কখনও বা শৌখিন কোনও জিনিস। এই আর কি!'

'ক'মাস হল তোমার এখানে যাতায়াত করছি। কই আগে তো কখনও তোমার ব্যবসা ট্যাবসার কথা বলনি।'

অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বিজলী বলল, 'বলার মতো প্রসঙ্গ ওঠেনি। সে যাক গে, তুমি কত মাইনে চাও বল।'

'বা রে, আমাকে কী করতে হবে তার কিছুই জানলাম না। আগেই মাইনের কথা বলছ!'

বিজলী বলল, 'কাজটা তেমন কিছু পরিশ্রমের নয়। যেখানে যেখানে বলব সেখানে মাল পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। দামি দামি সব জিনিস নিয়ে কারবার। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, বিশ্বাসী লোক কেন দরকার?'

'তা পারছি। কিন্তু—'

'কী?'

'আমার অবস্থা তো জানোই। সামান্য কাজ করি। তা ছাড়া অভাবে স্বভাব নষ্ট। দামি জিনিস হাতে পেয়ে যদি মাথা ঠিক রাখতে না পারি, তখন?'

'কে মাথা ঠিক রাখতে পারবে আর কে পারবে না, তা আমি জানি। এখন বল কাজটা নেবে কি না?'

'এক্ষুনি তোমাকে কথা দিতে পারছি না। আমাকে দিনকয়েক সময় দাও। একটু ভাবি।'

বিজলী বলল, 'ভাবতে চাও? বেশ, ভেবেই বোলো।' একটু থেমে আবার বলল, 'একটা কথা—'

'কী?'

'কাজটা নিলে আমি হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।'

পনের

প্রায় একযুগ ধরে চাকরি করছি। একযুগ অর্থাৎ বার বছর। সময়টা নেহাত কম নয়। এতদিন মুখে রক্ত তুলে খাটছি কিন্তু একটিমাত্র মানুষকেও ভালভাবে খাইয়ে পরিয়ে রাখার সামর্থ্য চাকরিটার নেই।

বার বছরে আমার মাইনে দাঁড়িয়েছে মাত্র কয়েক শ' টাকা। বোম্বাইয়ের মতো শহরে ঘর ভাড়া দিয়ে, খেয়ে, যাতায়াতের খরচ মিটিয়ে মাসের শেষে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। আমার সঞ্চয়ের ঘরটা একেবারে ফাঁকা।

সেই জায়গায় অতি সাধারণ এবং সামান্য একটা পার্ট টাইম কাজের জন্য মাসে হাজার টাকা দিতে চেয়েছে বিজলী। অঙ্কটা আমার মতো চাকুরের পক্ষে লোভনীয় তো বটেই এবং সেই প্রলোভনকে উপেক্ষা করার দুর্জয় শক্তি আমার থাকার কথা নয়।

তা ছাড়া, কাজটার প্রসঙ্গে বিজলীর অজানা একটা দিকের দরজা হঠাৎ খুলে গিয়েছে। সে নাকি ব্যবসা করে। তার ফ্ল্যাটে সাত-আট মাস ধরে হানা দিচ্ছি, কিন্তু এ-ব্যাপারটা আগে টের পাইনি।

বিজলী বলেছে, বাজার থেকে দামি দামি জিনিস সংগ্রহ করে সাপ্লাই দেওয়াই নাকি তার ব্যবসা। এবং সে-সব বিভিন্ন খদ্দেরদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য মাসিক হাজার টাকার প্রলোভন দেখিয়েছে সে।

দিন তিনেক উদ্‌ভ্রান্তের মতো শুধু ভাবলাম। দিনগুলো অস্থিরতার ভেতর কাটল রাতগুলো কাটল বিনিদ্র। সামান্য একটা কাজের জন্য এত টাকা দিতে চাইছে বিজলী। এ মধ্যে কোনও গোলমাল নেই তো? পরক্ষণেই দ্বিতীয় একটি ভাবনা আমার সমস্ত সংশ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হাজার টাকা বাড়তি যদি পাই, সুধাংশুদের নিয়ে আরেকটু ভদ্র জীবনে উঠে যেতে পারব। উত্তর বোম্বাইয়ের বস্তিতে যে কষ্টকর দিনযাপন, তার বাইরে একটা সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আরও একটু আরাম। আরও একটু স্বাচ্ছন্দ্য।

চাকরির ভাবনাটা নাছোড় পেয়াদার মতো সর্বক্ষণ আমার পেছনে লেগে রইল। হাজার টাকার বিপুল অঙ্কটা মস্তিষ্কের অন্তঃপুরে প্রতি মুহূর্তে আঘাত হেনে যেতে লাগল। আর সেই আঘাতটা আমার স্নায়ু-শোণিত-চেতনা এবং অবচেতনার মধ্যে অবিরাম বিচিত্র তরঙ্গ তুলতে লাগল। কিছুতেই মাথার ভেতর থেকে সেটাকে বার করে দিতে পারলাম না। আর আশ্চর্য, বিজলী সুকৌশলে সেদিন যে সূক্ষ্ম অপমান করেছে, সে-কথাটা এক-আধবার মনে পড়লেও তার তীব্রতা যেন তেমনভাবে আর অনুভব করতে পারছি না। হাজার টাকা কি কম কথা!

অবশেষে চতুর্থ দিন সকালে পায়ে পায়ে আবার পার্শি কলোনিতে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম, 'আমি রাজি।'

'বাঁচালে ললিতদা।' কথায় বলে স্বস্তির নিশ্বাস। সেই নিশ্বাসই ফেলল বিজলী।

উৎকর্ণ হয়ে শ্বাস-ফেলার শব্দটা শুনলাম। এবং তার মধ্যে কোনও কপটতা আবিষ্কার করা গেল না।

বিজলী আবার বলল, 'তিনদিন তুমি আসোনি। ভাবলাম, কাজটা বুঝি আর নিলেই না। কোথায় একটা বিশ্বাসী লোক পাব, ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।'

আমি বললাম, 'সে যাক। এখন বল, কবে থেকে আমাকে কাজে লাগতে হবে?'

'আজ থেকে। এই মোমেন্ট থেকেই তুমি অ্যাপয়েন্টড হলে।'

'তা হলে কাজ দাও।'

'বা রে, কাজ হাতে করে বসে আছি নাকি!' বিজলী হেসে ফেলল, 'তুমি যে আজ ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসবে, তা কি জানতাম? আর এলেও যে কাজ করতে রাজি হবে, তার কি কিছু ঠিক ছিল? চাকরি যখন নিয়েছ তখন কাজ নিশ্চয়ই পাবে। তার আগে—'

'কী?'

'আমার ব্যবসা সম্বন্ধে তোমার ক'টা কথা জানা দরকার।'

'বেশ, বল।'

'ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট বলে গভর্নমেন্টের একটা ব্যাপার আছে, তা নিশ্চয়ই জানো।'

যে-কক্ষপথ ধরে আমার মতো চাকরিজীবীর ঘোরাফেরা সেখানে ইনকাম ট্যাক্স নামক ডিপার্টমেন্টরির ছায়া পড়ে না। না পড়লেও তার মহিমা সম্বন্ধে কিছু কিছু জনশ্রুতি কানে এসেছে। বললাম, 'জানি বইকি।'

বিজলী বলল, 'দেখ ললিতদা, আমার ব্যবসাটা ছোটখাট। দু-চার পয়সা যা লাভ হয়, ইনকাম ট্যাক্স দিতে গেলে সেই লাভটুকু তো হবেই না, উপরন্তু খাটুনিই সার হবে। আর নিজেই বিবেচনা করে দেখ, দু-পয়সা যদি লাভ না হয়, কিসের আশাতেই বা খেটে মরা?'

'সে তো বটেই।' আমি পুরোপুরি সমর্থন জানালাম।

'অতএব—' বলেই থেমে গেল বিজলী।

'কী?'

'আমাকে কিঞ্চিৎ ঘুরপথের আশ্রয় নিতে হয়েছে।'

'ঘুরপথ! তার মানে?'

'সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বিজলী বলতে লাগল, 'ইনকাম ট্যাক্স দিতে আমার ইচ্ছে নেই। ব্যবসাটা চালাচ্ছি লুকিয়ে চুরিয়ে। তাই বুঝলে কিনা—' বলতে বলতে থেমে গেল সে।

'কী হল, চুপ করলে কেন?' যুগপৎ কৌতূহলী এবং অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম। অসহিষ্ণু, কেন না একবারে সব বলছে না বিজলী। একটু একটু করে, ভেঙে ভেঙে, থেমে থেমে অস্পষ্ট ইঙ্গিতে যেভাবে বলছে তাতে কৌতূহল আদৌ মিটছে না।

আমার কথার পিঠে তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না বিজলী। তর্জনী এবং মধ্যমার ফাঁকে যে সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে নিঃশেষ হয়ে আসছিল তার আগুনে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। অনেকক্ষণ আয়েস করে গোল গোল আংটির আকারে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ওপেনলি তো কিছু করার জো নেই। ধরা পড়লে ভয়ানক ঝামেলা হবে। তাই কিছু খদ্দের ঠিক করে রেখেছি। এখানে সেখানে তাদের মাল সাপ্লাই করি। আমি একলা মানুষ। সব জায়গায় তো নিজে দৌড়াতে পারি না। দৌড়ানো সম্ভবও নয়। তাই একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার ছিল। তোমাকে পেয়ে কি উপকার যে হল!'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রত ঘরখানায় বিজলীর সিগারেটের ধোঁয়া শুধু বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

একসময় আমিই নীরবতা ভাঙলাম, 'কাজের কথা তো হয়ে গেল। এবার তা হলে আমি উঠি?'

'উঠবে মানে? কাজের কথা শেষ হল কোথায়?'

কিছু না বলে উদ্‌গ্রীব বিজলীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটু চিন্তা করে বিজলী এবার বলল, 'ঠিক আছে, আজ আর তোমাকে ধরে রাখব না। পরশু অফিস ছুটি হলে একবার এস ললিতদা। ছ'টার ভেতর এস কিন্তু। সেদিন তোমাকে প্রথম কাজ দেব।'

'আসব।' বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কথামতো আবার এলাম পার্শি কলোনিতে। যদিও কাগজে-কলমে দু'দিন আগেই চাকরিটা পেয়ে গিয়েছি, আজ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেটা শুরু হবে।

এতকাল বিজলী ছিল সম্পর্কহীন, পরিচিত একটি মেয়ে মাত্র। পার্শি কলোনিতে তার ফ্ল্যাটে যে এসেছি সেটা একান্ত স্বেচ্ছায়—আন্তরিকতা, প্রীতি অথবা অন্য কিছুর আকর্ষণে সে আসার পেছনে কোনওরকম বাঁধন ছিল না। না এলে বিজলী অভিমান করতে পারত ক্ষোভে মুখ ফিরিয়ে থাকাও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু ওই পর্যন্তই। না-আসার জন কৈফিয়তের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজকের এই আসাটা? এটা অন্য দিনের আসার মতো নয়। এর পেছনে দুরন্ত তাগিদ আছে, বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন আছে।

বিজলীর সঙ্গে নতুন সম্পর্ক হতে চলেছে। আমার অফিস যদি প্রথম অন্নদাতা হয় বিজলী দ্বিতীয় অন্নদাত্রী। তার ব্যবসায় বিজলী যদিও খুবই শোভনভাবে আমার সাহায চেয়েছে তবু স্পষ্ট অনুভব করছি, বিজলীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখন থেকে প্রভু-ভৃত্যের।

বিজলীর ফ্ল্যাটে ঢুকতেই সে বলল, 'ঠিক সময়েই এসে গেছ। জাস্ট ছ'টা বেজেছে। আমি তো ভেবেছিলাম অফিস ছুটির পর ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠতে পারবে না। ভারী দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। যাক, এখনই তোমাকে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার কাছে এক পার্টির কাছে যেতে হবে।'

'বেশ, যাব। ঠিকানা দাও, পার্টির নাম বল।' আমি বললাম।

কী একটু ভেবে বিজলী বলল, 'নামের দরকার নেই।'

'তা হলে খুঁজে বার করব কী করে!' বেশ আবকই হলাম।

'অত অস্থির হচ্ছ কেন?' ঈষৎ বিরক্ত সুরে বিজলী বলল, 'কীভাবে বার করবে, সব বলে দিচ্ছি।' বলতে বলতে টকটকে লালরঙের একখানা রুমাল আমার হাতে দিল সে। আর দিল তালাবন্ধ চামড়ার একখানা অ্যাটাচি কেস।

রুমাল আর অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে আমি কোনও প্রশ্ন করলাম না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিজলীর মুখের দিকে তাকিয়ে পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইলাম।

বিজলী আবার বলল, 'এখন মন দিয়ে সব শোন।'

'বল।'

'গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার ডান পাশ ঘেঁষে প্রথম যে ল্যাম্প পোস্টটা আছে তার তলায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে। আর মাঝে মাঝে লাল রুমালটা দিয়ে মুখ মুছবে। বুঝলে?'

ঘাড় কাত করে জানালাম, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি।

সামনের রেডিওগ্রামখানার ওপর একটা ঘড়ি ছিল। একবার সেদিকে তাকিয়ে বিজলী বলল, 'এখন বাজে ছ'টা দশ। ভি. টি স্টেশনে পৌঁছতে তোমার লাগবে মিনিট চল্লিশেক। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নেবে। বাসের আশায় দাঁড়িয়ে থেকো না। ট্যাক্সিতে ভি. টি থেকে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া মিনিট সাত আট। মোটামুটি সাতটা নাগাদ তা হলে সেখানে পৌঁছে যাচ্ছ তুমি।'

একটু থেমে আবার বলল, 'সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত ল্যাম্প পোস্টটার তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এর ভেতর কেউ যদি এসে বলে ইবন সাহেবের কাছ থেকে আসছি, অ্যাটাচি কেসটা তার হাতে দেবে। আটটা পর্যন্ত দাঁড়িয়েও যদি কেউ না আসে, আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। সোজা আমার এখানে ফিরে আসবে।'

অ্যাটাচি কেসটা সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ কৌতূহল হয়েছিল। বলে ফেললাম, 'আচ্ছা বিজলী, আমি নিশ্চয়ই কিছু মাল ডেলিভারি দিতে চলেছি?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাটচিটার ভেতর কী জিনিস আছে?'

হঠাৎ স্বরটাকে কয়েক পর্দা উঁচুতে তুলে রূঢ় সুরে বিজলী বলল, 'কী আছে তা জানবার দরকার নেই তোমার। তোমাকে যা বলা হয়েছে তা-ই করো গিয়ে। নাও, উঠে পড।'

আজ থেকে বিজলীর সঙ্গে আমার যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সে-সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে গেলাম। বিজলীর রূঢ়তার মধ্যে সেই নতুন সম্পর্কটার ঝাঁজ বেরিয়ে এসেছে। একটুক্ষণ হতবাক হয়ে রইলাম। তার পরেই মনে হল, এর ভেতর বিস্ময়ের কিছু নেই। আমার অফিসই হোক আর বিজলীই হোক, পৃথিবীর তাবৎ অন্নদাতার স্বরূপই এক। চাকরি দেবার আগে সহৃদয়া যে বিজলীকে দেখেছি এখন তাকে খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সমস্ত মনিবের মতো মুহূর্তে নিজেকে বদলে ফেলেছে সে।

আমি বললাম, 'আচ্ছা—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই বিরক্ত গলায় বিজলী বলে উঠল, 'আবার কী?'

'মালটা তো ডেলিভারি দেব। টাকা পয়সা আদায় করে আনতে হবে কি?'

'সে-সব আমি বুঝব। তোমাকে ও নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। যেমন যেমন বলেছি, ঠিক তেমন তেমনটি তুমি করবে। সেটুকুই তোমার কাজ। আরেক বার শুনে নাও, মাল যাকে ডেলিভারি দেবে তার সঙ্গে কোনও কথা বলারও দরকার নেই। ডেলিভারি দিয়ে তোমার বাসায় ফিরে যেতে পার। আর কেউ যদি মাল নিতে না আসে, অ্যাটাচি কেস আর রুমাল আমায় ফেরত দিয়ে যেও। এখন বেরিয়ে পড়।'

নির্দেশমতো গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার পাশে সেই ল্যাম্প পোস্টটির তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার পেছনে আরব সাগরের উদার বিস্তার। ডাইনে ব্যালার্ড পিয়েরে সমুদ্রাভিসারী বিরাট জাহাজগুলো নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। আরেক দিকে বহু দূরে এলিফ্যান্টা কেভ। সামনে তাজমহল হোটেলের সুবিশাল বাড়িটা। আলোয় আলোয় সেখানে এখন স্বপ্নলোক। আলোকিত তাজমহল হোটেলের প্রতিবিম্ব আবার সাগরের অশ্রান্ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে অবিরাম দোল খাচ্ছে।

কোনওদিকেই আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি শুধু লাল রুমালটা দিয়ে ঘন ঘন মুখ মুছছি। আর অনুভব করছি, বুকের ভেতর হৃৎস্পন্দনে বার বার তাল কেটে যাচ্ছে। কপালে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম জমেছে। এর নামই কি স্নায়ুভীতি?

সন্ধে থেকেই গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ায় মানুষের গতিবিধি কমে আসে। তখন সব স্রোত, সব ঢল মেরিন ড্রাইভের দিকে। জনবিরল এই রাতে নিঝুম ল্যাম্পপোস্টের তলায় একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার গা ছমছম করতে লাগল। বিচিত্র এক ভয় মেরুদণ্ডের ওপর ভর করে বসল। অসহায়ের মতো চারদিকে তাকাতে তাকাতে ভাবতে লাগলাম, এ কেমন ব্যবসা! শুনেছি ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য নানা প্রক্রিয়া এবং ছলনার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এভাবে নির্জন রাতে মাল বুঝিয়ে দিতে নিজের দিক থেকে একেবারেই সায় পাচ্ছি না। আমার লাল রুমালের নিশানা দেখে কেউ একজন আসবে। তার নাম-ধাম কিছুই জানি না। জিজ্ঞেস করে যে জেনে নেব সে অধিকারটুকু পর্যন্ত আমার নেই। অজ্ঞাত-পরিচয় সেই নিশীথের আগন্তুক এসে জানাবে, কে এক ইবন সাহেবের কাছ থেকে সে আসছে। সঙ্কেতটুকু পাওয়ামাত্র অ্যাটাচি কেসটা হস্তান্তরিত করে নিঃশব্দে চলে আসব।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘিরে কী একটা রহস্য রয়েছে। আমার ভয় করতে লাগল। নিদারুণ, মারাত্মক ভয়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। তবে আধ ঘণ্টার বেশি অবশ্যই নয়। হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কার গরম নিশ্বাস পড়ল। চমকে মুখ ফেরাতেই দেখলাম প্রায় সাত ফুট লম্বা বিশাল চেহারার একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স তিরিশ, চল্লিশ না পঞ্চাশ— অনুমান করা অসাধ্য ব্যাপার। সে বাঙলি না মারাঠি, পাঞ্জাবি অথবা তামিল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই রাত্রিতেও তার চোখ কালো গগল্‌সের আড়ালে অদৃশ্য। আমার যে হৃৎপিণ্ডে বার বার তাল কাটছিল হঠাৎ সেটা থমকে গেল।

আগন্তুক বিশুদ্ধ উর্দুতে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ইবন সাহেবের কাছ থেকে আসছি।'

আমার হাতটা অ্যাটাচি কেস-সমেত যন্ত্রের মতো এগিয়ে গেল। প্রায় ছোঁ মেরে সেটা একরকম কেড়েই নিল লোকটা। তারপর মুহূর্তে ব্যালার্ড পিয়েরের দিকে উধাও হল।

সেদিন গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার সেই ল্যাম্পপোস্টটার তলায় গিয়ে দাঁড়ানো দিয়ে হয়েছিল হাতেখড়ি। তারপর আরও বার চারেক মাল ডেলিভারি দিতে গিয়েছি আমি। তবে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় নয়। একবার গিয়েছি সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে, একবার চার্নি রোড স্টেশনে, একবার তিলক ব্রিজের তলায় আর শেষবার গিয়েছি মাজাগাঁও ডকের কাছাকাছি একটা জায়গায়।

প্রতিবারই তালাবদ্ধ অ্যাটাচি কেস আমাকে দিয়ে ডেলিভারি দিতে বলেছে বিজলী। লক্ষ করেছি, রাত ছাড়া আমাকে অন্য কোনও সময় কাজে পাঠায়নি সে। তার সেই রুমাল দিয়ে মুখ মোছবার মতো কোনও বার স্যুট পরিয়ে বোতাম-ঘরে শ্বেত গোলাপ লাগিয়ে দিয়েছে। কোনও বার পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিয়ে মাথায় ইরানি ফেজ বসিয়ে দিয়েছে মাথায়। এ-সব নিশানা। আর এই নিশানাগুলো দেখেই অজ্ঞাত-পরিচয় রাতের আগন্তুকরা আমার কানে বিশেষ বিশেষ সংকেত-বাক্য আউড়ে মাল ডেলিভারি নিয়ে গিয়েছে। আরও লক্ষণীয়, প্রতিদিনই আমাকে মাল দিয়ে আসতে হয় না। পাঁচ-দশদিন পর পর বিজলী অ্যাটাচি কেস দিয়ে আমাকে পাঠায়।

বিজলীর এই ব্যবসাটির চারদিকে যে রহস্যময় যবনিকা নামানো রয়েছে তাব একটি প্রান্ত তুলেও ভেতর দিকে উঁকি দিতে পারিনি। রহস্যটা রহস্যই থেকে গিয়েছে। অবশ্য প্রথম দিন গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার সেই ল্যাম্পপোস্টটির তলায় দাঁড়িয়ে ভয়ে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। ভয়টা এখনও আমার যায়নি। তবে আগের তীব্রতা অতটা নেই। তীব্রতা নেই, তবে দুরন্ত এক কৌতূহল আমাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে। বিজলীর ব্যবসাটা ঘিরে বিপজ্জনক কিছু একটা আছে। কী সেটা? কী-কী-কী? তা আমাকে জানতেই হবে।

এই ভাবেই মাসখানেক কাটল। দ্বিতীয় মাসের শুরুতে এক ছুটির দিনের দুপুরে বিজলী আমাকে তার ফ্ল্যাটে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিল। যথারীতি গেলাম। আর যেতেই সে বলল, 'আজ রাত এগারটা নাগদ কোলাবা পয়েন্টের কাছে মাল ডেলিভারি দিয়ে আসতে হবে।'

ইচ্ছা ছিল সুধাংশুদের নিয়ে নাইট শো'য়ে সিনেমা দেখব। সেটা আর হবে না দেখছি। তা ছাড়া, রাতের সেই মধ্যযামে নির্জন কোলাবা পয়েন্টের চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে উঠতেই রক্তের ভেতর দিয়ে দ্রুতবহ এক চমক খেলে গেল। নিজের অজান্তে বলে ফেললাম, 'রাত এগারটায়!'

আমার স্বরের মধ্যে যে চড়াই-উতরাই রয়েছে তা ঠিক স্বাভাবিক নয়। সেটা খুব সম্ভব বিজলীর কানে একটু অন্যভাবে ঘা দিয়েছিল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে খুব শান্ত সুরে আমার কথাটারই প্রতিধ্বনি করল সে, 'হ্যাঁ, রাত এগারটায়।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তে বিজলীর সঙ্গে আমার নতুন সম্পর্কটার কথা মনে পড়ল। বললাম, 'বেশ, যাব। তবে—'

'কী?'

'এগারটার সময় তো কোলাবা পয়েন্টে যেতে হবে। বেশ খানিকটা সময় হাতে আছে। এখন উঠি। সাড়ে ন'টা দশটা নাগাদ আসব'খন।' ইতিমধ্যেই আমি ভেবে নিয়েছি, নাইট শো'টা যখন বাতিল করতেই হবে, সুধাংশুদের নিয়ে সন্ধের শো'টাই দেখব।

মাথা নেড়ে বিজলী বলল, 'উঁহু, এখন তোমার যাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'এখন তোমাকে একবার ইগটপুরী যেতে হবে।'

'ইগটপুরী কেন?'

একটু ভেবে বিজলী বলল, 'এবার থেকে সরাসরি আমার কাছে মাল পাবে না। কোথা থেকে কী ভাবে পাবে, আগেই বলে দেব। যেভাবে বলব সেভাবে মাল যোগাড় করে যেখানে যাকে দিতে বলব দিয়ে আসবে। পাঁচটা দশে ইগটপুরীর ট্রেন পাবে। সেটা ধরলে সন্ধের পরই পৌঁছে যাবে। স্টেশনে নেমে সোজা পুব দিকের রাস্তা ধরে মাইলখানেক গেলে প্রকাণ্ড একখানা গথিক আর্কিটেকচারের বাড়ি পাবে। নাম আসমান মঞ্জিল। ভেতরে ঢুকতে হবে না। গেটের কাছে দেখবে একটা নেপালি দারোয়ান বসে আছে। তাকে শুধু বলবে, দাদার থেকে আসছি। বললেই সে তোমাকে চামড়ার একটা ছোট স্যুটকেস দেবে। সেটা নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে আসবে। ইগটপুরী থেকে বোম্বাইয়ের ট্রেন পাবে আটটায়। ভি. টি'তে পৌঁছুতে সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা। সেখান থেকে সোজা কোলাবা পয়েন্টে চলে যাবে। ঠিক এগারটা নাগাদ মাথায় লাল রঙের পাগড়ি বাঁধা কোনও শিখকে যদি দেখতে পাও আর তার কপালে যদি লম্বা কাটা দাগ থাকে, তার হাতে স্যুটকেসটা দিয়ে চলে আসবে।'

আসমান মঞ্জিল, নেপালি দারোয়ান, কোলাবা পয়েন্টর শিখ—সবাইকেই পেয়ে গেলাম। সমস্তই কি আগেভাগে যোগাযোগ করে ঠিক করে রাখে বিজলী? তারপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে পাঠায়?

আমার মনে হয়, মেয়েটা খড়ি পেতে গুনতে জানে। আর তাতেই ভূ-ভারতের তাবৎ খবর ধরা পড়ে। নইলে যেখানে গিয়ে আমি মাল আনব সে-জায়গাটা ট্রেন থেকে কত

দূরে, কতক্ষণ লাগবে সেখানে পৌঁছতে এবং কোলাবা পয়েন্টে কতটা সময় দাঁড়ালে একজন শিখ আসবে, এমন কি সেই শিখটির মাথায় যে লালা পাগড়ি আঁটা আর কপালে কাটা দাগ—এত সব নির্ভুল তথ্য সে কেমন করে জানতে পারে?

কিংবা ডাকিনী বিদ্যায় বুঝি সিদ্ধ হয়েছে বিজলী। পার্শি কলোনির ফ্ল্যাটে বসে কী মন্ত্র পড়ে সে-ই জানে। তারই অমোঘ আকর্ষণে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ায় গগল্স-পরা আগন্তুক আসে, কোলাবা পয়েন্টে লাল-পাগড়ি ফাটা-কপাল শিখ আসে।

নির্দেশমতো ইগটপুরী থেকে স্যুটকেস এনে শিখটিকে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে অদৃশ্য হয়ে গেয়েছে। আর আমিও পায়ে পায়ে খানিকটা দূরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে চলেছি। এত রাতে আর ট্রেন পাওয়া যাবে না। ট্যাক্সি নিয়েই খারে ফিরতে হবে। অবশ্য ট্যাক্সি ভাড়াটা আপাতত আমার পকেট থেকে গেলেও মাসান্তে মাইনের সঙ্গে টি. এ হিসেবে ওটা বিজলীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতায়াতে যা খরচ হয় সে-সব বিজলীর।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছবার আগেই হুড়মুড় করে একদল মারাঠি কনস্টেবল আর একজন পুলিশ অফিসার ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কনস্টেবলগুলো শ্বাপদের মতো বাতাসে কিসের যেন গন্ধ পেল। তারপর উন্মত্তের মতো এদিকে সেদিকে কী খুঁজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কিছু না পেয়ে অর্ধবৃত্তাকারে অফিসারের পাশে এসে দাঁড়াল। স্ট্যান্ডে ট্যাক্সি ছিল। আমি গিয়ে যে তার একটায় উঠে বসব, পারছি না। কেউ যেন পেরেক ঠুকে আমার পা দু'টো রাস্তায় আটকে দিয়েছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই। হঠাৎ একসময় পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আমার পর এসে পড়ল। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এসে অফিসার বললেন, 'আচ্ছা, আপনি খানে কতক্ষণ আছেন?'

হৃৎপিণ্ডটা ধক করে উঠল। আড়ষ্ট সুরে উত্তর দিলাম, 'আধ ঘণ্টা হবে।'

'এখানে কোনও শিখকে দেখেছেন? মাঝারি চেহারা, কপালে কাটা দাগ আছে।'

কিছুক্ষণ আগে যে-লোকটিকে স্যুটকেস হস্তান্তরিত করেছি অবিকল তার চেহারার র্ণনা দিয়েছেন পুলিশ অফিসার। আমার শ্বাস আটকে আসতে লাগল। যদি বলি শিখটাকে দখেছি, হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে। এমন কি থানাতেও টানাটানি পড়তে পারে। তা ড়া, শিখটার সঙ্গে কোনও অজানা বিপদ জুড়ে আছে কিনা, তা-ই বা কে বলবে। অতএব াত্মরক্ষার্থে যা শ্রেয় তা-ই করলাম। রুদ্ধস্বরে বললাম, 'না, তেমন কাউকে দেখিনি।'

চিন্তিত, হতাশ মুখে অফিসার বললেন, 'ভাল করে ভেবে দেখুন।'

আমার বুকের ভেতর এখন নিদারুণ দুর্যোগের মতো কিছু একটা চলছে। প্রাণপণে সেটা মিয়ে কাঁপা গলায় আস্তে আস্তে বললাম, 'কই, তেমন কাউকেই মনে পড়ছে না।'

পুলিশ অফিসার আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তাঁর সহচরদের নিয়ে ডান দিকে চলে লেন।

আতঙ্কগ্রস্তের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে জা চলে এলাম পার্শি কলোনিতে।

শুষ্ক, ভীত সুরে বিজলীকে কোলাবা পয়েন্টের ঘটনাটা বলে গেলাম। সব শুনে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বলল, 'পুলিশ এসেছিল!'

'হ্যাঁ।'

'পুলিশ অফিসার শিখের কথা জিজ্ঞেস করলে?'

'হ্যাঁ।'

'যে-শিখটাকে তুমি স্যুটকেস দিয়েছ তার কথাই যে জিজ্ঞেস করেছে তা বুঝলে কেমন করে? অন্য কোনও শিখকে হয়তো খুঁজতে বেরিয়েছিল। দৈবাৎ আমাদের শিখটিও সেখানে গিয়েছে। এ নিশ্চয়ই একটা কোয়েন্সিডেন্স।'

'উঁহু—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়াতে লাগলাম।

ভুরু বাঁকিয়ে শাণিত চোখে আমার দিকে তাকাল বিজলী। তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল, 'উঁহু মানে?'

'পুলিশ অফিসার তোমার ওই শিখটাকেই খুঁজতে এসেছিল। চেহারার যা ডেসক্রিপশান সে দিয়েছে তার সঙ্গে শিখটার পুরোপুরি মিল আছে। এমনকি কপালের কাটা দাগটার কথাও সে বলেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ।'

এরপর অতল চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল বিজলী। তার মসৃণ নিভাঁজ কপালে ধীরে ধীরে কতকগুলো গভীর রেখা ফুটে উঠল। মনে হল, কেউ যেন নিষ্ঠুর হাতে ছুরি বসিয়ে বসিয়ে দাগ কেটেছে। অনেকক্ষণ পর স্তব্ধতা ভেঙে সে বলল, 'পুলিশ যদি শিখটার খোঁজে এসে থাকে তাতে আমাদের অত দুশ্চিন্তা কেন? আমাদের কাজ শিখটাকে মাল ডেলিভারি দেওয়া। আমরা দিয়েছি। ব্যস, সম্পর্ক চুকে গিয়েছে। তাকে পুলিশে খুঁজুক, ধরুক—সে কথা ভেবে আমাদের রাতের ঘুমটাকে নষ্ট করি কেন? অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আজ আর তোমার খারে ফিরে দরকার নেই। এখানেই খেয়ে দেয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দাও।'

বিজলী যদিও সেদিন রাতে কোলবা পয়েন্টের সেই ঘটনাটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে তবু আমি নিশ্চন্ত হতে পারিনি। চাকরিটা নেবার পর থেকেই আমার স্বস্তি ছিল না। অজানা একটা ভয় চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল। চাবি-বন্ধ অ্যাটাচি কেস আর স্যুটকেস অচেনা কতকগুলো লোকের হাতে তুলে দিয়ে আসি। এই লোকগুলো কারা, এদের পরিচয় কী, কোথা থেকে আসে এবং অ্যাটাচি কেসে বা স্যুটকেসে কী থাকে—কিছুই বুঝতে পারি না। তবে এটুকু অনুভব করছি, কী এক ভয়াবহ জটিল আবর্তের মধ্যে অসহায়ের মতো ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি। আমার স্নায়ুগুলো অস্পষ্টভাবে কী যেন টের পেয়েছে। আর তারই ফলে ধনুকের ছিলার মতো সেগুলো টান টান হয়ে উঠেছে।

মধ্যরাতে শিখের হাতে স্যুটকেস দিয়ে আসার পর আর বারতিনেক 'মাল ডেলিভারি' দিতে গিয়েছি। একবার গিয়েছি মহালছমী রেসকোর্সের কাছে, একবার মালাবার হিলে,

ার শেষ বারে কল্যাণে। যেখানেই গিয়েছি, মাল বুঝিয়ে দেবার কিছুক্ষণ পরই পুলিশের আবির্ভাব ঘটেছে। কোলাবা পয়েন্টের মতো অবশ্য জেরার সম্মুখীন হতে হয়নি আমাকে।

অবশ্য শেষ বার কল্যাণে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে। বিজলীর কথামতো নির্দিষ্ট লোকটিকে মাল দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে পড়েছিল। যাকে মাল দিয়েছিলাম সে তখন মন্ত্রবলেই যেন উধাও হয়েছে। তখন কত আর রাত? আটটাও বাজেনি। মাল দিয়ে কল্যাণ স্টেশনের দিকে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছি, সেই সময় যথারীতি পুলিশের আবির্ভাব ঘটল। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার, কোলাবা পয়েন্টে যে-পুলিশ অফিসারকে দেখেছিলাম, এখানেও তাঁকেই দেখেছি। এবং দেখামাত্র অদৃশ্য শিকলে পা দু'টো আটকে গিয়েছে। না পেরেছি পিছোতে, না এগোতে।

পুলিশগুলো চারদিকে ছোটাছুটি করছিল। পুলিশ অফিসার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে াণিত চোখে কাকে যেন খুঁজছিল। আর খুঁজতে খুঁজতে তাঁর দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে গিয়েছিল। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এসে পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, স্ট্রেঞ্জ।' তাঁর স্বরে অদ্ভুত একটা ঝঙ্কার ছিল। সেটা বিস্ময়জনিত অথবা উত্তেজনার কারণে, ঠিক বুঝতে পারিনি।

বোঝার মতো অবস্থাও তখন নয়। কিছু একটা উত্তর হয়তো দিয়েছিলাম কিন্তু গলায় র ফোটে নি। পুলিশ অফিসার আবার বলেছিলেন, 'সেদিন রাতে কোলবা পয়েন্টে াপনাকে দেখেছিলাম না?'

আমি চুপ।

পুলিশ অফিসার থামেন নি, 'আশ্চর্য! কোলবা পয়েন্টে একজন ক্রিমিনালকে খুঁজতে য়ে আপনাকে দেখেছি। আজও একজন ক্রিমিনালকে খুঁজতে এসেছি। আজও আপনাকে খলাম।'

আমি একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছি। কোলাবা পয়েন্ট আর কল্যাণ—এই দু-জায়গার ঝখানে আছে মহালছমী রেসকোর্স এবং মালাবার হিল্‌সের এক পার্ক। সেই দু-য়গাতেও পুলিশের আবির্ভাব ঘটেছিল। অবশ্য এই অফিসারটি ছিলেন না।

পুলিশ অফিসার এবার বলেছিলেন, 'যাই হোক, ফেল্ট হ্যাট-পরা রোগা একটা পিদ্রুকে খানে দেখেছেন?'

শ্বাসনালির ভেতর বাতাসের স্রোতটা থমকে গিয়েছিল যেন। একটু আগে যে-লোকটির তে চামড়ার স্যুটকেস তুলে দিয়েছি তার বর্ণনাই দিয়েছেন পুলিশ অফিসার। কোনও াব না দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা কনকনে াত বয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই বলবেন, ফেল্ট হ্যাট-পরা নিও লোক দেখেননি। তাই না?' সমস্ত ভঙ্গিটার মধ্যেই নিষ্ঠুর একটা বিদ্রূপ ছিল তাঁর। কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু গলার ভেতর থেকে আধফোটা গোঙানির মতো

খানিকটা শব্দ বেরিয়ে এসেছিল মাত্র। পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, 'অনুগ্রহ করে আপনাকে আমার সঙ্গে একবার থানায় যেতে হবে।'

'থানায়!' আতঙ্কে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'সেখানে যেতে হবে কেন?'

'গেলেই বুঝতে পারবেন।' ভারী, মোটা গলায় পুলিশ অফিসার জানিয়েছিলেন।

একটু সচ্ছলতার জন্য বিজলীর চাকরিটা নিয়েছিলাম। কিন্তু পায়ে পায়ে এমন বিপদের ফাঁদ যে পাতা ছিল তা কি আগে ভাবতে পেরেছি! দিশেহারার মতো চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজছিলাম, এমন কেউ কি নেই যে আমাকে পুলিশের টানাহেঁচড়া থেকে বাঁচাতে পারে? আর তাকাতে তাকাতে হঠাৎ রতীশ হালদারকে পেয়ে গিয়েছিলাম।

লোকটাকে সেদিন দৈব-প্রেরিতই মনে হয়েছিল। চিরদিন যাকে এড়াতে চেয়েছি, যার হাতে ধরা পড়ার ভয়ে চুপিসারে পার্শি কলোনিতে গিয়েছি সেই রতীশ হালদারকে কল্যাণ স্টেশনে পরম বান্ধব বলে মনে হয়েছিল। সবটুকু শক্তি গলায় ঢেলে দিয়ে ডেকেছিলাম 'রতীশবাবু—'

ডাকটা কানে যেতেই রতীশ ছুটে এসেছিল। সবিস্ময়ে বলেছিল, 'কী ব্যাপার দাদা আপনি এখানে!'

আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম, 'একটা দরকারে এদিকে এসেছিলাম। দেখুন দিকি পুলিশ আমাকে শুধু শুধু থানায় ধরে নিয়ে যেতে চাইছে।'

রতীশ হালদার এরপর এক কাণ্ডই করে বসেছিল। পুলিশ অফিসারের দিকে রুখে গিয়ে বলেছিল, 'আপনারা ভেবেছেন কী? পুলিশ বলে যা-খুশি তা-ই করবেন? কে ভদ্রলোককে অকারণে হ্যারাস করছেন?'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার গর্জে উঠেছিলেন, 'কারণে কি অকারণে সে কৈফিয়ত আপনাকে দিতে হবে নাকি? ডোন্ট ইন্টারফেয়ার।'

'ডেফিনিটলি আমি ইন্টারফেয়ার করব।' পুলিশ অফিসারের মুখের সামনে বিচিত্র মুদ্রায় হাত ঘুরিয়ে রতীশ চিৎকার করে উঠেছিল, 'ফর নাথিং একজন ভদ্রলোককে পুলিশ টানাটানি করবে, এ আমি সহ্য করব না।'

আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রতীশ কি উন্মাদ হয়ে গেল? আমার জন্য যেচে বিপদ ডেকে আনছে সে।

পুলিশ অফিসার তীব্র চাপা গলায় বলেছিলেন, 'বটে! বেশ, মজা দেখাচ্ছি। একবার থানায় চালান দিলে কত ধানে কত চাল টের পেয়ে যাবে।'

'বেশ তা-ই দিন।' রতীশ বিন্দুমাত্র দমে নি। বরং বিশগুণ উদ্ধত হয়ে উঠেছিল, 'পুলিশ কমিশনারের কাছে গিয়ে বলব, ভদ্রলোককে বিনা কারণে উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে।'

'পুলিশ কমিশনার তো আপনার বোনাই।' নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে অফিসার বলেছিলেন, 'আপনার সব কথা শুনে তাঁর প্রাণ তর হয়ে যাবে। গারদখানার তালা খুলে একেবারে কোলে তুলে আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবেন। নাউ গেট রেডি ফর অ্যারেস্ট।'

পুলিশ অফিসার যা বলেছিলেন তা-ই করেছিলেন। অবশ্য সাধারণ কোনও থানায় ন

একেবারে বোম্বাই পুলিশের হেড কোয়ার্টার্সে আমাকে এবং রতীশকে চালান করে দিয়েছিলেন।

ভেবেছিলাম পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে এসে ভেঙে পড়বে রতীশ। কিন্তু আশ্চর্য অটুট তার মনোবল। সে এতটুকু ঘাবড়ায় নি। উপরন্তু আমাকে বার বার সাহস যুগিয়েছে।

হেড কোয়ার্টার্সে এসে রতীশ যা করেছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই চমকপ্রদ। ঢুকেই সে হইচই শুরু করে দিয়েছিল। সেই চিৎকারের উদ্দেশ্য, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করা।

ধমক-শাসানি, কোনও কিছুতেই রতীশকে নিরস্ত করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশ অফিসাররা তাকে কমিশনারের কামরায় নিয়ে গিয়েছিল। আর আমি? ভয়ে জড়সড় হয়ে একটি ঘরে কনস্টেবলদের হেফাজতে বসে ছিলাম। ভয়ার্ত। আতঙ্কগ্রস্ত। মনে হচ্ছিল শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই হেড কোয়ার্টার্সের সুবিশাল বাড়িটা কাঁপাতে কাঁপাতে ফিরে এসেছিল রতীশ। আর এসেই জয়ধ্বনি করে উঠেছিল, 'চলুন দাদা, আমরা মুক্ত। কমিশনার সাহেবের সামনে অফিসারটার মুখ ভোঁতা করে দিলাম। বললাম কীভাবে আমাদের নিয়ে ঝামেলা করা হয়েছে। সব শুনে তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন। বার বার ক্ষমা চেয়ে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন।'

দুরন্ত গতিতে আমার সাহস ফিরে এসেছিল। মুখে কিছু বলতে পারিনি। কৃতজ্ঞতায় গলা বুজে গিয়েছিল শুধু। দুই হাতে রতীশকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আর সেই ধরাটার মধ্যেই আমার সব বলা হয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে বার বার আমার মনে হয়েছিল, রতীশকে এতকাল যেভাবে দেখেছি এবার তার বিপরীত দিক থেকে দেখতে হবে।

পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে রাস্তায় বেরিয়ে রতীশ এবং আমি নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। অনেকক্ষণ চলার পর রতীশ ডাকল, 'আচ্ছা দাদা—'

'কী?' অন্যমনস্কের মতো সাড়া দিলাম।

'আপনি তো কাজ করেন বোম্বাইতে। থাকেন খারে। তা অতদূর কল্যাণে গিয়েছিলেন কেন?' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে রতীশ প্রশ্ন করেছিল।

মাত্র মাসকয়েক রতীশের সঙ্গে আমার আলাপ। তার এমন কণ্ঠস্বর আগে আর কখনও শুনিনি। মুখের চেহারাটাও কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছিল। চমকে উঠে বলেছিলাম, 'মানে, একটু কাজে এসেছিলাম—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়নি রতীশ। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'একটা কথা বলব দাদা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন—'

পাশ থেকে নয়, মনে হল, অনেক—অনেক দূর থেকে নিস্পৃহ, অচেনা সুরে রতীশ বলে যাচ্ছিল, 'আমাদের সবারই বোধহয় সৎভাবে চলা উচিত। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যে খুদকুঁড়োটুকু মেলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। লোভের বশে অসৎ পথে পা বাড়ালে

একদিন রাজাবাদশা হয়তো হওয়া যায় কিন্তু তার মধ্যে গৌরব নেই। তা ছাড়া অন্য বিপদও থাকতে পারে।'

কী বলতে চেয়েছে রতীশ? কী কারণে কল্যাণে গিয়েছিলাম, তার কিছু আভাস কি সে পেয়েছিল? আমার সমস্ত অস্তিত্ব চকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে রতীশকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি।

ষোল

সেদিন পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়েই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, বিজলীর চাকরি আর করব না। আমার বয়স এখন চল্লিশের সীমান্তে। আয়ুর দুই-তৃতীয়াংশ প্রায় কাটিয়ে দিয়েছি। ছেলেবেলা এবং কৈশোরের প্রথম কয়েকটি বছর বাদ দিলে জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। সচ্ছলতা বা আরাম কাকে বলে, যৌবনের শুরু থেকে কোনওদিন তা জানিনি। চাকরি জীবনে ঢুকে উদয়াস্ত পরিশ্রমের মূল্যে মাসের শেষে যা রোজগার করেছি তাতে কোনোরকমে টিকে থাকা যায় মাত্র। অফুরন্ত ভোগের মেলা সাজিয়ে যে পৃথিবী অদূরে মোহিনী সেজে বসে আছে, হাত বাড়িয়ে তা কখনও স্পর্শ করতে পারিনি। সেটা আমার নাগালের বাইরেই থেকে গিয়েছে।

বিজলীর চাকরিটা পেতেই দিনকয়েকের হঠাৎ-নবাব বনেছিলাম। কে জানত, এই সচ্ছলতা আমার কপালে অনভ্যাসের ফোঁটা হয়ে দাঁড়াবে। কে জানত, আমার দিনরাতের শান্তি-স্বস্তি-আনন্দ-বিশ্রাম-ঘুম, সমস্ত কিছু বিজলীর কাছে সঁপে দিয়ে মাসের শেষে হাজার টাকার সচ্ছলতা কিনতে হবে!

মানুষ হিসেবে মানসিক শান্তিকে আমি সুখের ওপরে জায়গা দিয়ে থাকি। যেখানে অশান্তি অস্বস্তি উদ্বেগ, আমি তার কয়েক হাজার মাইল দূর দিয়ে হাঁটতে চাই। কোনও সর্বশক্তিমান যদি আমার সামনে এসে বলে, 'সসাগরা পৃথিবী তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। তার বদলে তোমার দিনের আনন্দ আর রাতের ঘুম আমাকে দিতে হবে—' আমি তৎক্ষণাৎ তাকে ফিরিয়ে দেব।

যাই হোক, আমার চারপাশ ঘিরে অস্বস্তির কাঁটা ছড়ানো রয়েছে। যেদিকেই ফিরি সেগুলো খচখচিয়ে বিঁধছে। নিয়ত এক দুর্ভাবনা আর তীব্র আতঙ্ক সর্বক্ষণ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। আমার চলা-ফেরা-ওঠা-বসা আর রাতের ঘুম, সমস্তই এখন কণ্টকিত।

এতকাল দারিদ্র হয়তো ছিল কিন্তু অস্বস্তি বা দুশ্চিন্তার ছায়ামাত্র ছিল না। জীবনের চল্লিশটা বছর যদি বিলাস এবং ভোগের বাইরে থেকে কাটিয়ে দিতে পারি, বাকি অংশটাও সেই একইভাবে একই খাতে বয়ে যাবে। কিন্তু হাজার টাকার সুখের বিনিময়ে আমার শান্তিকে এমন বিঘ্নিত করে তুলতে পারব না। সুতরাং স্থির করে ফেলেছি, বিজলীর চাকরি আর করব না।

কল্যাণ স্টেশন থেকে যেদিন পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার দিন দুই পর বিজলীর ফ্ল্যাটে গিয়ে আমার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিলাম।

শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে গেল বিজলী। তারপর খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, 'কিন্তু কেন? কেন তুমি কাজটা ছাড়বে?'

কারণটা আরেকটু হলে বলেই ফেলতাম। পরক্ষণেই ভাবলাম, সেটা বলতে গেলে হাজার জেরার মুখে গিয়ে পড়তে হবে। তার চেয়ে সব চাইতে নির্ঝঞ্ঝাট এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরটা শ্রেয় মনে করলাম। বললাম, 'এমনি।'

'এমনি মানে!'

'এমনি মানে, এমনি।'

'উঁহু—' নিষ্পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বিজলী বলল, 'ওই অজুহাতে চাকরি ছাড়া যায় না। অন্তত আমার চাকরি। আমি কি তোমাকে খাটিয়ে ঠিকমতো মাইনে দিচ্ছি না?'

ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'ছি ছি, সে কি! মাস কাবার হতে না-হতেই মাইনে পেয়ে যাচ্ছি।'

'তা হলে টাকা পয়সার ব্যাপারে তোমার কোনো অভিযোগ নেই?'

'না।'

'আমি কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি?'

'কক্ষনো না।'

'তোমাকে কি আমার কাজে খুব বেশি খাটতে হয়?'

'কে বললে বেশি খাটতে হয়? সপ্তাহে দু-তিন দিন মোটে কাজ। একরকম বসিয়ে বসিয়েই তো মাইনে দিচ্ছ।'

আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে ঈষৎ উত্তেজিত সুরে বিজলী এবার বলল, 'কোনও ব্যাপারেই যখন অভিযোগ নেই তখন কেন চাকরিটা ছাড়বে?'

আমি থতমত খেয়ে গেলাম, 'না—মানে—'

'মানে মানে করলে চলবে না।' শাণিত গলায় বিজলী চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন চাকরি ছাড়তে যাচ্ছ, স্পষ্ট করে তা আমাকে জানাতে হবে।'

বুঝলাম, চাকরি ছাড়ার সঙ্গত একটা কারণ না জানা পর্যন্ত বিজলী আমাকে ছাড়বে না। খানিকটা ইতস্তত করে বললাম, 'আমার শরীরটা ক'দিন ধরে ভাল যাচ্ছে না—'

আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই বিজলী বলে উঠল, 'শরীর খারাপ যখন, দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে নাও।'

'কোনও কিন্তু না। এক সপ্তাহ তোমাকে ছুটি দিচ্ছি। আফিস থেকেও ছুটি নিয়ে নাও। এখন পুরো রেস্ট। ইচ্ছে হলে আমার ফ্ল্যাটে এসেও থাকতে পার।'

'দেখ, ছুটি টুটির ব্যাপার নয়—'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বিজলী। মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাকে এক্ষুনি একবার বেরোতে হবে। তার আগে আমার শেষ কথাটা শুনে নাও। পুরো সাত দিন তোমার ছুটি। এর মধ্যে ভাল একজন ডাক্তার দেখাবে। ওষুধ-পত্তর, ডাক্তারের ফী—যা যা খরচ লাগে একটা বিল করে দিও। আমি দিয়ে দেব। মনে রেখ, সাতদিন পর আবার কাজে জয়েন করতে হবে।' আমাকে বলার কিছু অবকাশ না দিয়ে নিজের বেডরুমে গিয়ে ঢুকল সে।

যদিও বিজলী তার ফ্ল্যাটে থাকতে বলেছিল, আমি যাইনি। এবং অফিস থেকে ছুটিও নিইনি। শরীর খারাপটা ছিল নিতান্তই একটা মিথ্যে ওজর। খারের হট্টমন্দিরে থেকেই যথারীতি অফিস করে যাচ্ছি, সুধাংশুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি আর সস্তার হোটেলে খেয়ে আসছি। অর্থাৎ বোম্বাই শহরে বিজলীকে দেখার আগে যে জীবনের কক্ষপথে অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আবার সেখানেই ফিরে গিয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ভাবনা থেকে খানিকটা মুক্তি পেয়ে যেন বেঁচে যাচ্ছি।

সাতদিন আমাকে ছুটি দিয়েছিল বিজলী। তারপরও তিনটে দিন পার্শি কলোনির দিকে পা বাড়ালাম না। কিন্তু যা অবধারিত তা-ই ঘটে গেল। একদিন সকালে অফিসে বেরোতে যাব, ঠিক সেই সময় বিজলী হানা দিল। সুধাংশুরা যে যার কাজে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। বিজলীকে দেখে আমার বুকে শ্বাস আটকে আসছিল যেন। তাকে বসিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকালাম।

বিজলী বলল, 'কি ব্যাপার, সাত দিন ছুটি দিয়েছিলাম। তারপরও তিনটে দিন পার হয়ে গেল। রোজ ভাবি তুমি যাবে। যাচ্ছ না যে?'

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কোনও রকমে বললাম, 'মানে—'

'কী?'

'শরীরটা এখনও ঠিক হয় নি। তাই—'

'ডাক্তার দেখিয়েছিলে?'

'না। ভাবছিলাম শুধু শুধু ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে। দু'টো দিন বিশ্রাম নিলেই—'

বাধা দিয়ে বিজলী বলে উঠল, 'আমি কিন্তু ওষুধ পত্তরের সব খরচই দিতে চেয়েছিলাম। সে-কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?'

উত্তর দিলাম না। নতচোখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটুক্ষণ কী ভেবে বিজলী আবার বলল, 'ডাক্তার যে দেখাওনি, সে তো শুনলাম। সাতদিন ছুটি নিয়েছিলে, এক মিনিটও বিশ্রাম করেছ?'

হকচকিয়ে গেলাম। চকিতে মুখ তুলে জড়িত গলায় বললাম, 'হ্যাঁ—মানে, এই আর কি—'

তক্ষুনি কিছু বলল না বিজলী। একটু চুপ করে থেকে একসময় সুরহীন, নীরস গলায় আরম্ভ করল, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?'

সভয়ে বললাম, 'কী বলবে?'

'আমার কাছ থেকে শরীর খারাপের নাম করে তো সাত দিনের ছুটি নিয়ে এলে। ওদিকে অফিসে একটা দিনও তো কামাই করো নি। এ লুকোচুরির মানে আমি বুঝতে পারছি না।'

বিজলী কি অন্তর্যামী? না গুপ্তচর লাগিয়ে আমার গতিবিধির ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছে? বিমূঢ়ের মতো শিথিল সুরে কী উত্তর দিলাম, নিজের কাছেই তা বোধগম্য হল না।

বিজলী আবার বলল, 'মনে হচ্ছে আমার কাজ তুমি আর করতে চাও না, তাই তো?'

আমার লুকোচুরিটা ধরা পড়ায় অপরিসীম লজ্জা পেলাম। চোখ তুলে বিজলীর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তাকে জানালাম, সারা দিন অফিস করে অন্য কোনও কাজ করা আপাতত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিজলী যেন আমাকে ক্ষমা করে।

শুনে বিজলী একেবারে খেপে উঠল, 'সম্ভব যদি না হয় তা হলে কাজটা নিয়েছিলে কেন?'

মুখ না তুলে কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'যখন নিয়েছিলাম তখন কি জানতাম আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এক কাজ কর বিজলী—'

'কী?'

'সভয়ে বলব, না নির্ভয়ে?'

'ভণিতা রেখে যা বলবার বলে ফেল।' বিজলীর চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে তীব্র বিরক্তির আভাস।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমার জায়গায় তুমি অন্য লোক রাখো।'

'আমি কী করব না-করব সে পরামর্শ তোমার কাছ থেকে নেবার প্রয়োজন নেই। কাজ করতে করতে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া, এর কোনও মানে হয়? যদি কারণ থাকত, তবু না হয় বুঝতাম। এ শুধু আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।' অসন্তুষ্ট রাগত স্বরে বলতে বলতে কিছুক্ষণ থামল বিজলী। একটু কী চিন্তা করে ফের শুরু করল, 'লোক রাখতে তো বললে। চট করে একজন বিশ্বাসী লোক পাওয়া এত সোজা?'

এতক্ষণে বুঝলাম, আমাকে চাকরিতে ধরে রাখার জন্য বিজলীর এত পীড়াপীড়ি, এত অনুরোধ কেন? সে কিসের ব্যবসা করে, জানি না। তবে এর জন্য গোপনীয়তা এবং বিশ্বাস যে একান্ত প্রয়োজন, সেটা অনুভব করেছি। যে-কারণেই হোক, আমার প্রতি বিজলীর বিশ্বাস আছে। আমি যে সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করব না সে ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। নতুন লোক রাখলে, সে কেমন হবে, ব্যবসার গোপনীয়তা রাখবে কি রাখবে না, তার প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করবে কি না, এ-সব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়া

অস্বাভাবিক নয়। বললাম, 'কাজটা ছেড়ে দিচ্ছি বলে তোমার খুব অসুবিধে হল। সে-জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু একটা কথা যদি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ, আমার ওপর তোমার রাগ থাকবে না।'

'কী কথা?'

'তোমার কাজটা যদি আমি করিও, ক'দিন আর করতে পারব? বড় জোর মাস ছয়েক। তারপর তো নতুন লোক তোমাকে রাখতেই হবে।'

'মাস ছয়েক করতে পারবে কেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল বিজলী।

বললাম, 'তুমি তো জানো, রাজস্থানের একটা তামার খনিতে আমি কাজ করি।'

ঘাড় নেড়ে বিজলী জানাল, সে-তথ্য তার জানা।

বলতে লাগলাম, 'আমার খনিটার হেড আপিস বোম্বাইতে। তিন বছরের মেয়াদে আমি এখানে বদলি হয়ে এসেছিলাম। তার ভেতর আড়াই বছরের মতো কেটে গিয়েছে। আর মাত্র ক'টা মাস আমি বোম্বাইতে থাকতে পারব। তারপর রাজস্থানে ফিরে যেতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না বিজলী। কিছুক্ষণ কি এক আত্মমগ্নতার মধ্যে ডুবে রইল। একসময় অনেকখানি উৎসাহ নিয়ে বলল, 'রাজস্থানে যাবে তো কয়েক মাস পরে। যদ্দিন না যাচ্ছ, কাজটা চালিয়ে দাও। আমি এর মধ্যে নতুন লোক খুঁজতে থাকি।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'কী না?'

'আমাকে তুমি ক্ষমা কর বিজলী। ও-কাজটা আমি আর করব না ঠিক করে ফেলেছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আহত সুরে বিজলী বলল, 'ক্ষমার কি আছে? কাজ করা না-করা তোমার ইচ্ছে। আমার কাছে তোমার কি এমন বাধ্যবাধকতা?'

বুঝলাম খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে বিজলী। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'দেখ, মাস গেলে হাজার টাকা বাড়তি আয়, মানে আমার মতো লোকের পক্ষে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। সে-লোভ ত্যাগ করা যে কতটা কষ্টকর, বোঝাতে পারব না। সত্যি বলছি, কাজটা করা যদি সম্ভব হত, নিশ্চয়ই করতাম। বার বার তোমার মুখের ওপর 'না' বলতাম না।'

দুই চোখের পলকহীন দৃষ্টি আমার মুখে স্থাপিত করে বিজলী বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'কাজ ছাড়ার কথাটাই বার বার বলছ। সঠিক কারণটা এখনও জানাওনি। সেটা জানতে পারলে অন্তত বুঝতে পারতাম আমার কী অপরাধটা হয়েছে। আর সেই জন্যে তুমি কাজ ছাড়ছ।'

'কী আশ্চর্য।' কুণ্ঠিত মুখে বলতে লাগলাম, 'সেদিনও অপরাধের কথা বলেছ। বার বার ও-কথা বলে আমাকে লজ্জা দাও কেন?' একটু থেমে বললাম, 'কাজটা ছাড়ছি আমি অন্য কারণে।'

'কী কারণে?' আমার মুখের ওপর থেকে চোখ সরাল না বিজলী।

বুঝেছি বিজলী সহজে আমাকে ছাড়বে না। যতক্ষণ সন্তোষজনক একটা হেতু তার সামনে খাড়া করতে না পারছি, আমার মুক্তি নেই। সোজাসুজি বলেই ফেললাম, 'ভয়ে।'

বিজলীর ব্যবসাটা কিসের, দু-তিন মাস চাকরির পরও জানতে পারিনি। তবে এর সঙ্গে পুলিশের গন্ধ যখন জড়িত তখন ব্যাপারটা যে সহজ স্বাভাবিক নয়, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। যদিও চাকরি নেবার সময় বিজলী আমাকে জানিয়েছিল ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য লুকিয়ে চুরিয়ে মাল ডেলিভারির ব্যবস্থা করেছে, তবু এই দু-তিন মাসে আমার মনে হয়েছে, এই ব্যাখ্যাটা ঠিক নয়। নেপথ্যে আরও কিছু জটিল অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে। আচ্ছা, বিজলী কি নিষিদ্ধ কোনও জিনিসের কারবার করে থাকে?

মনে পড়ল, যেখানে যেখানে মাল ডেলিভারি দিতে গিয়েছি প্রায় সব জায়গাতেই পুলিশের আবির্ভাব ঘটেছে। একবার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স পর্যন্ত আমাকে যেতে হয়েছিল। কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। প্রথম বার আলতোভাবেই ছুঁয়ে গিয়েছে বাঘে। রতীশ হালদার সেদিন না বাঁচালে কী যে হত, ভাবতে ভরসা পাই না। পরের বার যাতে একেবারে বাঘের থাবার মধ্যে চলে না যাই সে-জন্য মাসে মাসে হাজার টাকার ক্ষতি মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পুলিশের কথাটা বিজলীকে জানাব কী? তাকে সতর্ক করে দেওয়া বোধহয় উচিত। পরক্ষণেই মনে হল, পুলিশের কথা সে কি আর জানে না? অশ্রান্ত বর্ষা মাথায় নিয়ে বিজলী খারের এই এজমালি বিবরে এসেছিল। সেদিন তার চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর পুলিশ হানা দিয়েছে। সে-কথা জানাতে বিজলী বলেছিল, তার জন্য নয়, অন্য কারও খোঁজে পুলিশের আবির্ভাব ঘটেছে। বিজলীর উত্তর আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। পুলিশ যে তারই সন্ধানে এসেছিল, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। আমার বিশ্বাস, বিজলীও সে-ব্যাপারে পুরোমাত্রায় সচেতন। নিজের জীবনকে নিয়ে কী প্রাণান্তকর ভয়াবহ খেলায় যে সে মেতেছে, কে বলবে।

পুলিশের প্রসঙ্গ তুলব কি তুলব-না, এই দুইয়ের মাঝখানে যখন আমার মন দুলছে ঠিক সেই সময় বিজলী বলে উঠল, 'ভয়ে কাজটা ছেড়ে দিচ্ছ?'

আধফোটা গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না বিজলী। পলকহীন আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমিও বিজলীর দিকে তাকিয়ে আছি। তার মাথায় কী চিন্তা ঘুরছে, বলতে পারব না। ভেতরের কোনও প্রতিক্রিয়া বাইরে ফুটে বেরোয়নি। মুখটা শান্ত, গম্ভীর। আবার ভাবলাম, পুলিশের কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে তাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দেব কি? দেওয়াই তো উচিত। হাজার হোক, সে আমার দেশের মেয়ে। তার যদি—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই বিজলী ডেকে উঠল, 'ললিতদা—'

'বল।' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম।

'তা হলে তুমি কাজটা সত্যিই করবে না?'

'হ্যাঁ।'

'এই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজলী বলল, 'বেশ। তোমার যখন অনিচ্ছা তখন আর জোর করব না। তবে—'

'কী?'

'আগে বল আমার কথা রাখবে—'

'তুমি কী বলবে সেটা না জেনে আগে থেকে কেমন করে বলব? শেষ পর্যন্ত তোমার কথা রাখা যদি আমার সাধ্যে না কুলোয়?'

বিজলী ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'তুমি আমাকে কী ভাব বল দেখি ললিতদা!'

বিজলীর বলার ভঙ্গিতে অনুযোগ ছিল। বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'কী ভাবব?'

'নিশ্চয়ই তুমি ভাব, আমি খুব অবিবেচক। এমন অনুরোধ করব যাতে তুমি অসুবিধেয় পড়বে, তাই না?'

'না—মানে—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বিজলী বলল, 'থাক, আর মানে মানে করতে হবে না।'

বিজলী যে ক্ষুব্ধ হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। মনে মনে খানিকটা অস্বস্তিই বোধ করলাম। সে তো চাকরির ফাঁদ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেই। তার একটা কথা যদি রাখি, ক্ষতি কী। সে তো বলেছে, এমন অসঙ্গত অনুরোধ করবে না যাতে আমি বিপন্ন হতে পারি। বললাম, 'বল তোমার কী কথা রাখতে হবে—'

'থাক, দরকার নেই।' বিজলী অন্য দিকে মুখ ফেরাল। তার ঠোঁট দু'টো স্ফুরিত হল। গলার স্বর কাঁপা এবং গাঢ় শোনাল।

ঠোঁটের এবং স্বরের কম্পনে কতখানি চাতুর্য মেশানো, বলতে পারব না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি, স্ত্রীলোক যে পর্যায়েই পৌঁছক না, তার ভেতরে চিরকালের একটি অভিমানিনী বালিকা যেন থেকেই যায়। বয়স, গাম্ভীর্য, সামাজিক মর্যাদা আর প্রতিষ্ঠার তলায় সে হয়তো জড়সড় মূক হয়ে থাকে, কিন্তু একটুতেই সব আবরণ সরিয়ে সে বেরিয়ে আসে।

আমি হেসে ফেললাম, 'আর রাগ করতে হবে না। বলেই ফেল তোমার শেষ অনুরোধটা কী।'

আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল বিজলী। বলল, 'অফিস থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে তোমাকে একবার আসানসোল যেতে হবে।'

'আসানসোলে, মানে বাংলাদেশে?' একই সঙ্গে বিস্ময় এবং চমক খেলে গেল আমার গলায়।

'হ্যাঁ।'

'সেখানে কেন?'

বিজলী বলল, 'তুমি তো দুম করে আমার কাজটা ছেড়ে দিলে। আমি যে কী বিপদে পড়লাম, সেদিকে তোমার খেয়াল নেই। ওদিকে আসানসোলে জরুরি একটা সাপ্লাইয়ের ব্যাপার আছে। অথচ বিশ্বাসী এমন কাউকে পাচ্ছি না যাকে এত টাকার মাল দিয়ে পাঠাতে পারি। আমার এই দায়টা শুধু উদ্ধার করে দাও ললিতদা। এই শেষ কথাটা রাখ।'

একটু আগে যে ফাঁদটা থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম আবার কৌশলে তারই মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছে নাকি বিজলী? বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসতে লাগল। কিন্তু তাকে কথা দিয়ে ফেলেছি। এখন সে-কথা ফেরাই কী করে? চক্ষুলজ্জা বলে কিছু তো আছে। আড়ষ্ট নীরস সুরে বললাম, 'আসানসোলে কবে যেতে হবে?'

'যত তাড়াতাড়ি হয়।'

'ঠিক আছে, কালই অফিসে ছুটির একটা দরখাস্ত করে দেব। তবে একটা কথা।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল বিজলী, 'কী?'

খুব জোর দিয়ে বললাম, 'এই কিন্তু শেষ। এরপর এ-সব ব্যাপারে আমাকে আর পাবে না।'

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। এই শেষ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

এরপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ফের সেই ভাবনাটা আমার মস্তিষ্কে খোঁচা দিতে লাগল। পুলিশের কথা বলে সাবধান করে দেব নাকি বিজলীকে?

এবারও কিন্তু বলা হল না। তার আগেই বিজলী ডেকে উঠল, 'ললিতদা—'

চকিত হয়ে উঠলাম। একটু আগে সে যেভাবে কথা বলছিল, তার সঙ্গে এখনকার এই কণ্ঠস্বরের বিন্দুমাত্র মিল নেই। মনে হল, বুকের ভেতরকার অগণিত স্তর ঠেলে কোন পাতাল থেকে স্বরটা উঠে এল। দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকালাম। বললাম, 'কী বলছ বিজু?'

'বলছিলাম—' বলেই চুপ করে গেল বিজলী।

তার দিকে খানিকটা ঝুঁকে বললাম, 'থামলে কেন? বল—'

তবুও চুপ করে রইল বিজলী। অনেকক্ষণ পর দূরমনস্কের মতো বলে উঠল, 'তুমি তো আসানসোলে যাচ্ছই।'

'হ্যাঁ।'

'তা আরেকটু কষ্ট করবে?'

বিজলী কী চায়, বুঝতে না পেরে আমি তাকিয়েই থাকি।

বিজলী বলতে লাগল, 'আসানসোল গিয়েই কিন্তু ফিরে এস না। সময় করে একবার তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে।'

এবার বললাম, 'এতকাল পর বাংলাদেশে ফিরছি, কলকাতায় একবার তো যাবই।'

'তা হলে—তা হলে—'

'তা হলে কী?'

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ বিজলী করল কি, দুই চোখ আধবোজা করে নিঃশব্দে হেসে উঠল। হাসিটা তার চোখ থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণ যে-সুরে আলাপটা চলছিল আচমকা তার গায়ে ভিন ভাবের রং লেগে গেল। হাসতে হাসতেই সে বলল, 'কলকাতায় তো যাচ্ছ, তা সেখানে একজনের খোঁজ নেবে নাকি?'

'কার খোঁজ নেব?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

'কার?' বলেই ভ্রূদু'টি বাঁকিয়ে পুরোপুরি চোখ মেলে তাকায় বিজলী। চোখের তারায় কৌতুক বিচ্ছুরিত হতে লাগল। স্বরটাকে টেনে টেনে সে বলতে লাগল, 'সেই যে গো দাদা, সেই—সে-ই লোকটা যার নাম—'

'কী নাম?'

'আহা, জানো না যেন।'

কিছুটা বিরক্তই বোধ করলাম এবার। বললাম, 'কত লোকেরই তো নাম জানি। কিন্তু তুমি কার কথা বলছ, কী করে বুঝব? খড়ি পেতে অন্যের মনের কথা বুঝবার বিদ্যে আমার নেই।'

আমার বিরক্তি অস্পষ্ট ছিল না। তা কিন্তু গ্রাহ্য করল না বিজলী। বলল, 'ধীরেশ গো, ধীরেশ। শিশির বাসুর ছেলে ধীরেশ বাসুর কথা বলছি। যে আমাকে—'

চমকে উঠলাম। স্নায়ুর গহন কেন্দ্রে নিদারুণ দোলা লাগল। এই মুহূর্তে ধীরেশের কথা আমার খেয়াল ছিল না। অথচ বিজলীকে দেখার পর থেকেই তার কথা কতবার ভেবেছি। আমার চেতনা আর অবচেতনার সকল দিগন্তে বার বার তার ছায়া পড়েছে।

আরব সাগরের এই কূলে বিজলী যে উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের মাঝখানে এসে পড়েছে তার জন্য ষোল আনা দায়ী ধীরেশ। শুশুরিয়ার মঠগামিনী মেয়েটিকে হাত ধরে উর্ধ্বশ্বাসে এই জীবনের সদর দরজায় সামনে সে-ই দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বিজলীকে দেখার পর বার বার আমার জানতে ইচ্ছে হত, তার এই জীবনটার প্রথম মন্ত্রগুরু এখন কোথায় আছে? কী করছে?

আশ্চর্য, বাংলাদেশে যাবার কথা শুনেও ধীরেশের কথা কেন যে আমার মনে পড়েনি, কে বলবে। বিজলী কিন্তু তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তবে কি বিজলীর প্রাণের অতলে—

বিজলী হঠাৎ কেন ধীরেশের কথা বলল তা নিয়ে আমার অপার কৌতূহল, কিন্তু তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলাম না। শুধু গভীর গলায় বললাম, 'নিশ্চয়ই। কলকাতায় গিয়ে ধীরেশের খোঁজ করব বৈকি।'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল বিজলী। চোখ গোলাকার করে, গালে একটি হাত রেখে, ঘাড় অনেকখানি বাঁকিয়ে সকৌতুক উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠল, 'ও মা, ধীরেশের নামে তোমার মুখ-চোখ-গলার স্বর, সব বদলে গিয়েছে যে গো। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ, দেখছি।'

কৌতুকের সুরেই ধীরেশের প্রসঙ্গ তুলেছিল বিজলী। গম্ভীর মুখে বললাম, 'ধীরেশের ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস নয় কি?'

দুই হাত নেড়ে আর শ্যাম্পু-করা চুল প্রবল বেগে ঝাঁকিয়ে আদুরে বালিকার মতো বিজলী একটানা বলে যেতে লাগল, 'না-না-না—'

'কী না?'

'ধীরেশের কথা এমনিই তোমায় বলেছিলাম। তার খোঁজ করতে হবে না।'

আমি চুপ।

বিজলী আবার বলে উঠল, 'কী হবে তাকে খুঁজে? আমার জীবনে অনেকদিন আগেই তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।'

এবারও আমি নিরুত্তর। বিজলীর জীবনে ধীরেশের ভূমিকা হয়তো শেষ হয়েছে। ধীরেশকে হয়তো তার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার জন্য আমার আগ্রহ অপরিসীম।

বিজলী বলতে লাগল, 'সে যেখানে আছে সেখানেই থাক। আর আমি যেখানে এসে ঠেকেছি, সেখানেই থাকি।'

এবারও কিছু বললাম না। ধীরেশের ব্যাপারে কী করব আর কী না-করব, মনে মনে স্থির করে ফেলেছি. কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। কৌতুকের বশে ধীরেশকে খোঁজার কথা বলে আবার বারণ করল কেন বিজলী? সঙ্কোচে, লজ্জায় অথবা অন্য কোনো কারণে? ধীরেশের জন্য তার প্রাণের কোথাও এতটুকু কৌতূহল কি অবশিষ্ট নেই?

অথচ অন্য একদিন বিজলী আমাকে বলেছিল, ধীরেশ কোথায় কীভাবে আছে তার জানতে ইচ্ছা করে। জানবার যখন একটা সুযোগ এসেছে তখন সে 'না' বলছে। বিজলীর প্রাণে কখন কোন খেলা চলে, তার তল পাওয়া ভার।

সতের

অফিসে মাস দেড়েকের মতো ছুটি পাওনা ছিল। দরখাস্ত করার সপ্তাখানেকের মধ্যে সেটা পেয়ে গেলাম। আর পাওয়ামাত্র দেরি করলাম না। টের পাচ্ছিলাম, একটা চাপা উত্তেজনা চলছে আমাব মধ্যে। তা-ই নিয়ে হোল্ড-অল বেঁধে, স্যুটকেস গুছিয়ে, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে গিয়ে ক্যালকাটা মেল ধরলাম।

প্রায় একযুগ পর আমি বাংলাদেশে ফিরছি। কথায় বলে জননী জন্মভূমি। তারা নাকি স্বর্গের অধিক। কিন্তু সে-জন্য ধমনীতে রক্ত তো তরঙ্গিত হচ্ছে না। শিরায়-স্নায়ুতে আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অসহ্য দুর্মর আকর্ষণ অনুভব করছি কই? কেনই বা করব? বাংলাদেশ আমার জন্য কোন অভ্যর্থনার মেলা সাজিয়ে রেখেছে! বাবা-মা নেই। দাদারা আপন

ভাই—সে শুধু কথার কথা। নইলে একই রক্তের উৎসে জন্ম হয়েও তারা নির্মম, নিষ্ঠুর, অনাত্মীয়। পরের চাইতেও পর।

জন্মভূমির টানে নয়, আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি অন্য আকর্ষণে। আসানসোলে বিজলীর মাল পৌঁছে দেবার একটা কারণ অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা গৌণ। মূল কারণ হচ্ছে ধীরেশ মাধ্যাকর্ষণের মতো দুর্দম কোনও শক্তিতে ধীরেশ অবিরত আমাকে টানতে শুরু করেছে।

বর্ধমানের সেই অখ্যাত, নগণ্য গ্রামটি থেকে দু'টো মানুষ উল্কাপিণ্ডের মতো একদিন ছুটে এসেছিল। তাদের একজনকে বাংলাদেশ থেকে বার শ' মাইল দূরের এক শহরে দেখেছি। তার ভেতরে-বাইরে, তার মুক্ত-বন্ধের সকল দিকে ভোগী ঈশ্বরের নখরাঘাত ছাড়া আর কিছুই নেই।

বিজলীকে তো দেখেছি। কিন্তু তার প্রথম মন্ত্রগুরু—ধীরেশ? তার পরিণতি কী? বিজলী যদি ভোগবাদের শেষ অঙ্কে পৌঁছে থাকে ধীরেশ রসাতলের কোন প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে? তার পরিণাম জানার জন্য আমার সমস্ত স্নায়ু উৎসুক, উদ্‌গ্রীব।

দূর দিগন্ত থেকে ধীরেশ আমার দিকে সম্মোহন-মন্ত্র ছুড়তে শুরু করেছে। সেই টানে আমি চলেছি।

আমি চলেছি ধীরেশকে আবিষ্কার করতে। ধীরেশকেই কী? প্রশ্নটা সবেগে আমার চেতনায় আঘাত হেনেছে যেন। নিজের কাছে সঠিক উত্তরটা দিতে গিয়ে বুঝেছি, কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়, এক জাদুকরের বিচিত্র খেলা দেখতেই বুঝি চলেছি। তার নিষ্করুণ একটা কৌতুক দেখেছি বোম্বাইতে—বিজলীর মধ্যে। তার দ্বিতীয় পরিহাসটুকু দেখবার জন্য এক যুগ পর বাংলাদেশ আমাকে হাতছানি দিয়েছে।

আসানসোলে বিজলীর মাল ডেলিভারি দিতে ঘণ্টা তিনেকের মতো লাগল। তারপর এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করলাম না। লোকাল ট্রেন ধরে সোজা কলকাতায় চলে এলাম।

হাওড়া স্টেশনে নেমে ভাবলাম, কোথায় যাব? দাদাদের কাছে অবশ্য ওঠা যায়। কিন্তু তাদের ঠিকানাগুলোই যে আমার অজানা। জানা থাকলেই কি আমি যেতাম? বোধ হয় না। এতকাল পর ছোট ভাইটা গিয়ে উঠলে দূর দূর করে দাদারা হয়তো তাড়িয়ে দিত না। হয়তো খুশিই হতো। কিন্তু এক যুগ আগের সেই কটু স্মৃতিটা দাদাদের কাছে যাবার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে।

অতএব একটা রিকশায় হোল্ড-অল, স্যুটকেস আর নিজেকে চাপিয়ে সোজা চলে এলাম হ্যারিসন রোডে। শিয়ালদার কাছাকাছি একটা সস্তার হোটেলে দিনকয়েকের সাময়িক আস্তানা গাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

পুরো দু'টো রাত ক্যালকাটা মেলে প্রায় বসে বসেই কেটে গিয়েছে। আসানসোলে ঘণ্টাতিনেকের জন্য গতিভঙ্গ হয়েছিল। সেই সময়টুকু কেটেছে ছোটাছুটিতে। কাজেই দু'রাত দু'দিনের সমস্ত ক্লান্তি আর ঘুম চোখের পাতায় ভিড় করে আসছিল। তাদের প্রশ্রয়

দিলাম না। ধীরেশকে যত তাড়াতাড়ি হয় খুঁজে বার করতেই হবে। নিজের ভেতর থেকেই টের পেলাম, কেউ অনবরত তাড়া দিচ্ছে।

ধীরেশকে তো দেখব, কিন্তু তার ঠিকানাই যে জানি না। আমার সমস্ত উৎসাহ হঠাৎ ঝিমিয়ে এল।

ধীরেশ সম্বন্ধে কী করব, কিছুই যখন স্থির করে উঠতে পারছি না ঠিক সেই সময় শিশির বাসুর অফিসের নামটা আচমকা মনে পড়ে গেল। একযুগ আগে শুশুরিয়ায় বসে কথায় কথায় শিশির বাসু তাঁর অফিসের নাম একবার উল্লেখ করেছিলেন।

সূত্রটুকু পেয়ে যেতেই আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এবং সেই ভরসাতেই দ্রুত স্নান-খাওয়ার পালা চুকিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের সুবিশাল এক বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। উদ্দেশ্য, শিশির বাসুর কাছ থেকে ধীরেশের খোঁজ নেওয়া।

না, স্মৃতি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। অনেক কাল আগে মুহূর্তের জন্য শোনা নামটা নির্ভুল মনে রাখতে পেরেছি। নিজের ওপর আস্থা যেন বেড়ে গেল আমার।

অফিসে ঢুকে শিশির বাসুর খোঁজ নিতে গিয়ে হতাশ হতে হল। ভদ্রলোক নাকি বছর কয়েক আগে রিটায়ার করেছেন।

হতাশার মধ্যেও আলোর একটা সংকেত অবশ্য পেলাম। অফিস থেকে শিশির বাসুর বাড়ির ঠিকানাটা সংগ্রহ করা গেল—হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ।

ঠিকানাটা যোগাড় করে আর অপেক্ষা করলাম না। সোজা বালিগঞ্জের বাস ধরলাম।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের শেষ পর্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ, সেই সময় কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। প্রায় বার বছর পর আবার এই শহরে এসেছি।

বারটা বছর! আদি-অন্ত-হীন মহাকালের হিসেবে তার অস্তিত্ব আর কতটুকু! এক বিন্দুর কোটি ভাগের একাংশও নয়। কিন্তু একটি মানুষের ষাট সত্তর বছর আয়ুর মধ্যে তার বিস্তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বার বছর সেখানে দীর্ঘ সময়।

বাসের এককোণে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই মহানগর এতগুলো বছরে জৈবিক নিয়মে অনেক বদলে গিয়েছে। দেশভাগের কল্যাণে মানুষ বেড়েছে বহুগুণ। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দোকানপসার, যানবাহন। আমার চেনা পঁয়তাল্লিশের কলকাতায় এত ভিড়, এত গতি, এত ব্যস্ততা ছিল না। আরেকটি দৃশ্যও চোখে পড়ছে। কলকাতার আকাশ ফুঁড়ে অসংখ্য উঁচু উঁচু বাড়ি সগর্বে মাথা তুলেছে। পঁয়তাল্লিশের কলকাতায় এগুলো আমি দেখে যাইনি।

চোখের দেখায় যতটুকু ঠিক ততটুকুই। নইলে কলকাতার বাইরের দিকে এই পরিবর্তন আমার চেতনার গভীরে তেমন রেখাপাত করছিল না। আমি শুধু উৎকণ্ঠ হয়ে আছি, কখন বাসটা বালিগঞ্জ পৌঁছবে।

বালিগঞ্জে পৌঁছে শিশির বাসুর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িটা খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধে হল না। চমৎকার দোতলা বাড়ি। সামনের দিকে পরিচ্ছন্ন, সুপরিকল্পিত একটি

বাগান। সেখানে সবই ফুলের গাছ। ফুলগুলোর অধিকাংশই কুলে-শীলে-গোত্রে বিদেশি। ডালিয়া, ম্যাগনোলিয়া, সুইট-পী আর ক্রিসানথেমাম—এই চার রকমের ফুল চিনতে পারলাম। বাকিগুলো আমার অপরিচিত।

দেখতে দেখতে বাগানের একপ্রান্তে আমার দৃষ্টি থমকে গেল। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, ক'টি গাঁদা বেল আর জবা ফুলের গাছ সেখানে একটু জায়গা করে নিয়েছে।

বিদেশি অভিজাত ফুলের বিপুল সমারোহের মধ্যে দেশি অন্ত্যজদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে ভারি করুণ। পাছে ছোঁয়া লেগে কুলীনদের জাত মারা যায় সেই ভয়ে জবা গাঁদা আর বেলেরা জড়সড়, কুণ্ঠিত। হয়তো বা তটস্থও।

শিশির বাসুকে যতটুকু দেখেছি তাতে কৌলীন্যহীন ওই গাছ ক'টির জায়গা তাঁর বাগানে হওয়া উচিত ছিল না। তবু হয়েছে। সমস্ত বাগানখানার অমর্যাদা ঘটিয়ে জবা-গাঁদারা বিরাট প্রহসনের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

বাগানের মাঝখান দিয়ে বাদামি নুড়ির পথ। সেই পথ মাড়িয়ে একসময় পোর্টিকোর তলায় এসে কলিং বেল টিপলাম।

প্রায় তৎক্ষণাৎ ডান দিকের একখানা ঘর থেকে—সম্ভবত ড্রইং রুম—একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বয়স ষাটের সীমানা পেরিয়ে গিয়েছে। হয়তো সেটা সত্তরের কাছাকাছি

দেখামাত্রই চিনে ফেললাম। শিশির বাসু। মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি বর্ধমানের সেই গ্রামটিতে যে শিশির বাসুকে দেখেছি তাঁর সঙ্গে একযুগ পর দেখা এই মানুষটির বিশেষ তফাত নেই। চোখ দু'টি তেমনই উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গে তেমনই অপরিমিত ভোগের চিহ্ন। তবে মুখে বয়সের আরও কিছু রেখা পড়েছে, চোখের কোলে কালি গাঢ়তর। মাথার চুল এবং ভুরুর বেশির ভাগটাই সাদা হয়ে গিয়েছে।

এই দুপুর গড়িয়ে যাওয়া প্রহরেও শিশির বাসুর গায়ে স্লিপিং গাউন চাপানো। দাঁতের ফাঁকে দৃঢ়ভাবে ধরা পাইপ।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিশির বাসুর ভুরু দু'টো সঙ্কুচিত হতে হতে জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো বেঁকে গেল। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দ্রুত দেখে নিয়ে দৃষ্টিটা মুখে নিবদ্ধ করলেন তিনি। তারপর রুক্ষ সুরে প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই?'

অভ্যর্থনাটা খুব প্রীতিকর মনে হল না। কুণ্ঠিত সুরে বললাম, 'আজ্ঞে, আমি বোম্বাই থেকে আসছি। আমার নাম ললিত চৌধুরি।'

'নাম না হয় জানলাম, কিন্তু চিনতে তো পারছি না।'

নিজের কী পরিচয় দেব, বুঝতে না পেরে শিশির বাসুর সুবিধার্থে মহাযুদ্ধের উল্লেখ করে বললাম, 'সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারের সময় বর্ধমান জেলায় আপনাদের দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন—'

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শিশির বাসু বলে উঠলেন, 'আই সি, আই সি—সেই শুশুরিয়া বলে জঘন্য ভিলেজটা তো?'

সেই জঘন্য গ্রামখানায় যাবার জন্য যে কেউ তাঁর পায়ে ধরে সাধেনি, নিতান্তই পৈতৃক প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে তিনি সেখানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, এই অনাবশ্যক তথ্যটা শিশির বাসুকে আর মনে করিয়ে দিলাম না। শুধু বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, শুশুরিয়া।'

এবার যেন শিশির বাসুর চোখে কৌতূহলের একটু ছায়া পড়ল। সঙ্কুচিত ভুরু দু'টোও স্বাভাবিক হতে লাগল। সামান্য আগ্রহের সুরে তিনি বললেন, 'তা তুমিও সেখানে থাকতে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের বাড়িতেও আমি বারদুয়েক গিয়েছি।'

'আমাদের বাড়ি গিয়েছ!' আমার মুখে শিশির বাসুর দৃষ্টি আটকে ছিল। এবার সেটা তীক্ষ্ণতর হল। তিনি বললেন, 'কই, মনে পড়ছে না তো।'

'অনেক দিন হয়ে গেল। মনে থাকার কথা নয়। তা ছাড়া, আমি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য মানুষ নই যে মনে করে রাখতে হবে।'

নিজেকে তুচ্ছ বলে জাহির করেছি, তাতে যেন সন্তুষ্টই হলেন শিশির বাসু। অন্তত তার চোখমুখের প্রসন্নতা দেখে তাই মনে হল। যাই হোক, তিনি আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

আমি আবার বলে উঠলাম, 'তবে—'

বাধা দিয়ে শিশির বাসু বললেন, 'এস, ভেতরে এস।'

আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়েই যে কথা বলে যাচ্ছেন সে-সম্বন্ধে এতক্ষণে সচেতন হয়েছেন শিশির বাসু। ড্রইং রুমে নিয়ে একটা সোফায় আমাকে বসিয়ে বললেন, 'কী বলছিলে, বল।'

'আজ্ঞে, একটি মেয়ের কথা বললে হয়তো আমাকে আপনার মনে পড়বে।'

'মেয়ে!' ভুরু দু'টো ফের কুঁচকে গেল শিশির বাসুর।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কে সে? কী নাম?'

'তার নাম বিজলী।'

'বিজলী!'

শিশির বাসুর স্মৃতিকে আরেকটু উস্‌কে দেবার জন্য বললাম, 'সেই যে সন্ন্যাসিনী মেয়েটা, মঠের জন্যে যে চাঁদা চাইতে গিয়েছিল।'

হাতের ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়ে দিলেন শিশির বাসু। মুখোমুখি বসে ছিলেন। লক্ষ করলাম, তাঁর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল, গলার কাছের রক্তবাহী শিরাগুলো উত্তেজনায় ফুলে উঠল। ঠোঁটদু'টো দৃঢ়বদ্ধ। বিচিত্র এক অস্থিরতা তাঁকে দ্রুত বেষ্টন করতে লাগল যেন।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে পড়লেন শিশির বাসু। হাত দু'টি পেছন দিকে নিয়ে মুঠি পাকিয়ে বুকের ভেতরকার কোনও যন্ত্রণায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো পায়চারি করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর আমি ফিসফিসিয়ে উঠলাম, 'এবার নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়েছে—'

আমার কথা শেষ হল না। তার আগেই আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন শিশির বাসু, 'ইয়াস ইয়াস, সবই মনে পড়েছে। তুমি সেই রক্তচোষা জোঁকের দলের একজন, ওয়ান অ্যামাং দোজ ব্লাডসাকারস। কী যেন তাদের বলে? সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসিনী! সেই মেয়েটাকে নিয়ে তুমিই তো সেদিন ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিলে? সেই মেয়েটা—দ্যাট বিজলী?'

বিজলীর সূত্রটা ধরিয়ে দিতেই আমাকে চিনে ফেলেছেন শিশির বাসু। ধীরে ধীরে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন শিশির বাসু, 'এতকাল পর আবার কী মনে করে? আবারও মঠের জন্যে ভিক্ষে চাইতে নাকি?'

লক্ষ করলাম, এক যুগ আগের মতো রূঢ় আর উদ্ধতই আছেন শিশির বাসু। বয়সের ভার তাঁর স্বভাবের উগ্রতা বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ল, সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর ব্যাপারে তাঁর অসহিষ্ণুতা আরও বেড়েছে।

বার বছর আগে নিতান্ত সহচর হিসেবে বিজলীর সঙ্গে শুশুরিয়ায় শিশির বাসুদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বিজলীর সঙ্গে গিয়েছিলাম এবং তার হয়ে মঠের চাঁদা চেয়েছিলাম বলে শিশির বাসু আমাকে মঠেরই একজন অর্থাৎ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভুলটা সেদিন শুধরে দেওয়া হয়নি। আজও দিলাম না। শুধু বললাম, 'আজ্ঞে না, চাঁদা চাইতে আসিনি।'

'তবে কী জন্যে এসেছ?'

আমি কিছু বলার আগেই শিশির বাসু ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সেদিন সেই মেয়েটা মানে বিজলীকে এনে আমার একটা ক্ষতি তো করেছিলে। আজ আবার কী মতলব?'

সেদিন বিজলীকে আমি নিয়ে যাইনি।সে-ই আমাকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল। এট বলতে গিয়েও বললাম না। কী হবে বলে?

শিশির বাসুর সেই কথাটা আমার মনে তীব্র নাড়া দিয়ে গেল। বিজলী তাঁর ক্ষতি করেছে। কী ক্ষতি? তবে কি—

ভাবনার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই ধৈর্য হারালেন শিশির বাসু, 'কি. চুপ করে রইলে কেন? কী জন্যে এসেছ বল।'

এবার বললাম, 'একজনকে খুঁজতে।'

'আমার কাছে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

শিশির বাসু প্রশ্ন করলেন, 'কাকে?'

তাঁর চোখে দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে বললাম, 'আজ্ঞে, আপনার ছেলেকে। মানে—'

আমার কথাগুলো বুঝে উঠতে যেন অসুবিধেই হল শিশির বাসুর। মনে হল, পৃথিবীর জটিলতম এক ধাঁধার মুখোমুখি তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। শিথিল সুরে তিনি বললেন 'আমার ছেলেকে?'

একটা মানুষকে খুঁজতে আসার পেছনে কোনও অন্যায় আছে কিনা, বুঝতে পারছি না। তবে একটু বুঝেছি ধীরেশের নাম করে নিজের অজান্তে কোনও একটা বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আজ্ঞে বিশেষ একটা দরকারে—'

উন্মত্তের মতো এবার লাফিয়ে উঠলেন শিশির বাসু, 'সে রাসকেলের খবরই আমি রাখি না। তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তাকে ত্যাজ্য করেছি। আই হ্যাভ ডিসইনহেরিটেড হিম। আমার একটা ফার্দিংও সে পাবে না। নাউ ইউ মে গো। গেট আউট—'

যন্ত্রচালিতের মতো উঠে পড়লাম। শিশির বাসুর অপমান আমার চেতনাকে আঘাত হানতে পারেনি। আমি শুধু স্তম্ভিত হয়েছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে অনুভব করলাম, অগাধ এক বিস্ময় আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সেই বিস্ময়টার জন্যই বিতাড়িত হবার অপমানটা আমার গায়ে লাগে নি।

মোটামুটি এটুকু বুঝেছি, শিশির বাসু ছেলের ব্যাপারে নিদারুণ অসুখী এবং রুষ্ট। ধীরেশের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্কই ছিন্ন করে ফেলেছেন তিনি। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু কেন? সেই রহস্যটা আর উন্মোচন করেননি ভদ্রলোক। সে-সম্বন্ধে একটা প্রশ্নেরও সুযোগ দেননি। তার আগেই আমাকে কুকুরের মতো তাড়ানো হয়েছে।

অন্যমনস্কের মতো বাগান আর নুড়ির পথ পেরিয়ে গেট পর্যন্ত চলেও এসেছিলাম। হঠাৎ স্নিগ্ধ স্বরে কে যেন ডাকল, 'যেও না, শোন—'

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, প্রৌঢ় এক মহিলা। প্রৌঢ় বলা কি সঙ্গত? বার্ধক্যের প্রসারিত নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছেন তিনি।

প্রথমে বুঝতে পারিনি। একটু তাকিয়ে থাকতেই চিনতে পারলাম—ধীরেশের মা। চেনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত স্নায়ুর ভেতর দিয়ে নিদারুণ এক চমক খেলে গেল।

শুশুরিয়ায় আমি কাকে দেখেছিলাম? আর ইনিই বা কে? বার বছর আগে সেই উগ্র আধুনিকাকে এই রূপে এই বেশে দেখব, ভাবিনি। এই এক যুগে ধীরেশের মায়ের কি জন্মান্তর ঘটে গিয়েছে?

শুশুরিয়ায় থাকতে শুনেছিলাম, ভদ্রমহিলা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান—খ্রিস্টান বাপ-মায়ের সন্তান। পিতৃ এবং মাতৃ, দুই কুলেরই ভাষা ইংরেজি। কিন্তু নির্ভুল বাংলায় তিনি আমাকে ডেকেছেন। স্বামীর কুলের ভাষাটা চমৎকার আয়ত্ত করেছেন ভদ্রমহিলা।

শুধু কি ভাষাটাই, আমার চোখদু'টি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, মিলের লালপাড় একখানি শাড়ি ঘরোয়া ভঙ্গিতে পরেছেন ধীরেশের মা। এমন একটি জামা তাঁর দেহে যার হাতা কনুই পর্যন্ত নেমে এসেছে। ফর্সা ধবধবে পা দু'খানি আলতায় রাঙানো। কপালে গোলাকার মস্ত সিঁদুরের টিপটা যেন জ্বলছে। শুশুরিয়ার সেই উগ্র আধুনিকার ছবিটা তুলনামূলকভাবে স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল। সেদিন তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। ব্লাউজটা ছিল দুঃসাহসী রকমের সংক্ষিপ্ত। চুল ছিল শ্যাম্পু-করা, ফুরফুরে। ঠোঁট ছিল রঞ্জিত, নখ

ছিল রক্তিম। আর আজ? মনে হল, স্বপ্ন দেখছি। বাস্তবের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই এমন স্বপ্ন। মনে হল, তাকিয়ে আছি বলেই দেখতে পাচ্ছি। চোখ বুজলেই এমন চমৎকার স্বপ্নটা মুহূর্তে বিলীন হয়ে যাবে।

শুশুরিয়ায় যাঁকে দেখেছিলাম সেই আধুনিকা সম্বন্ধে আমার আদৌ কোনও ধারণা ছিল না। তাঁর জীবনের সবটুকুই আমার অজানা। আশ্চর্য, সেই মহিলাই কী এক মন্ত্রবলে আজ আমার স্পর্শ এবং অনুভবের সীমার মধ্যে নেমে এসেছেন। যেন বাঙালি ঘরেরই কোনও চিরন্তন গৃহলক্ষ্মী। এঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই তো আমার আজন্মের সংস্কার আর দেখার চোখ গড়ে উঠেছে।

পায়ে পায়ে সম্মোহিতের মতো কখন যে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, খেয়াল ছিল না। ধীরেশের মা বললেন, 'ধীরেশকে খুঁজতে এসেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম, 'কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে?'

'তুমি ধীরেশের বাবার সঙ্গে যখন কথা বলছিলে, আমি পাশের ঘরে ছিলাম। দু-একটা শব্দ আমার কানে এসেছে। এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'আমার ঘরে।'

শিশির বাসু আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ ধীরেশের মা সস্নেহে, সাগ্রহে ডাক দিয়েছেন। কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করলাম। আবার অপ্রতিরোধ্য কৌতূহলও অনুভব করছি। সেদিনের দুঃসহ আধুনিকা এমন বদলে গেলেন কেমন করে?

ধীরেশের মায়ের সঙ্গে যাব কি যাব না, এই দুয়ের মাঝখানে আমি যখন দ্বিধান্বিত, ঠিক সেই সময় তিনি আবার বলে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে কেন বাবা, এস।' বলে আর অপেক্ষা করলেন না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। তারপর সমস্ত দ্বিধা সবলে ঠেলে দিয়ে পায়ে পায়ে ধীরেশের মাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

সামনের সংক্ষিপ্ত বাগানটুকু পার হয়ে একসময় একতলার দক্ষিণ প্রান্তে শেষ ঘরখানায় গিয়ে থামলেন ধীরেশের মা। আমি ভেতরে যাইনি। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

ধীরেশের মা বললেন, 'কোনও সঙ্কোচ নেই। ভেতরে এস। এই ঘরখানা আমার।'

অতএব ভেতরে যেতে হল। গিয়েই মনে হল, আগাধ এক বিস্ময়ের মধ্যে এসে পড়েছি।

ঘরখানা মাঝারি মাপের। আসবাব বলতে কতটুকু আর! এক কোণে দেওয়াল ঘেঁষে একটা তক্তপোশ। সেখানে একজনের মতো বিছানা পাতা। আরেক কোণে ছোট আলমারি। শিয়রের কাছে সস্তা টেবল। তার ওপর হাত-আয়না, চিরুনি, সিঁদুরকৌটো। পাউডার বা ক্রিম, স্কিন টনিক লোশন বা বিউটি এইড—প্রসাধনীর চিহ্নমাত্র কোথাও আবিষ্কার করা

গেল না। সাধারণভাবে দিন যাপনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছু নেই এখানে।

শিশির বাসু যে রুচি আর মনোভাবের মানুষ তার সঙ্গে এই ঘরখানার মিল খুঁজতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা। এখানে পা দেওয়া মাত্র আমার সমস্ত স্নায়ু জুড়িয়ে গিয়েছে। অনুভব করেছি, এখানে যাঁর বাস তিনি চড়া সুরের প্রমত্ত উৎসবে গা ভাসিয়ে জীবন কাটান না। তাঁর দিনে কাটে তীব্র হইচই-এর বাইরে, অসীম নির্জনতায়। অপার স্নিগ্ধতার মধ্যে।

চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। দেখতে দেখতে এক জায়গায় আমার চোখ দু'টি স্থির হল। চোখই শুধু না, আমার স্তম্ভিত সত্তা সেখানে বিচিত্র এক শৃঙ্খলে আটকে গিয়েছে যেন।

এ-ঘরেরই পুব দিকের দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের ছোট একটি সিংহাসন। তার মধ্যে কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। আছে পেতলের পিলসুজ আর প্রদীপ। প্রদীপটা অবশ্য এখন জ্বলছে না। প্রদীপ ছাড়াও শাঁখ, ধুনুচি, পশমি আসন—পুজোর সমস্ত সরঞ্জামই চোখে পড়ল।

আসবাব-বর্জিত এমন দীন পরিবেশে ধীরেশের মা থাকেন, এ তথ্যটাই আমার পক্ষে ছিল বিস্ময়কর এবং অভাবনীয়। কিন্তু শিশির বাসুর মতো নিরীশ্বর ভোগীর স্ত্রী হয়ে কেমন করে তিনি যে এত সব দেবদেবীকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসতে সাহস পেয়েছেন, তা পরম দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার। আমার সমস্ত অস্তিত্ব বিমূঢ় হয়ে গেল যেন।

তবে কি বাইরের দিকেই শুধু নয়, গত এক যুগে জীবনের সব প্রান্তেই ধীরেশের মায়ের পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছে!

কতক্ষণ কাঠের সিংহাসনটার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, মনে নেই। একসময় ধীরেশের মায়ের ডাকে চেতনা ফিরে এল। তক্তপোশটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওইখানে বোসো বাবা।'

নির্দেশমতো বসলাম।

ধীরেশের মা তক্তপোশের তলা থেকে বেতের একখানা মোড়া বার করে আমার মুখোমুখি বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী নাম?'

নাম বললাম।

ধীরেশের মা এবার প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় থাক?'

'আজ্ঞে, বোম্বাই।'

'কাজ-টাজ কী কর?'

'খুব ছোট একটা চাকরি করি।'

এরপর আর কোনও প্রশ্ন করলেন না ধীরেশের মা। কী এক অতল গভীর ভাবনার

মধ্যে কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে স্তব্ধতা ভেঙে শুরু করলেন, 'আচ্ছ ললিত—'

আমি উন্মুখ হয়েই ছিলাম। তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলাম, 'আজ্ঞে—'

'ধীরেশের খোঁজে তো তুমি এসেছ—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি বুঝি ধীরেশের বন্ধু?'

'না। ধীরেশবাবুকে পাঁচ সাত বারের বেশি আমি দেখিনি। তা-ও বছর দশ বার আগে তাঁর সঙ্গে আমার খুব সামান্য পরিচয় হয়েছিল। এখন দেখলে আমাকে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ।'

আমার চোখে দৃষ্টি রেখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ধীরেশের মা। তারপর খুব আস্তে, কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা। তুমি কিন্তু কিছু মনে করতে পারবে না।'

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'না না, মনে করব কেন? কী জিজ্ঞেস করবেন, করুন না।'

ধীরেশের মা বললেন, 'দশ বার বছর আগে যার সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয় হয়েছিল হঠাৎ এতকাল পর তাকে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছ সেটা খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

'বিশেষ একটা দরকারে।'

'দরকার তো নিশ্চয়ই আছে। নইলে শুধু শুধু কি আর খুঁজছ?' ধীরেশের মা সস্নেহে হাসলেন, 'সেই দরকারটাই জানতে চাইছি।'

কেন ধীরেশের সন্ধানে আরব সাগরের পার থেকে বঙ্গোপসাগরের এই কূলে এসে হানা দিয়েছি সে-কথাটা কাউকে যদি অকপটে বলতে যাই, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেই সে সন্দিহান হয়ে পড়বে। হয়তো ভাববে আমার ওপর নেহাতই পাগলামি ভর করে বসেছে।

কিন্তু আমি তো জানি, ধীরেশকে কেন খুঁজতে এসেছি। না এসে পারিনি, তাই এসেছি এসেছি দুরন্ত, অদম্য এক আকর্ষণে। কেউ বলবে এ আমার খেয়াল, কেউ বলবে আমি বদ্ধ উন্মাদ। যে কাজে দু'টো পয়সা আসে না সংসারের লাভ-ক্ষতির হিসেবে সেটা তো অকাজ আমি জানি বিশ্বভুবন ঘুরেও এমন একটা মানুষ বার করতে পারব না যে আমার এই অকাজের পেছনে ছুটে বেড়ানোটাকে প্রাণ ভরে সায় দেবে। বরং যার কাছেই সমর্থনের আশায় যাব, অকাজের কাজী বলে সে-ই আমার দিকে নাক সিটকে চোখমুখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকবে। বড় জোর ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা হাসির একটা রেখা ফুটিয়ে বলবে, 'বাঃ বেড়ে একটি কাজ জুটিয়েছ তো।' আমি জানি এটা তার মুখের কথা মাত্র। মনের কথা তার ভিন ভাবের। মনে মনে সে বলবে, 'গাধা কোথাকার, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।' আমার আহম্মকির জন্য তার বিদ্রূপের অবধি থাকবে না।

উন্মাদ খেয়ালি অথবা বেকুব—যে যা-ই বলুক, সবই আমি মাথা পেতে নিতে রাজি। কিন্তু ধীরেশের খোঁজ না করে ফিরতে পারব না। বর্ধমানের সুদূর অভ্যন্তরে একটি অখ্যাত গ্রাম থেকে দু'টি মানুষ উল্কার মতো একদা উড়ে গিয়েছিল। তাদের একজনকে তো বোম্বাইতেই দেখেছি, আরেকজনের পরিণাম জানবার জন্যই এত পথ পাড়ি দিয়ে আমার এখানে ছুটে আসা।

এ-জাতীয় ব্যাখ্যা অন্য কেউ হলে বিদ্রূপের ভয়ে দিতাম না। কিন্তু যে ধীরেশের মা গত এক যুগে ভেতরে-বাইরে সকল দিকে বদলে গিয়েছেন, তাঁর কাছে বোধ হয় নিজের গহন-গোপন সব কিছুই অকপটে মেলে ধরা যায়। মনের মধ্যে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে শুরু করলাম, 'দশ বার বছর আগে, মানে সেই যুদ্ধের সময় আপনারা বর্ধমানের একটা গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। মনে আছে সে কথা?'

ধীরেশের মায়ের চোখ দু'টো চকচকিয়ে উঠল। উৎসুক সুরে বললেন, 'কি আশ্চর্য, এই তো সেদিনের কথা। মনে থাকবে না কেন? কিন্তু বাবা, তুমি জানলে কেমন করে?'

'আমিও যে সে-সময় ওই গ্রামে ছিলাম। আপনাদের বাড়িতেও বার দুই গিয়েছি।'

'আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্মৃতির মধ্যে অনেকক্ষণ হাতড়ে ফিরলেন ধীরেশের মা। কিন্তু বর্ধমানের গ্রামে তাঁদের সেই বাড়িটিতে আমার যাবার মতো অকিঞ্চিৎকর একটি ঘটনা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না।

তাঁর স্মৃতি থেকে আমি যে মুছে গিয়েছি সে-সম্বন্ধে কোনও সংশয় নেই। বললাম, 'মনে করতে পারছেন না, তাই না?'

সঙ্কোচের সুরে ধীরেশের মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমি ঠিক—'

আমি হাসলাম, 'অনেক দিনের ব্যাপার। মনে না থাকারই কথা। আপনার সুবিধের জন্যে একটি মেয়ের নাম বলব। হয়তো মনে পড়ে যাবে।'

বিহ্বলের মতো ধীরেশের মা বললেন, 'মেয়ে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

জিজ্ঞাসু সুরে ধীরেশের মা বললেন, 'কার কথা বলছ?'

'আজ্ঞে বিজলীর।'

লক্ষ করলাম, সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে দুরন্ত এক চমক খেলে গেল ধীরেশের মায়ের। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক স্থির। ওপরের দাঁত নিচের ঠোঁটে গেঁথে বসেছে। গলার কাছটা বিচিত্র অস্থিরতায় কাঁপছে। অনুভব করলাম, তাঁর মধ্যে নিদারুণ বিপর্যয়ের মতো কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে কিসের যেন একটা ভাঙচুর শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর অনেকটা আপন মনে কাঁপা, অস্ফুট সুরে ধীরেশের মা উচ্চারণ করলেন, 'বিজলী! বিজলী!'

আমি তাঁর দিকে খানিক ঝুঁকে সাগ্রহে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বিজলী। মনে পড়ছে? সেই যে মঠের জন্যে চাঁদা চাইতে আপনাদের—'

ধীরেশের মা আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না। অস্থির, উত্তেজিত স্বরে হঠাৎ বলতে শুরু করলেন, 'সেই মেয়েটা এখন কোথায় আছে, তুমি বলতে পার?'

বুঝলাম, বিজলীকে চিনতে পেরেছেন ধীরেশের মা। অবশ্য না-চেনার কিছু ছিল না। একদা যে-তরুণীটি তাঁর ছেলের সঙ্গে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে শুশুরিয়ার নিস্তরঙ্গ, স্তিমিত পরিবেশে আলোড়ন তুলেছিল তাকে ভোলার প্রশ্নই ওঠে না। কলকাতায় যাবার পর ধীরেশ-বিজলীর জীবনে যা-যা ঘটেছে তার ছিটেফোঁটাও যদি তিনি জেনে থাকেন তবে সে-সব কি কোনওদিন বিস্মৃত হবার? মাথা নেড়ে বললাম, 'পারি।'

'কোথায়, কোথায় সে?' বলতে বলতে বেতের মোড়া থেকে উঠে আমার ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালেন ধীরেশের মা। অনুভব করলাম, বিচিত্র এক আবেগ তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে তোলপাড় করে ফেলছে যেন। সত্তার অতল থেকে অদম্য কাঁপুনির বেগ উঠে এসে শরীরময় ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুতেই তিনি সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না।

ধীরেশের মায়ের এত চাঞ্চল্য, এত অস্থিরতার পেছনে যে-কারণটা আছে তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। বললাম, 'বিজলী এখন বোম্বাইতে।'

আমার মুখে ধীরেশের মায়ের দৃষ্টি আগে থেকেই নিবদ্ধ ছিল। অস্থির সুরে তিনি বললেন, 'বোম্বাইতে? সেখানে কী করে সে?'

বহুদূরের সেই শহরটিতে বিজলীর জীবন ইদানীং কিভাবে কাটছে, তার প্রতিদিনের জীবনযাপন কি নিদারুণ প্রমত্ততা দিয়ে ঘেরা—সব, সব বলে গেলাম। কিছুই গোপন করলাম না।

শুনে প্রথমটা একেবারে হতচকিত ধীরেশের মা। তারপর বিমূঢ়ের মতো বলতে লাগলেন, 'এই মেয়েটাই না একদিন মঠে যাতায়াত করত! সন্ন্যাসিনী হতে চেয়েছিল!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

ধীরেশের মা ঘোরের মধ্যে বলে যেতে লাগলেন, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য! বিজলী আজ ওই অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে!'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর বলে উঠলাম, 'বিজলীর দিন তো এভাবে কাটছে। তাকে যত দেখেছি ততই ধীরেশবাবুর কথা মনে পড়েছে। তাঁকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়েছিল। সেই জন্যেই বোম্বাই থেকে এতদূরে ছুটে এসেছি।'

ধীরেশের মা নিশ্চুপ। আগের সেই ঘোরটা এখনও তাঁর কাটেনি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ধীরেশবাবু এখন কোথায় আছেন?'

এবার আমার কথা যেন শুনতে পেলেন ধীরেশের মা। একটু চমকে উঠে বললেন, ধীরেশের কথা বলছ বাবা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু সে তো এখানে থাকে না।'

ব্যগ্র সুরে বললাম, 'তাঁর ঠিকানাটা জানেন?'

'এখনকার ঠিকানা আমার জানা নেই। তবে—' বলতে বলতে ধীরেশের হঠাৎ থেমে গেলেন।

'কী?' আমি উন্মুখ হলাম।

'মাস ছয়েক আগে ধীরেশ ওর এক বন্ধুর বাড়ি ছিল। বন্ধুর নাম রাজেন— রাজেন মল্লিক। ঠিকানা হচ্ছে—নম্বর সাহানগর রোড। কেওড়াতলা শ্মশানের কাছে জায়গাটা।'

সংশয়ের সুরে বললাম, 'ছ' মাস আগে তো ধীরেশবাবু ওখানে থাকতেন।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে শুধু শুধু ওখানে গিয়ে কী হবে?'

'তুমি একবার গিয়েই দেখ না। রাজেন হয়তো ধীরেশের এখনকার ঠিকানা জানে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সে জানে।'

হতাশ হয়েই শিশির বাসুর কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম। দেশের পূর্ব প্রান্তের এই মহানগরে এসেছিলাম এ-কালের বিচিত্র এক খেলা দেখতে। খেলাটা আমার না-দেখাই থেকে যেত। ব্যর্থতা আর অতৃপ্তি নিয়েই বোম্বাই ফিরে যেতাম। কিন্তু শিশির বাসুর স্ত্রী ধীরেশকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে যে-সূত্রটি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তাতে উৎসাহিত বোধ করছি। বললাম, 'আমি এখনই রাজেনবাবুর কাছে যাচ্ছি।' বলেই উঠে পড়লাম।

দরজার দিকে পা বাড়াতে যাব, ধীরেশের মা বললেন, 'আরেকটু বোসো। তোমাকে আমার ক'টা কথা বলার আছে।'

'কী কথা?'

'বোসো না, বলছি।'

অগত্যা বসতেই হল। ধীরেশের মা কী একটু ভেবে শুরু করলেন, 'যদি ধীরেশকে খুঁজে বার করতে পার, বোলো আমি তাকে আশীর্বাদ করেছি। সে যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে সেটাই ঠিক জায়গা। সেখানেই তার শান্তি, তার আনন্দ। বোলো, সেখানে যাবার জন্যে আমি ভেতরে ভেতরে ছটফট করছি। মাথা কুটছি। কিন্তু তার বাবার জন্যে যাবার উপায় নেই। এই কারাগার থেকে কোনওদিনই আমার মুক্তি নেই।'

শুনতে শুনতে আমার সমস্ত অস্তিত্বের ওপর কী যেন ভর করে বসল। কিছুটা বিভ্রান্তও বোধ করলাম। একটু আগে ধীরেশের মা বলেছেন তাঁর ছেলের ঠিকানা জানেন না। অথচ তিনি জানেন, ধীরেশ কোথায় পৌঁছেছে। আমার বিভ্রান্তির কথা তাঁকে বললাম।

শুনে ধীরেশের মা মৃদু হাসলেন। বললেন, 'ঠিকানা বলতে কী বোঝো? অমুক শহর, অমুক রাস্তা কি অমুক গ্রাম, অমুক জেলা—এই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বিশ্বাস কর বাবা, ধীরেশের তেমন ঠিকানা আমার জানা নেই। তবে—'

'কী?'

একটু চুপ করে রইলেন ধীরেশের মা। দূরমনস্কের মতো কী যেন ভেবে আস্তে আস্তে একসময় বললেন, 'মানুষের জীবনে আরেক রকমের ঠিকানা আছে যা গ্রাম-শহর-জেলা বা মহকুমা দিয়ে বোঝানো যায় না। ধীরেশকে যদি খুঁজে বার করতে পার, নিজেই বুঝতে পারবে।'

ভদ্রমহিলার কথাগুলো বিচিত্র প্রহেলিকাময় মনে হল। যদিও এ-ব্যাপারে আর কোনও প্রশ্ন করা অনুচিত তবু আমার কৌতূহল প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। চোখ কান বুজে বলে ফেললাম, 'যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলব?'

'কী?'

'ধীরেশবাবুর জীবনে আরেক রকমের যে ঠিকানা আছে সেটা তো আপনার জানা।'

'হ্যাঁ।'

'সেটা যদি বলেন—'

কী উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেলেন ধীরেশের মা। শুধু বললেন, 'এ-বাড়িতে দাঁড়িয়ে সে-কথা বলা যাবে না বাবা।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ধীরেশের মা-ই আবার শুরু করলেন, 'সে যাক গে। ধীরেশকে খুঁজে পেলে বোলো, তার বাবা একদিন আত্মীয়-স্বজন-বাপ-মা-ভাই-বোন, সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন আমার জন্যে। সে কৃতজ্ঞতা আমি ভুলিনি। আর সে-জন্যেই তাঁকে ছাড়তে পারি না। ধীরেশকে বোলো, এ-বাড়িতে একখানা ঘরে একরকম নির্বাসনই বেছে নিয়েছি। তার বাবার সঙ্গে সারাদিনে একবারও দেখা হয় কি না সন্দেহ। এক বাড়িতে থাকি, দু'জনের মধ্যে এটুকু বন্ধনই যা টিকে আছে।'

আমি চকিত হয়ে উঠলাম। একজন অপরিচিতের কাছে এ-সব কী বলতে শুরু করেছেন ধীরেশের মা!

ধীরেশের মায়ের কিন্তু কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। আত্মবিস্মৃতের মতো বলে যেতে লাগলেন, 'ভাল লাগে না বাবা, একেবারেই ভাল লাগে না। এ বাড়িতে নিশ্বাস আমার আটকে আসছে।'

মনে হল, আমি উপলক্ষ মাত্র। আমাকে সামনে বসিয়ে তিনি নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলছেন। আমি কেন, যে কোনও একজন মনোযোগী শ্রোতা পেলেই প্রাণের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা এভাবেই মুক্তি দিতেন ধীরেশের মা। তাঁর কথার উত্তর দিলাম না। শুধু বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলাম।

ধীরেশের মা আবার বললেন, 'ধীরেশকে বোলো, এ-বাড়ি থেকে কোনওদিন বেরোতে না পারলেও মনে মনে সব সময় পা বাড়িয়েই আছি।'

ধীরেশের অবাঙালি মায়ের রূপান্তর দেখে আগেই আভাস পেয়েছিলাম শিশির বাসুর সংসারে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। যে শিশির বাসু ঈশ্বরবর্জিত, উচ্ছৃঙ্খল, ভোগবাদের ফেনিল আরকে যিনি আকণ্ঠ বুঁদ হয়ে আছেন, ধীরেশের মায়ের এই পরিবর্তন তিনি যে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। এজন্য সংসারে যে অনেক সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত একটা স্নায়ুযুদ্ধ যে চলছে তা সহজেই অনুমেয়। ধীরেশের মায়ের কথা থেকেই বুঝতে পেরেছি, শিশির বাসুর সঙ্গ বর্জন করে একতলার এই নির্জনে তিনি নির্বাসিত হয়ে আছেন। কিন্তু কেন? শুশুরিয়ায় ধীরেশের মাকে যে-রূপে দেখেছি তাতে নিঃসংশয়ে মনে হয়েছে শিশির বাসুর তিনি যোগ্য সঙ্গিনী। সহধর্মিণী বলতে যা বোঝা যায় তা-ই। তা হলে হঠাৎ এমন কি হয়েছিল যাতে জীবনের প্রমত্ত উৎসব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন সন্ন্যাসিনী সাজতে গেলেন?

সন্ন্যাসিনী? তা ছাড়া কী-ই বা বলা যায়! দশ বার বছর আগে বর্ধমানের এক গ্রামে একদা পলকের জন্য হলেও ধীরেশের মাকে যেমনটা দেখেছিলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম সে তুলনায় আজকের এই জীবনকে সন্ন্যাসের জীবন ছাড়া আর কী নামে চিহ্নিত করতে পারি?

আশ্চর্য! শিশির বাসুর আদর্শ সহধর্মিণী স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এমন একটা জায়গায় যে এসে পৌঁছবেন, এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়।

ধীরেশের মা এবার আমার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন যেন। বললেন, 'তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি বাবা। তুমি তো রাজেন মল্লিকের কাছে যাচ্ছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'তা হলে—' এটুকু বলেই থেমে গেলেন ধীরেশের মা।

তাঁর অসমাপ্ত কথার মধ্যে স্পষ্ট একটি ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। ইঙ্গিতটা বোঝা সত্ত্বেও আমি উঠে দাঁড়ালাম না। এক যুগ পর বাংলাদেশে এসেছিলাম ধীরেশকে আবিষ্কার করতে। কিন্তু তার মা নিজের চারপাশে এতখানি বিস্ময় নিয়ে যে অপেক্ষা করছিলেন তা কে ভাবতে পেরেছিল!

মোটামুটি নিজের চোখে দেখছি, ধীরেশের মা একেবারেই বদলে গিয়েছেন। কিন্তু কী এমন ঘটেছিল যাতে জীবনের এক মেরু থেকে একেবারে অন্য মেরুতে চলে আসতে হয়েছে? সেই রহস্যটা এখনও আমার জানা হয়নি। অথচ জানার জন্য আমার সমস্ত সত্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিভাবে যে সে-প্রসঙ্গটা তুলব, বুঝে উঠতে পারছি না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ইতস্তত করতে লাগলাম।

ধীরেশের মা কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে বললেন, 'আমাকে তুমি কি কিছু বলবে বাবা?'

দ্বিধার সুরে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বল।'

'বলতে সাহস হচ্ছে না।'

'কী এমন কথা?'

'আপনি আমার মায়ের মতো। যদি ছেলের দোষ না ধরেন, তা হলে বলতে পারি।'

ধীরেশের মা বললেন, 'দোষ ধরব না। তুমি নির্ভয়ে বল।'

অভয় পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'দশ বার বছর আগে আপনাকে একবার মাত্র দেখেছিলাম। যতদূর মনে হচ্ছে, আপনি পুরোপুরি বদলে গিয়েছেন।'

মৃদু স্বরে ধীরেশের মা বললেন, 'হ্যাঁ, বদলেই গিয়েছি।'

'শুনেছিলাম আপনি খ্রিস্টান—'

'আমি খ্রিস্টান বাপ-মায়ের সন্তান। বাপ-মায়ের ধর্ম যদি সন্তানের ওপর অর্শায় তবে আমি খ্রিস্টানই।'

কাঠের সিংহাসনে যে দেবদেবীর মূর্তিগুলো রয়েছে সেগুলো দেখিয়ে বললাম, 'তাহলে এই সব লক্ষ্মী-নারায়ণ-শিব—' বলতে বলতে চুপ করে গেলাম।

আমার মনোভাবটা যেন বুঝতে পারলেন ধীরেশের মা। বললেন, 'স্ত্রীকে সহধর্মিণী হতে হয় জানো তো?'

মনে মনে ভাবলাম, আদর্শ সহধর্মিণীই তো আপনি ছিলেন। শিশির বাসুর পছন্দ-অপছন্দ-রুচি মোট কথা তাঁর জীবনের সব কিছুই যে পরম নিষ্ঠায় আপনি অনুকরণ করে গিয়েছেন তা কি আর জানি না? মুখে অবশ্য বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্ত্রীকে সহধর্মিণীই তো বলে।'

ধীরেশের মা বলতে লাগলেন, 'আমি অবশ্য খ্রিস্টান বাপ-মায়ের সন্তান, কিন্তু আমার স্বামী হিন্দু। অবশ্য হিন্দুধর্মের কিছুই তিনি মানেন না। তাই বলে ধর্মটা ত্যাগও তো করেননি। স্বামীর ধর্ম স্ত্রীরও ধর্ম। সেটাই পালন করতে চাইছি।'

আশ্চর্য! ভদ্রমহিলা বলেন কি! সবিস্ময়ে বললাম, 'কিন্তু মা—'

'কী?'

'যতদূর মনে আছে, দশ বার বছর আগে ধীরেশবাবুর বাবার মতো ঠাকুর-দেবতা, ঈশ্বর-টিশ্বর আপনিও কিছু মানতেন না। তবে এমন কী ঘটেছে যাতে এ-সবের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন?'

পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ধীরেশের মা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি তো ধীরেশের খোঁজে এসেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাকে যদি খুঁজে বার করতে পার, তোমার এ-প্রশ্নের উত্তরটা বোধ হয়ে পেয়ে যাবে।'

আঠার

ধীরেশের মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাল বিকেল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে অনায়াসেই রাজেন মল্লিকের সন্ধানে যেতে পারতাম। কিন্তু যাইনি। ধীরেশের মায়ের অভাবনীয় পরিবর্তন বিচিত্র বিস্ময়ে কাল আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

আজ সকালে উঠে সাহানগর রোডে রওনা হলাম।

কাল ধীরেশের মা শুধু রাজেনের ঠিকানাই দেননি, কীভাবে সেখানে যেতে হবে তার নিখুঁত একটা নকশা আমার চোখের সামনে এঁকে দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী যেখানে এসে থামলাম সেটা সাদামাঠা, বৈশিষ্ট্যহীন একখানা দোতলা বাড়ি।

এখনও খুব ভাল করে সকাল হয়নি। অন্ধকার অবশ্য নেই। তবে শরৎকালের ঝলমলে রোদ কলকাতার এই দিগন্তে এসে পৌঁছতে পারেনি। অগুনতি বাড়ির জটলার ওপর দিয়ে তার রথ এখানে আসতে এখনও কিছু দেরি।

এ-বাড়ির মানুষজনের ঘুম ভেঙেছে কি? একটু ইতস্তত করে সদর দরজার কড়া নাড়লাম।

খানিক পর দরজা খুলে যে মুখোমুখি দাঁড়াল সে আমারই সমবয়সী। খুব বেশি হলে এক-আধ বছরের বড় হবে। পরনে শুধুমাত্র একটা লুঙ্গি। দু'চোখে খানিকটা ঘুম জড়িয়ে আছে। সারা শরীর ঘিরে শিথিল আলস্য। চেহারা? গড়পড়তা অন্য সব বাঙালির মতো। মুখ-নাক-হাত-পা—সবই তার সাধারণ। কোথাও বিশেষত্ব নেই। তবে চোখদু'টি কিন্তু অবাক করে দেবার মতো। পৃথিবীর সবটুকু সারল্য তাতে মাখানো।

একটা হাই তুলে লোকটি বলল, 'কাকে চান?'

'রাজেন মল্লিক কি এ বাড়িতে থাকেন?' আমি পালটা প্রশ্ন করলাম।

মুহূর্তে লোকটির মুখ চোখ থেকে শিথিল ভাবটা মুছে গেল। আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে বলল, 'হ্যাঁ, থাকে। আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'বোম্বাই থেকে।'

'বোম্বাই!'

'হ্যাঁ।'

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামটা—'

নাম বললাম।

কী ভেবে লোকটা বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

তার পিছু পিছু যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম সেটা বেশ বড়সড় একখানা ঘর। মাঝখানে গোলাকার একটা টেবল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার। পুব দিকের দেওয়ালে রামকৃষ্ণের ছবিওলা

কাপড়ের দোকানের ক্যালেন্ডার। দক্ষিণের দেওয়ালে কতকগুলো ফ্রেমে-বাঁধানো ফোটো ঝুলছে। খুব সম্ভব সেগুলো এ-বাড়ির মৃত পূর্বপুরুষদের।

ফ্রেমের কাচ দীর্ঘকাল পরিষ্কার করা হয়নি। ফলে ধুলোর পুরু আবরণের তলায় ফোটোর চেহারাগুলো ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট করে কিছু বুঝবার উপায় নেই।

অনেক কাল যে এ-ঘরে চুনকাম টাম হয়নি, তা অনায়াসেই টের পাওয়া যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে কালির ছাপ, হেলান দিয়ে বসার কারণে মাথার তেলের অসংখ্য দাগ। তা ছাড়া এ-কোণে সে-কোণে ঝুল আর পুরুষানুক্রমে মাকড়সাদের সংসার দেখা যাচ্ছে!

এ-বাড়ির মানুষ আর্থিক দিক থেকে কোন পর্যায়ে আছে, এই ঘরখানায় পা দেওয়ামাত্র টের পাওয়া যায়। বাড়িটা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের।

'মধ্যবিত্ত' শব্দটা এ-বাড়ির সঠিক পরিচয়নামা নয়। মধ্যবিত্তের মধ্যে তারতম্য আছে। সেই হিসেবে কেউ কুলীন, কেউ অন্ত্যজ। বর্ণে গোত্রে এ-বাড়িটা অন্ত্যজ না হলেও কুলীন কিছুতেই বলা যাবে না।

একটা চেয়ার দেখিয়ে লোকটি বলল, 'বসুন।'

আমি বসার পর সে-ও বসল। বলল, 'আপনি তো বোম্বাই থেকে আসছেন। তা এখানকার ঠিকানা পেলেন কেমন করে?'

কীভাবে পেয়েছি, বললাম।

শুনে সবিস্ময়ে লোকটি বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

সবিনয়ে বললাম, 'আমি রাজেনবাবুর কাছেই সব বলতে চাই।'

'আমার নামই রাজেন মল্লিক।'

'উৎসুক সুরে বললাম, 'আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'উপকার!' লোকটি অর্থাৎ রাজেন মল্লিক সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

রাজেনের বিস্ময় বিন্দুমাত্র কমল না। সে বলল, 'আমি আপনার কী উপকার করতে পারি!'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'শুনেছি ধীরেশ বাসু আপনার বন্ধু। মাসকয়েক আগে তিনি নাকি আপনার কাছে থাকতেন। এখন—'

আমার কথা শেষ হবার আগে রাজেন বলে উঠল, 'আপনি ঠিকই শুনেছেন। ধীরেশ আমার খুব ছেলেবেলার বন্ধু। বছর চারেক সে আমার কাছে ছিল। ছ'মাস হল এখান থেকে চলে গিয়েছে।'

'কোথায় গিয়েছেন, জানেন?'

'জানি।'

'দয়া করে তাঁর ঠিকানাটা যদি দেন, খুব উপকৃত হব। ধীরেশবাবুব ঠিকানার জন্যে সেই

বোম্বাই থেকে আমি আসছি।' কথাটার মধ্যে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন আছে। এক যুগ পর আমি বাংলাদেশে এসেছিলাম বিজলীর তাগাদায়। অবশ্য ধীরেশের জন্য আমার প্রাণে যে অপ্রতিরোধ্য একটা কৌতূহল ছিল, সেটা মিথ্যে নয়। বিজলী না পাঠালে আমি নিজেই হয়তো ধীরেশের সন্ধানে একদিন চলে আসতাম।

রাজেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঠিকানাটা দিল না। স্থির, দূরভেদী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। একভাবে তাকিয়ে থেকেই খুব আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'ধীরেশের ঠিকানা চাইছেন? কেন?'

এক যুগ আগে বর্ধমান জেলার সুদূর দিগন্তে একটি পুরুষ আর একটি রমণীকে ঘিরে জীবনের যে বিচিত্র জটিল নাটকটি শুরু হয়েছিল, পুরোপুরি তার উল্লেখ করলাম। তারপর কোন পাগলামির তাড়নায় ধীরেশকে খুঁজতে এসেছি, বললাম।

শুনে রাজেনের চোখদু'টো ঝকমকিয়ে উঠল। আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে সাগ্রহে সে বলল, 'ও, আপনি তাহলে শুশুরিয়ায় ছিলেন? ধীরেশের সব ব্যাপার জানেন দেখছি। বিজলীকেও চেনেন।'

'চিনি বইকি।' আমি হাসলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না রাজেন। অনেকক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে রইল। তারপর গাঢ় গভীর স্বরে বলল, 'জানেন, ওই বিজলীর জন্যে ধীরেশের জীবনটা একেবারে ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। কী ছিল সে, আর কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা যদি জানতেন!' মনে হল রাজেন যেন মুখোমুখি বসে নেই। অনেক, অনেক দূর থেকে বাতাসের স্রোত আশ্রয় করে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

আমার চমক লাগল। ধীরেশের মা-ও প্রায় এই রকমই একটা কথা বলেছিলেন, মনে পড়ল। বললাম, 'কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ধীরেশবাবু?'

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না রাজেন। তার সমস্ত সত্তার ওপর কী যেন ভর করে বসল। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে বলতে লাগল, 'শুশুরিয়া থেকে ধীরেশ আর বিজলী কলকাতায় চলে এসেছিল। তার পরের খবর কিছু জানেন?'

'জানি কিছু কিছু।'

'কী জানেন?'

বোম্বাইতে পার্শি কলোনির সেই মানবীর মুখে যা শুনেছিলাম, সব বলে গেলাম।

রাজেন বলল, 'আপনি যা শুনেছেন তা খুবই অল্প। অবশ্য বিজলীর সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটা ঠিকই আছে। তবে ধীরেশের এখনকার ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানেন না। তার সম্পর্কে আরও অনেক কথা আছে।'

রাজেনের প্রতিধ্বনি করে বললাম, 'আরও অনেক কথা!'

'হ্যাঁ।' রাজেন বলতে লাগল, 'বিজলী যেটুকু জানে, যেটুকু দেখেছে সেটুকুই মাত্র আপনাকে বলেছে। তার বাইরেও ধীরেশের আরেকটা জীবন ছিল।'

আমি এসেছিলাম ধীরেশের ঠিকানা জানতে। সে-কথা এই মুহূর্তে যেন ভুলে গেলাম। ধীরেশের অজানা জীবন আমাকে ক্রমাগত হাতছানি দিতে লাগল। বললাম, 'ধীরেশবাবুর সেই জীবনটার কথা আপনি জানেন?'

রাজেন বলল, 'নিশ্চয়ই জানি।'

উত্তর দিলাম না। রাজেনের মুখচোখ দেখে মনে হল, ধীরেশের সেই অজ্ঞাত, অশ্রুত জীবনের ওপর থেকে নিজের তাগিদেই সে যবনিকা তুলবে। তারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

যা অনুমান করেছিলাম তা-ই। একসময় রাজেন শুরু করল, 'আপনি তো জানেন, বিজলীকে কলকাতায় আনার পর খুব বেশি দিন নিজের কাছে রাখতে পারেনি ধীরেশ।'

বললাম, 'জানি।'

রাজেন বলতে লাগল, 'ধীরেশের জীবন থেকে হাউইয়ের মতো উড়ে গিয়েছিল বিজলী। দু'দিন এর কাছে, চারদিন ওর কাছে, দশ দিন তার কাছে, এই করে বেড়াচ্ছিল সে আর অসহায়ের মতো অবুঝের মতো ঘুরে ফিরে বার বার তার কাছে যেত ধীরেশ। বিজলীকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে চাইত সে। মেয়েটাকে সত্যি ভালবেসে ফেলেছিল। সে-ভালবাসায় ছলনা ছিল না। কিন্তু কী হল তাতে? বিজলীকে কিছুতেই ফেরাতে পারল না সে। তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল ধীরেশ। খেত না, ঘুমতো না, অফিস যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। দিনরাত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো শুধু ঘুরে বেড়াত।'

বললাম, 'এ-সব আমি জানি।'

রাজেন আমার কথা খেয়াল করল না বোধ হয়। আপন মনেই বলে যায়, 'আপনি হয়তো জানতেন না ধীরেশ আমার বাল্যবন্ধু।'

'আগে জানতাম না। একটু আগে সে-কথা আপনার মুখে শুনেছি।' আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম।

রাজেন বলল, 'হিন্দুস্থান রোডে ধীরেশদের বাড়ি দেখেছেন তো। ওর ডান পাশের বাড়িখানা ছিল আমাদের। ধীরেশ আর আমার ছেলেবেলাটা একসঙ্গে কেটেছে। এক স্কুলে আমরা পড়তাম। একসঙ্গে খেলাধুলো, বেড়ানো। শুধু স্কুলে কেন, কলেজেও দু-বছর একসঙ্গে পড়েছি। তারপর আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটল। বালিগঞ্জের সেই স্বর্গ থেকে নামতে নামতে সোজা চলে এলাম সাহানগরের এই পাতালে।' একটু থেমে রাজেন ফের শুরু করল, 'আমাদের কথা যাক। ধীরেশের কথা হচ্ছিল। তা-ই শুনুন।'

আমি চুপ করে থাকি।

রাজেন বলতে লাগল, 'একদিন অফিস থেকে রাসবিহারী-রসা রোডের ক্রসিংয়ে এসে বাস থেকে নেমেছি। হঠাৎ দেখি ফুটপাথের ওপর দিয়ে পাগলের মতো এলোমেলো পায়ে হাঁটছে ধীরেশ। চুল উস্কখুস্ক। মুখে মাসখানেকের দাড়ি। টাইয়ের ফাঁস খুলে একদিকে ঝুলে

পড়েছে। জামার পকেট ছেঁড়া। প্যান্টে ক্রিজ নেই। কতকাল যে সেটা ধোয়ানো হয়নি! তা ছাড়া শরীরটা একেবারে ভেঙে গিয়েছে। কণ্ঠার হাড় আর হাতের সব মোটা মোটা শিরাগুলো ফুটে বেরিয়েছে। আমি তো ধীরেশকে চিনতেই পারিনি। না-চেনার কারণ ছিল অনেক। প্রথমত, বহুকাল বাদে, মানে আমাদের বালিগঞ্জ থেকে চলে আসার পর সেই প্রথম তাকে দেখেছিলাম। দ্বিতীয়ত, ধীরেশ কী প্রকৃতির মানুষ, আমি জানতাম। পোশাক-পোশাক সম্বন্ধে ছিল দারুণ খুঁতখুঁতে। ছিল ভীষণ শৌখিন। একটা জামা একদিনের বেশি দু-দিন পরত না। ছেলেবেলা থেকেই চুলের এতটুকু হেরফের হতে দেখিনি কখনও। চিরদিনই সে ফিটফাট, স্মার্ট। তাকে এমন ছন্নছাড়ার মতো দেখব, কল্পনাও করিনি।'

একটু থেমে রাজেন আবার বলল, 'আমি তো ধীরেশের পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পরিচিত একখানা মুখের আদল মনে পড়তেই কি ভেবে ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই চেনা গিয়েছিল। আমি তো অবাক। বিস্ময় একটু কমলে পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'ধীরেশ না?'

'খুব মগ্ন হয়ে কী ভাবছিল সে। আমার প্রশ্নের উত্তরে অন্যমনস্কের মতো শুধু মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ সে ধীরেশই। আমি এবার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলাম, 'নিজের এ কী হাল করেছ?' ধীরেশ উত্তর দেয়নি। আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি। অন্যমনস্ক, উদাসীনের মতো আমাকে পেছনে ফেলে নিজের খেয়ালে হাঁটতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি। তারপর ছুটে গিয়ে ধীরেশের একখানা হাত ধরেছিলাম। বলেছিলাম, 'আমাকে চিনতে পারছ না? আমি রাজেন।' ধীরেশ মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, চিনেছে। ব্যাকুল স্বরে আমি জিজ্ঞেস করেছি, 'আজকাল কোথায় আছ? বালিগঞ্জের সেই বাড়িতেই নিশ্চয়?' ধীরেশ এবার কথা বলেছিল, 'আমি রাস্তায় থাকি।' বলেই চলে যাচ্ছিল। আমি যেতে দিইনি। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এতকাল পর যখন দেখা তখন স্বাভাবিক নিয়মেই দু-পক্ষের উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার কথা। আমার দিক থেকে আবেগ বা উচ্ছ্বাসের অভাব ছিল না। কিন্তু ধীরেশ একেবারেই নিস্পৃহ। আমার সমস্ত স্নায়ু ফিসফিসিয়ে যেন বলছিল, ধীরেশের জীবনে নিদারুণ কোনও বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। কী সেটা? যা-ই ঘটুক, আমি তার একখানা হাত ধরে বলেছিলাম, 'এস আমার সঙ্গে।' ধীরেশ বলেছিল, 'কোথায়?' বলেছিলাম, 'আমাদের বাড়িতে।' কী ভেবে ধীরেশ বলেছিল, 'তোমাদের বাড়িতে? বেশ, যাব। গেলে খেতে দেবে? জানো রাজেন, তিনদিন আমার খাওয়া হয়নি।'

'প্রথমটা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ব্যাকুলভাবে বলে উঠেছি, 'তুমি চল তো আগে।' তাকে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলাম। সেদিন আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি, খাইয়ে দাইয়ে ধীরেশকে শুইয়ে দিয়েছিলাম।' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করল রাজেন। খুব সম্ভব এরপর কী বলবে, মনে মনে সেটা গুছিয়ে নিতে লাগল। আমি উৎসুক হয়েই রইলাম।

একসময় রাজেন আবার আরম্ভ করল, 'পরের দিনও ধীরেশকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তার পরের দিনও না। ধীরেশও নিজের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানাল না। শুধু বলল, 'কয়েকটা দিন যদি তোমাদের বাড়ি থাকি, খুব অসুবিধে হবে?' পুরনো বন্ধুকে অনেক দিন পরে পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিলাম। তা ছাড়া, ধীরেশের এই অকল্পনীয় পরিবর্তন আমার কৌতূহলটাকে উসকে দিয়েছিল। বলেছিলাম, 'যে ক'দিন খুশি, থাকো। আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে তোমারই হয়তো খাওয়া-দাওয়া-আরামের ব্যাপারে অসুবিধে হতে পারে। এ-বাড়িতে পা দিয়ে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ, আমাদের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে।' ধীরেশ জানিয়েছিল, সে বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না।'

রাজেন একটানা বলে যাচ্ছে, 'ধীরেশ তো আমাদের কাছে থেকে গেল। কিন্তু বাড়িতে কতক্ষণ আর তাকে পাওয়া যেত! সকালবেলা সবার ঘুম ভাঙার আগেই সে বেরিয়ে যেত। ইচ্ছে হলে দুপুরে কোনওদিন খেতে আসত। বেশির ভাগ দিন আসত না। না স্নান, না খাওয়া—সারাটা দিন কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়াত, কে বলবে। অনেক রাতে ক্লান্ত হয়ে টলতে টলতে যখন সে ফিরে আসত তখন তার দিকে তাকানো যেত না। একটা সপ্তাহ এইভাবেই চলল। তারপর একদিন ধীরেশকে বললাম, 'কী হয়েছে তোমার?' ধীরেশ বলেছিল, 'কী হবে?' প্রথমেই যে-সংশয়টা আমার মনে ছায়া ফেলেছিল তার উল্লেখ করে বলেছিলাম, 'বাড়ির সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে চলে এসেছ?' ধীরেশ বলেছিল, 'না।' আমি বলেছিলাম, 'বিয়ে করেছ?' ধীরেশ জানিয়েছিল, 'না।' জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'চাকরি কর তো?' ধীরেশ বলেছিল 'হ্যাঁ।' প্রশ্ন করে করে জেনে নিয়েছিলাম, চাকরিটা তার অটুটই আছে। তবে কিছুদিন ধরে সে অফিসে যাচ্ছে না। বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে সে বেরিয়ে পড়ে নি। দ্বিতীয় যে আশঙ্কাটা করেছিলাম তা এইরকম। বিয়ে করে থাকলে স্ত্রীর সঙ্গে কোনও গোলমাল হয়তো হয়েছে। কিন্তু তা-ও না। তবে কী হতে পারে? আচমকা আমার মনে হয়েছিল, তবে কি কোনও সাঙ্ঘাতিক মানসিক আঘাত পেয়েছে ধীরেশ? ভাবলাম, এটাই সম্ভব। সরাসরি বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কোনও মেয়েকে তুমি কি ভালবেসেছ ধীরেশ? সে কি তোমাকে বিট্রে করেছে?' ধীরেশ উত্তর দেয়নি। স্তব্ধ একটা মূর্তির মতো নিষ্পলক সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল শুধু।'

রাজেন একটু থামল। পরক্ষণে ফের বলতে থাকে, 'ধীরেশের মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। নিজে থেকে সে কিছু বলছিলও না। এমনভাবে কিছুদিন চললে যে ছেলেটা মরে যাবে সে-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। সেই দিনই হিন্দুস্থান পার্কে ধীরেশদের বাড়ি ছুটেছিলাম। সেখানে ওর বাবা শিশির বাসুর মুখে বিজলীর কথা শুনেছিলাম। বিজলীকে নিয়ে বর্ধমান থেকে ধীরেশ কলকাতায় পালিয়ে এসে কী কী করেছে সে-সব শুনিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ফুল (fool)। গেঁয়ো একটা মেয়ের জন্যে নিজের জীবনটা একেবারে বরবাদ করে দিচ্ছে ইডিয়টটা। মেয়েদের কম্পানি যদি ভাল লাগে তবে এ-শহরে লটস অব বিউটিফুল গার্লস রয়েছে। তাদের কাছে যাওয়াই তো উচিত। এভাবে অফিস কামাই করে

হতচ্ছাড়ার মতো রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নাটুকেপনা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। দিস ইজ আটার মিনিংলেস, রাবিশ। তুমি তাকে একটু বুঝিও, এ-সব বাঁদরামি যেন ছাড়ে।' আমি বলেছিলাম, 'আমার কথা কি ধীরেশ শুনবে? আপনি যদি দয়া করে একবার আমাদের বাড়ি আসেন, ধীরেশকে একটু বোঝান, ভাল হয়। নইলে যেভাবে ও চলছে, একদিন মরে যাবে।' শিশির বাসু আসেননি। তিনি জানিয়েছিলেন, ধীরেশের মরাই উচিত। যে-ছেলে প্যানপেনে প্রেমের পেছনে নিতান্ত অকারণে জীবন নষ্ট করে দেয় তার পিতৃত্ব তিনি অস্বীকার করতে চান। তার বাপ হওয়া তাঁর পক্ষে লজ্জাজনক, অগৌরবের। শিশির বাসু আসেননি কিন্তু ধীরেশের মা এসেছিলেন। ছেলেকে অনেক বুঝিয়েছেন, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। ধীরেশ বাড়ি ফেরেনি। সে শুধু বলেছে, 'আমার বাড়ি যেতে ভাল লাগে না মা। গেলেই তো বাবা বিজলীর ব্যাপারে দিনরাত বকবক করবে। তা আমি সহ্য করতে পারব না।' অতএব ধীরেশ আমাদের বাড়িতেই থেকে গিয়েছে।'

'এইভাবে মাসকয়েক কেটে গেল। রোজ সকালে উঠে ধীরেশ কোথায় কার কাছে ছোটে, এর মধ্যে আমি তা জেনে ফেলেছি। বিজলীর কাছ থেকে হতাশ আর ব্যর্থ হয়ে সমস্ত দিনের শেষে যখন সে টলতে টলতে ফিরে আসত তখন তার ক্লান্ত করুণ বিষণ্ণ মুখখানার দিকে তাকানো যেত না। ধীরেশের মা দু-একদিন পর পর এসে ছেলেকে তো বোঝাতেনই। আমিও বোঝানো শুরু করলাম। ধীরেশকে বলতাম, 'বিজলী যখন তোমাকে চায় না তখন শুধু শুধু ওর পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছ কেন? কেন নিজেকে এভাবে ধ্বংস করছ? ও-সব তুমি ভুলে যাও। আবার সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে ওঠ।' আমিই শুধু বকবক করে যেতাম। ধীরেশ কিছুই বলত ন। আমার কথাগুলো শুনে তার মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হত কিনা সন্দেহ। অন্যমনস্কের মতো চুপচাপ বসে থাকত সে।'

বলতে বলতে রাজেন থামল। চোখ বুজে একটু ভেবে নিল। মনে হল, স্মৃতির মধ্যে কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তারপরেই আবার শুরু করল, 'অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে ধীরেশের দিন কেটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কাটল না। মনে পড়ে, একদিন ভোরবেলা বেরিয়ে গিয়ে সারাটা দুপুর আর বিকেল কোথায় কেথায় যেন কাটিয়ে সন্ধেবেলা ফিরে এসেছিল। আর এসেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। আমি তার আগেই অফিস থেকে ফিরে এসেছি। বললাম, 'কী হয়েছে ভাই, কাঁদছ কেন?' ধীরেশ মুখ থেকে হাত সরায়নি। ধরা ধরা, ঝাপসা গলায় বলেছিল, 'একটা পার্শি বিজনেসম্যানের সঙ্গে বিজলী আজ কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোথায় গিয়েছে?' ধীরেশ বলেছিল, 'দিল্লি।' মনে আছে, সারাটা রাত কেঁদেছিল ধীরেশ। তাকে কিচ্ছু খাওয়াতে পারিনি। শুধু সেই রাতটা কেন, তারপর দু'টো দিন না খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। তারপর কয়েকটা দিন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক শান্ত না, স্তব্ধ বলাই হয়তো ঠিক। বাড়ি থেকে বেরতো না। নিজের ঘরখানায় চুপচাপ

বসে বসে কী যেন ভাবত। তার ভাবনায় বিজলীর মুখখানাই যে ভেসে বেড়াত তা না বললেও চলে। ধীরেশের এই স্তব্ধতা আমার ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা ঘটবে। ভয়ঙ্কর, নিদারুণ কিছু। যা আশঙ্কা করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তা-ই হল।'

আমি ললিত চৌধুরি, এতক্ষণ আচ্ছন্নের মতো শুনে যাচ্ছিলাম। এবার বলে উঠলাম 'কী হল রাজেনবাবু?'

রাজেন বলল, 'চুপচাপ থাকতে থাকতে ধীরেশ এতটাই পালটে গেল যা কল্পনা করিনি অনেকদিন অফিসে না গেলেও চাকরিটা ছিল। বলা নেই কওয়া নেই, একদিন দুম করে সেটা ছেড়ে দিল। তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমস্ত সঞ্চয় তুলে নিয়ে একেবারে বেপরোয় মাতামাতি শুরু করল। ছেলেবেলা থেকেই আমি জানতাম, ধীরেশদের বাড়িতে ফ্যামিলি বার আছে। যৌবনের শুরু থেকেই ওদের ড্রিঙ্ক করার রেওয়াজ। ড্রিঙ্কের ব্যাপারে ওদের কোনও সংস্কার বা লুকোচুরি ছিল না। কিন্তু বিজলী কলকাতা থেকে চলে যাবার পর সে যা শুরু করল, আপনি তা চিন্তা করতে পারবেন না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপারটা কী জানেন—'

'কী?'

'ধীরেশকে রাস্তা থেকে ধরে যেদিন বাড়ি নিয়ে আসি সেদিন থেকে বিজলী কলকাত ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত কোনওদিন তাকে মদ খেতে দেখিনি। বিজলী যাওয়ার পর মদের মাত্রা অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দিলে সে। দিনরাত চুর হয়ে থাকত। শুধু কি তা-ই, মেয়েমানুষ নিয়ে রাক্ষুসে মত্ততা চালাল সেই সঙ্গে। দেখেশুনে আমি তো মশাই ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়ের কারণ এক-আধটা নয়, অনেক। প্রথমত, কাউকে এত ভয়ঙ্কর রকমের নেশা করতে আমি আগে দেখিনি। দ্বিতীয়ত, মদ আর মেয়েমানুষ সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে সাঙ্ঘাতিক সংস্কার আছে। মাতাল চরিত্রহীন বন্ধুকে আশ্রয় দেবার কৈফিয়ত হিসেবে বাড়ির লোকের কাছে কী বলব, সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তৃতীয়ত, ধীরেশ সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। আর কিছু নয়, যেভাবে সে চলছিল তাতে খুব বেশিদিন সে আর বাঁচবে কিনা, সেটাই ছিল চিন্তার ব্যাপার। দিনকয়েক দেখে শেষমেষ একদিন বলেই ফেললাম, 'এ তুমি কী শুরু করেছ ধীরেশ?' ধীরেশ অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসত আর বলত. 'দেখি না বিজলী কতদূর যেতে পারে আর আমি কতদূর?' কলকাতা থেকে উধাও বিজলীর সঙ্গে আত্মহত্যার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল সে।'

আমি ললিত চৌধুরি শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, 'তারপর?'

রাজেন বলল, 'তারপর আর কি। ধীরেশের মত্ততা যত বাড়ছিল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার ভয়ও বাড়ছিল। একদিন তাকে বললাম, 'দেখো ভাই, তুমি যা করছ আর যেভাবে চলছ তাতে বাড়ির লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না।' আমার বলার পেছনে দু'টো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমটা যা বলেছি তা-ই। দ্বিতীয়টা অন্যরকম। আমার পারিবারিক অসুবিধার

কারণে সে যদি মদ-মেয়েমানুষ ছাড়ে। প্রথম উদ্দেশ্যটা বুঝল ধীরেশ। দ্বিতীয়টা বুঝল না। বললে, 'বেশ. মুখ যদি দেখাতে না পার তা হলে আর বিব্রত করব না। এখান থেকে চলেই যাব।' আমি কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'তোমাকে যেতে তো বলিনি। শুধু একটু সামলে চলতে বলেছি।' ধীরেশ আমার কথা শুনল না। সত্যি সত্যিই চলে গেল। কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারলাম না।'

বললাম, 'আপনাদের বাড়ি থেকে চলে গিয়ে কী করলেন ধীরেশবাবু?'

শিথিল সুরে রাজেন বলল, 'কী আবার করবে? আরও রেকলেস, বেহেড হয়ে পড়ল। মদ আরও বাড়িয়ে দিলে। চৌরঙ্গির 'বার'গুলোতে তো যেতই, তা ছাড়া এখানে সেখানে, শুঁড়িখানায়, দিশি মদের দোকানে, তাড়ির দোকানেও হানা দিত। মেয়েমানুষেরও বাছ-বিচার রইল না। যেদিন যাকে পেত তাকে নিয়েই মেতে উঠত।' একটু থেমে রাজেন বলতে লাগল, 'আমাদের বাড়ি থেকে ধীরেশ যাবার পর মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অফিসে ছুটি নিয়ে আমিও ওর পেছনে ছুটলাম, কিন্তু বৃথা। ধীরেশকে ফেরাতে পারলাম না।'

'পারলেন না?'

'না। তবে এই সময় মিরাকেলের মতো একটা ব্যাপার ঘটল।'

'কী।'

রাজেন উত্তর দিল না। লক্ষ করলাম, তার চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করছে। মুখটা চকচক করছে। আশ্চর্য গভীর স্বরে একসময় সে বলে উঠল, 'জানেন, উন্মাদের মতো মেয়েদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে লীলা বলে একটা মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিল ধীরেশ। মেয়েরা ছিল তার নিশিসঙ্গিনী মাত্র। এক রাত্রির বেশি ওদের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকত না। কিন্তু এক রাতেই লীলার সঙ্গে হিসেব চুকেবুকে গেল না। ফাঁদে পড়ে গেল ধীরেশ।'

আমি চকিত হয়ে উঠলাম, 'ফাঁদে পড়ে গেল!'

'হ্যাঁ।' রাজেন মাথা নাড়ল।

'কিরকম?'

একটু থেমে রাজেন আবার শুরু করল।

'লীলার কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে আশ্চর্য পরিবর্তন শুরু হল ধীরেশের। মদের মাত্রা কমতে কমতে একদিন ছেড়েই দিলে সে। রাক্ষুসে মত্ততার পর অদ্ভুত এক অবসাদ তাকে একটু একটু করে গ্রাস করছিল। আর এরই মধ্যে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল ধীরেশ। সে জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। শুনে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ধীরেশের সেই কাজের জন্যে তার বাবা শিশির বাসু কী করেছিলেন জানেন?'

'কী?'

'খেপে গিয়ে তাঁর সমস্ত প্রপার্টি থেকে ছেলেকে বঞ্চিত করেছেন। সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। এবং এই সব সিদ্ধান্তের কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র করে দিয়েছেন।'

আমি, ললিত চৌধুরি, প্রথমটা বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'এমন কী করেছিলেন ধীরেশবাবু যে তাঁর বাবা এভাবে বঞ্চিত করলেন?'

কী একটু ভেবে বিচিত্র হাসল রাজেন। বলল, 'একটা মানুষকে আবিষ্কার করতে অনেক কষ্ট করেছেন আপনি। আরেকটু করতে হবে। ধীরেশের মিস্ট্রির যবনিকা আমি তুলব না। আপনাকেই সেটা তুলতে হবে। লীলার ঠিকানা দিচ্ছি। তার কাছে গেলেই সব জানতে পারবেন।'

লীলার ঠিকানা লিখে আমাকে দিল রাজেন। দেখেই বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। ঠিকানাটা বিখ্যাত এক পতিতাপল্লির।

উনিশ

লীলার ঠিকানায় যাব কি যাব না, সেটা স্থির করতে দু'টো দিন কেটে গেল। গণিকাপল্লি সম্বন্ধে চিরদিনই আমার কপালে নিষেধের ফোঁটা পরানো আছে। আর আছে নিদারুণ একটা সংস্কার।

হ্যারিসন রোডের হোটেলে বসে আজন্মের সংস্কারটার সঙ্গে দু'দিন যুদ্ধ করলাম। আরব সাগরের কূল থেকে যোজন যোজন পাড়ি দিয়ে এতকাল পর বাংলাদেশে এসেছি একটি মানুষকে খুঁজে বার করতে। সে-জন্য অনেক দূর এগিয়েছিও। এতটা এগিয়ে একটুখানির জন্য ফিরে যাব? আমার মন, আমার সমস্ত অস্তিত্ব বলল, না—কিছুতেই না।

অতএব, তৃতীয় দিন দুপুরে পায়ে পায়ে উত্তর কলকাতার সেই কামিনী পাড়াটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বড় রাস্তা থেকেই সাপের মতো সরু সরু অগণিত গলি পাক খেয়ে ভেতর দিকে চলে গিয়েছে। কোথায় কোন অজানা রহস্যময় পাতালপুরীতে সেগুলো পৌঁছেছে, কে বলবে। এখন দুপুর। শরৎ-শেষের সোনালি আলোয় কলকাতা এই মুহূর্তে ভেসে যাচ্ছে। তবু আমার মনে হল, কামিনীপাড়ার ওই গলিগুলোতে যেন আলো নেই। কোন অনাদি অতীত থেকে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার যে ওখানে স্তরে স্তরে জমে আছে, কে বলবে।

কামিনীপাড়া আমার কাছে নিষিদ্ধ জগৎ। তার অন্তঃপুরে পা বাড়াতে গিয়েও পারছি না। সারা শরীর ছম ছম করে উঠছে। অনুভব করছি, বুকের ভেতর অবিরত দুমদাম হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে। সেই আওজায় শুধু বুকের মধ্যেই বন্দি নেই। সেখান থেকে সমস্ত সত্তার মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

আগেই স্থির করে এসেছিলাম, লীলার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু কামিনীপাড়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভেতরে পা বাড়াব কি বাড়াব না, এই দ্বিধার মধ্যে কতক্ষণ যে দোল খেলাম, খেয়াল নেই।

না, এতদূর এসে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত চোখ-কান বুজে প্রায় মরিয়া হয়েই এক ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

দু'পাশে পুরনো আমলের সারিবদ্ধ সব বাড়ি। বেশির ভাগই তিনতলা, দোতলাও অবশ্য আছে।

বাড়িগুলো কেমন যেন। দোতলা তিনতলার বারান্দাগুলো টিনের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দরজা-জানালা একটাও খোলা নেই। রাস্তা থেকে অন্দর মহলের কোনও অংশই চোখে পড়ে না। বাইরের সূর্যালোক কখনও বাড়িগুলোর ভেতর ঢুকেছে কি না, কে বলবে। সব মিলিয়ে দমচাপা প্রকাণ্ড খাঁচা বলে মনে হয়।

বাড়িগুলোর নিচের তলায় কোথাও পান-বিড়ি-সোডার দোকান, কোথাও তেলেভাজা-ঘুগনির দোকান, কদাচিৎ দু-একটা সোনা রূপোর গয়নার দোকান।

এই নিঝুম, অলস দুপুরে খদ্দেরের আনাগোনা তেমন নেই। সুযোগ বুঝে পান-বিড়ির দোকানদারেরা একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে। গয়নার দোকানেও আলস্যের ঘোর লেগেছে। শুধু বিশ্রাম নেই তেলেভাজা-ঘুগনির দোকানগুলোতে। সেখানে অতিরিক্ত ব্যস্ততা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেকচিতে টগবগ করে বড় মটর ফুটছে। তৈরি হয়ে গিয়েছে টকটকে লাল কাঁকড়ার ঝাল আর খোসাসুদ্ধ চিংড়ির চপ। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে মটরগুলো ঘুগনিতে পরিণত হবে। তারপর রাত যত বাড়বে ফট ফট করে সোডার বোতলের ছিপি খুলবে, সেই সঙ্গে দিশি মদের উত্তম চাট হিসেবে কাঁকড়ার ঝাল, চিংড়ির চপ আর ঘুগনির হাঁড়ি নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ-সব তথ্য আমার চোখে দেখা নয়। কোনও এক বাস্তবধর্মী ঔপন্যাসিকের লেখায় এরকম একটা বর্ণনা পড়েছিলাম।

এখন, এই দুপুরে কুহকিনীদের এই জগৎটা ঘোর নিশুতিপুর। কোথাও কোনও শব্দ নেই। রাস্তাগুলো একেবারে নির্জন। কদাচিৎ দু-একটি মানুষ চোখে পড়ে কি পড়ে না। অবশ্য শব্দ একেবারে যে নেই, তা নয়। কোনও কোনও বাড়ির ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ঘুঙুরের বোল ভেসে আসছে। এরই মধ্যে আসন্ন রাত্রির প্রস্তুতি শুরু হযে গিয়েছে নাকি?

দু'পাশে সারিবদ্ধ বাড়ি। মাঝখান দিয়ে বুকচাপা গলির পর গলি।

পেটের ভেতরকার নাড়িভুঁড়ির মতো একটার সঙ্গে আরেকটা জড়ানো। হঠাৎ মনে হল, গোলকধাঁধায় এসে পড়েছি। মনে হল, এর ভেতরে একবার যখন ঢুকেছি আর বেরোতে পারব না।

পরিচিত কারও পক্ষে এখানে আমাকে দেখে ফেলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, এ-শহরে আমার জানাশোনা আছেই বা কে? এক আছে দাদারা। দশ বার বছর পর তাদের সঙ্গে আদৌ যদি দেখাও হয়ে যায়, আমাকে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ।

এ-শহরে আমি আজ অপরিচিত আগন্তুক। তবু ভাল করে দু'চোখ তুলে কোনও দিকে তাকাতে পারছি না। চোখমুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

পান বিড়ির দোকানে, তেলেভাজা-ঘুগনির দোকানে জিজ্ঞেস করে করে আর দু'পাশের বাড়িগুলোতে টক্কর খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত লীলার ঠিকানায় এসে পৌছলাম।

বাড়িটা দোতলা। চারপাশের অন্য সব বাড়ির মতো এটাও খাঁচা বিশেষ। বিশেষত্ব কিছু আছে। এ-বাড়িটার নিচের তলায় দোকান পশার নেই। জানালা-টানালাগুলো যথারীতি বন্ধ। চারদিকে আতিপাঁতি করে খুঁজেও এমন কাউকে দেখতে পেলাম না যাকে জিজ্ঞেস করতে পারি লীলা এ-বাড়ির কোন ঘরে থাকে।

সদর দরজাটা অবশ্য খোলাই রয়েছে। তার ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গের মতো একটা পথ সোজা গিয়ে দোতলার সিঁড়িতে মিশেছে। টুক করে আমি অবশ্য বিচিত্র রহস্যময় সেই অন্তঃপুরে ঢুকে যেতে পারি। কিন্তু পারলাম না। মনে হল, পেরেক ঠুকে কেউ আমার পা দু'টো রাস্তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। পিছুও যে ফিরব, সাধ্য কি। বিপন্নের মতো, অজগরীর আকর্ষণে সম্মোহিত কোনও প্রাণীর মতো সদর দরজাটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পর মনে নেই, তীক্ষ্ণ শাণিত গলার ডাকে আমার সমস্ত অস্তিত্ব চকিত হয়ে উঠল। স্বরটা যে কোনও মধ্যবয়সিনীর, শোনামাত্রই অনুমান করতে পারলাম। সেটার সঙ্গে রন্‌রনে ধাতব একটা রেশ মেশানো।

চমকে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু না, কাউকেই দেখতে পেলাম না।

একটু পর দোতলার সিঁড়ি বেয়ে মেয়েমানুষটির আমার সামনে এসে দাঁড়াল। যা অনুমান করেছিলাম, বয়সের দিক থেকে মেয়েমানুষটি জীবনের আধাআধি পার করে দিয়েছে। মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো। চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ। কেমন একটা সতর্ক শিকারি ভাব রয়েছে তাতে। জগতের কোনও কিছু তার চোখদু'টি যেন বিশ্বাস করতে জানে না। দু'টো দাঁত সোনায় বাঁধানো, বাকিগুলো পান-দোক্তার কষে মীনে-করা।

শরীরের দিক থেকে মেয়েমানুষটি বিশাল চর্বির ঢিবি। এই মুহূর্তে গায়ে তার জামা-টামা নেই। একটা শাড়ি আলগাভাবে সর্বাঙ্গে জড়ানো রয়েছে মাত্র।

তীব্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। আগের মতোই শাণিত গলায় বলে উঠল, 'কাকে চাই বাছা?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'লীলা বলে একটি মেয়ে এ-বাড়িতে থাকে?'

'থাকে।'

'তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কেন?'

'বিশেষ দরকার আছে।'

মুখ মচকে অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গি করে মেয়েমানুষটি বলল, 'বিশেষ দরকার আবার কি! একটা দরকারেই মানুষ এখেনে আসে। কিন্তু তার সময় তো এখন নয়। সে তো সন্ধের পর।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলাম। ধমনী থেকে সমস্ত রক্ত লাফ দিয়ে আমার মুখে উঠে এল। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলাম। কথা বেরলো না। অব্যক্ত গোঙানির মতো খানিকটা আওয়াজ হল মাত্র।

মেয়েমানুষটি বিরক্ত স্বরে আবার বলে উঠল, 'সারা রাত্তির তো হুজ্জুতে হুজ্জুতে কাটে। এই দুফুরবেলা জিরুবার সময়। সবাই একটু ঘুমুবে তা নয়, উনি এলেন দরকার নিয়ে। আচ্ছা ভ্যালা মানুষের ছেলে যা হোক। এখন যাও দিকিন। সন্ধের পর ব্যবসাপত্তর শুরু হলে এসো।'

গলার ভেতর থেকে স্বরটাকে মুক্ত করে কাকুতি মিনতি করতে লাগলাম, 'অনেক দূর, সেই বোম্বাই থেকে আসছি। লীলার সঙ্গে দেখা করতে না পারলে আমার বড্ড ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'ভ্যালা রে ভ্যালা।' মেয়েমানুষটি ঝাঁজিয়ে উঠল, 'তুমি তো ভারি জ্বালাতন বাধালে বাছা। ভাল কথায় যাবে, না কি কেষ্টবুলি ধরব?'

ফিরে যাবার জন্য আসিনি। অথচ মেয়েমানুষটি যা বলল তাতে অন্তরাত্মা চমকে উঠেছে। দিনদুপুরে পতিতাপল্লির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বর্ষীয়সী গণিকার খিস্তি শিরোধার্য করাটাকে যারা সৌভাগ্য বলে মানে, আমি সে-দলের নই। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত সিরসিরিয়ে নেমে গেল।

আমি প্রায় দিশেহারা। বিভ্রান্তের মতো মেয়েমানুষটিকে কী বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে অমোঘ মুষ্টিযোগটির কথা মনে পড়ে গেল। নিঃশব্দে পকেট থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট বার করে তার হাতে গুঁজে দিতে দিতে বললাম, 'লীলার সঙ্গে দেখা না করলে ভারি মুশকিল হবে। বলছিলাম কি—'

এবাব মন্ত্রের মতো কাজ হল। টাকা সম্বন্ধে কোনওরকম মন্তব্য করল না মেয়েমানুষটি। নিতান্ত উদাসীনের মতো নোটখানা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'তাই তো বলি খুব জরুরি কাজ না থাকলে এই দুক্কুরবেলা তেতেপুড়ে কেউ কি লোকের কাছে আসে?'

লক্ষ করলাম, মেয়েমানুষটির গলায় একটু আগের উগ্রতা বা ঝাঁজ, কিছুই নেই। স্বরটা এখন ভারি কোমল শোনাচ্ছে। চোখেমুখে ভিনভাবের খেলা শুরু হয়েছে। একখানা পাঁচটাকার নোট যে এত বড় ভেলকি দেখাতে পারে, জানতাম না।

মেয়েমানুষটি আবার বলে উঠল, 'এসো বাছা, আমার সঙ্গে এসো।' তার চোখমুখ এবং কণ্ঠস্বর থেকে সুধা উপচে পড়তে লাগল।

নীরবে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

যেতে যেতে মেয়েমানুষটি বলতে লাগল, 'এ-বাড়িতে পঁচিশটা মেয়ে। তাদের দেখেশুনে রাখতে হয় আমাকে। বিপদে আপদে রক্ষে করতে হয়। আমি তাদের বাড়িউলি মাসি। বুঝতেই পারছ বাছা, ভাল-মন্দ কত রকমের লোক এখেনে আসে। কার পেটে কী মতলব তা তো বাইরে থেকে আঁচ করা যায় না। তাই সাবধানে থাকতে হয়। তোমায় হয়তো দু-চারটে কড়া কথা কয়েছি। সে জন্যে মনে রাগ পুষে রেখো নি বাবা।'

বুঝলাম, পাঁচটাকার নোটখানা তার সমস্ত উগ্রতাকে ভিজিয়ে একেবারে কাদা করে ছেড়েছে। একটু আগে আমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছিল। এখন তারই কৈফিয়ৎ পেশ

করছে সে। আরও বুঝলাম, তার সতর্ক রক্ষণাবেক্ষণে এ-বাড়ির পাঁচিশটি দেহপসারিনি থাকে। সে তাদের রক্ষয়িত্রী। যকের মতো তাদের পাহারা দিয়ে চলেছে। এ-অঞ্চলের পরিভাষায় সে মাসি।

মেয়েমানুষটি থামেনি। সমানে বকে যাচ্ছে, 'বয়েস অবিশ্যি আমার হয়েছে। তাই বলে চোখের মাথা তো খেয়ে বসিনি। তোমায় দেখেই কিন্তু চিনতে পেরেছিলুম, তুমি ভাল মানষের ছেলে। তবু এট্টু বাজিয়ে নিচ্ছিলুম। যাচিয়ে বাজিয়ে না নিলে কি চলে?'

কী উত্তর দেব, ভেবে পেলাম না।

বকবক করতে করতে একসময় দোতলার একটা ঘরের সামনে এসে মেয়েমানুষটি থামল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। রুদ্ধদ্বারের কড়া নেড়ে সে ডাকতে লাগল, 'লীলা, অ লীলা—'

মেয়েমানুষটি ডাকছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আমি ঘামতে লাগলাম। বিচিত্র নেশার ঘোরে একটি মানুষের সন্ধানে এই নিষিদ্ধ জগতে এসে পড়েছি ঠিকই। পাঁচটা টাকার বদলে এ-বাড়িতে ঢোকার ছাড়পত্রও পেয়ে গিয়েছি। তবু চিরদিনের সংস্কারটা বুকের ভেতর নিদারুণ তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে! হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠেছে।

এদিকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে ঘুম-জড়ানো গলা ভেসে এল, 'কে?'

'আমি লো ছুঁড়ি, আমি। কতক্ষণ ধরে ডেকে মরছি। দোর খোল।'

'কেন, কী দরকার? এই মাত্র শুয়েছি, চোখ দু'টো সবে লেগে এয়েচে—'

'কেন, কী দরকার—এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কৈফোৎ দাও। আর দেরি করিসনি বাপু, দোর খুলে দ্যাখ—'

অতএব দরজা খুলে গেল এবং যে-মেয়েটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল তাকে দেখে খানিকটা থতিয়েই গেলাম। মেয়েটি শ্যামাঙ্গিনী। রূপসী তাকে বলা যায় না হয়তো। তবে স্নিগ্ধ একটি লাবণ্য তার সর্বাঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে। কোঁকড়া কোঁকড়া আ-বাঁধা চুলের পটে পানপাতার মতো মুখ। ঘন পালকে-ঘেরা দীর্ঘ চোখ। চিবুকটি খাঁজ খাওয়া। পাতলা ঠোঁট দু'টি শক্তবদ্ধ।

সব চাইতে আশ্চর্য তার বেশভূষা। কনুই পর্যন্ত ব্লাউজের হাতা। শাড়ির ঝুল এত নেমে এসেছে যাতে পায়ের পাতা দেখা যায় না। এ-পাড়ার মেয়েদের চোখের চাউনি, মুখের ভাব আর সাজসজ্জা সম্বন্ধে অসংখ্য কথা শুনেছি। শুনে শিউরে উঠেছি। কিন্তু এই মেয়েটির চোখেমুখে বা পোশাকের কোথাও অশালীনতার চিহ্নমাত্র নেই।

দেহের মূলধন ভাঙিয়ে লীলার প্রাণধারণ। সেটাই তার জীবিকা! কিন্তু লীলার দিকে তাকিয়ে সে-কথা ভাবতে সাহস হয় না। কুলে-শীলে আর প্রতিষ্ঠায় যারা সমাজের শীর্ষে বসে আছে তেমন একটি সংসারেই যেন তাকে মানায়। এই নরকে নয়।

ঘুম ভাঙাবার জন্যই বোধ হয় বিরক্ত একটি ভ্রূকুটি ফুটে ছিল লীলার মুখে। সে বলল, 'কী ব্যাপার, এত ডাকাডাকি কেন?'

সেই মেয়েমানুষটি আমাকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'এই ভালমানষের ছেলে এয়েচে তোর কাছে। কী যেন দরকার আছে।'

'তুমি তো জানোই, রাত্তির ছাড়া আমি নরক ঘাঁটি না। এখন তোমরা যাও, আমি এট্টু ঘুমুই।'

মেয়েমানুষটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'কথা শোন ছুঁড়ির। খদ্দের হল গে নক্ষ্মী, নিজে যেচে এয়েচে। তাকে কিনা পায়ে ঠেলচে!'

শুনতে শুনতে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসছিল। ওদিকে মধ্যবয়সিনীর কথার জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল লীলা, তার আগেই বলে উঠলাম, 'দেখুন, কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি। ক'টা কথা শুধু আপনাকে জিজ্ঞেস করব। তার বেশি কিছু নয়।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমাকে খুঁটিয়ে দেখল লীলা। আমার মুখের রেখায় কী পড়ল, সে-ই জানে। ঈষৎ নরম সুরে এবার বলল, 'আসুন—'

আমি লীলার ঘরে পা দিতেই মাসি চলে গেল।

ঘরে ঢুকতেই আমার সমস্ত স্নায়ু জুড়িয়ে গেল যেন। এক কোণে খাটের ওপর ধবধবে বিছানা। শিয়রের কাছে ছোট টেবলে খানকয়েক বই সাজানো। দূর থেকে কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মনসামঙ্গল, পদ্মপুরাণ আর কি আশ্চর্য, নাম-করা লেখকদের গ্রন্থাবলী— এইগুলোই মাত্র চিনতে পারলাম। ডান দিকের দেওয়ালে মহাপুরুষদের খানকতক ছবি টাঙানো। বাঁ দিকে কালীর একটি পটের সামনে ধূপদান, শাঁখ, পশমের আসন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এক প্রান্তে সুদৃশ্য একখানা ড্রেসিং টেবল। তার ওপর চীনামাটির ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

কে বলে আমি পতিতালয়ে এসেছি! জগতের প্রতিটি গৃহপিপাসু মানুষ এরকম একটি ঘরেরই বুঝি ধ্যান করে থাকে, কিন্তু পায় আর ক'জন?

তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিক দেখছিলাম। এদিকে খাটের তলা থেকে কখন যেন একটা বেতের মোড়া বার করে আমার সামনে পেতে দিয়েছে লীলা। ঘর দেখতে দেখতে তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলে উঠল, 'বসুন।'

বসলাম। লীলাও একটু দূরে মেঝের ওপর বসল। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর সে-ই বলল, 'নিন, কী জিজ্ঞেস করবেন করুন।'

কীভাবে এই ঘর পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছি তা শুধু আমিই জানি। ভয়ে-সঙ্কোচে আর আজন্মের সেই সংস্কারে গলা শুকিয়ে একরাশ ধারাল বালির মতো খরখরে হয়ে উঠেছে। বললাম, 'করছি। তার আগে একটু জল খাব।'

ঘরের এক কোণে একটা কুঁজো থেকে কাচের গেলাসে জল নিয়ে এল লীলা। এক চুমুকে জলটুকু শেষ করে ফেললাম।

খালি গেলাসটা আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে নিতে লীলা বলল, 'চা খাবেন?'

এখানে জৈব প্রবৃত্তির তাড়া খেয়ে যে-সব আদিম পশুরা হানা দেয় আমি যে সে দলের নই, খুব সম্ভব লীলা তা বুঝেছে। সেই জন্যই কি আপ্যায়নের এই ঘটা? তাকে জানালাম চায়ের দরকার নেই।

লীলা এবার বলল, 'একটু শরবৎ করে দেব?'

'না না, ও-সব ঝামেলা করতে হবে না।'

লীলা এরপর আর কিছু বলল না। শুধু উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কেন এসেছি, সেটাই এবার জানতে চায় সে।

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললাম না। লীলার কথাই ভাবছিলাম। এখানে, উত্তর কলকাতার এই প্রান্তে নরকের মেলা সাজানো। তবু মেয়েটার মধ্যে কোথায় যেন আশ্চর্য শুচিতা রয়েছে। সেটা তার চলায় ফেরায় কিংবা মুখের কোনও রেখায়, নাকি চোখের স্থির চাউনিতে, প্রথম পরিচয়ে তা ধরা পড়ে না। সেটা নিতান্তই অনুভবের ব্যাপার। চারদিকের নরকের অনেক ঊর্ধ্বে লীলার পবিত্রতা অনেকখানি দীপ্তি নিয়েই বুঝি ঝলমল করছে। এখানকার ঘিনঘিনে পরিবেশ তার নাগাল পায়, সাধ্য কী।

অনেকক্ষণ পর মৃদু স্বরে লীলা বলে উঠল, 'কী ভাবছেন অত?'

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'কিছু না। কী আবার ভাবব?'

লীলা এবার আমাকে মনে করিয়ে দিল, 'কী জিজ্ঞেস করতে যেন আমার কাছে এসেছিলেন—'

বললাম, 'একটি লোকের ঠিকানা জানতে চাই।'

'ঠিকানা!'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'কার বলুন তো?'

'ধীরেশ—ধীরেশ বাসু নামে এক ভদ্রলোকের।'

লক্ষ করলাম, নামটা শোনামাত্র মুখচোখ এবং সর্বাঙ্গের ওপর দিয়ে বিচিত্র চমক খেলে গেল লীলার। আস্তে আস্তে গাঢ়, গভীর গলায় সে বলল, 'ধীরেশ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ধীরেশ।' সাগ্রহে অনেকখানি ঝুঁকে বললাম, 'শুনেছি, আপনার কাছে নাকি প্রায় রোজই আসত সে।'

'হ্যাঁ, আসত। কিন্তু আপনি কে?' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল লীলা।

প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলাম। তারপর মরিয়া হয়ে বললাম, 'আমার নাম ললিত চৌধুরি। বোম্বাইতে থাকি। ধীরেশ আমার বন্ধু। বিশেষ একটা দরকারে তাকে খুঁজতে এসেছি। ওকে আমার পেতেই হবে।'

লীলা এবার আর কিছু বলল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সেইভাবেই রইল। আমার চোখ তার মুখের ওপর নিবদ্ধ ছিল। দেখলাম, সেখানে ভাবান্তরের খেলা চলছে। চোখের পাতা দু'টি তার স্থির। ওপরের একটি দাঁত নিচের ঠোঁটে গেঁথে বসেছে। গলার কাছটা অল্প অল্প কাঁপছে। আর সমস্ত মুখখানা আলোয়-আঁধারে আর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় মেশামেশি হয়ে অচেনা মনে হচ্ছে। একটু আগে দরজা খুলে ঘুমজড়িত বিরক্ত মুখে যে-মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, এ যেন সে নয়।

একসময় লীলা বলতে শুরু করল, 'আপনার বন্ধু ওই ধীরেশবাবু আশ্চর্য মানুষ।'

'আশ্চর্য মানুষ!' কিছুটা অবাকই হলাম।

'হ্যাঁ।' মাথা সামান্য হেলিয়ে লীলা বলল, 'বছর বারর মতো এই নরকে পড়ে আছি। রোজ রাত্তিরে কত রকমের মানুষ আসছে কিন্তু আপনার বন্ধুর মতো এমন লোক আগে আর দেখিনি।'

উত্তর না দিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

লীলা আপন মনে বলতে লাগল, 'প্রথম যেদিন ধীরেশবাবু এসেছিল সেই দিনটার কথা আমার খুব মনে পড়ে। জীবনে কখনও সে-কথা ভুলব না।'

এরপর ধীরেশ সম্পর্কে যে বিস্ময়কর কাহিনী সে বলে গেল, সংক্ষেপে এইরকম।

প্রথম দিন ধীরেশ এসেছিল ভোরের দিকে। মদের নেশায় চুর হয়ে, টলতে টলতে। দাঁড়াবার মতো অবস্থা তখন তার নয়। এসেই লীলার দরজায় ক্রমাগত লাথি মারতে শুরু করেছিল।

তার একটু আগে রাতের শেষ খদ্দেরটি লীলার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। দরজা খুলে কর্কশ সুরে সে বলেছিল, 'কী চাই?'

মাতাল হলেও চেতনার একটু তলানি তখনও বুঝি অবশিষ্ট ছিল ধীরেশের। নিষ্ঠুর বিদ্রূপে ঠোঁট দু'টো বেঁকে গিয়েছিল তার। ভেংচে উঠে বলেছিল, 'কী চাই, বোঝো না! তোমার কাছে গীতাপাঠ শুনতে এসেছি?' বলেই ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

দু'হাতে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে ছিল লীলা। বলেছিল, 'এখন হবে না। ফিরে যান।'

'মাইরি আর কি। ফিরে যাবার জন্যেই যেন এসেছি! ইয়ারকি করো না, ভেতরে যেতে দাও।'

'এ-সময় আমি কাউকে ভেতরে ঢোকাই না।'

নেশায় ধীরেশের চোখ ছিল আরক্ত। সে দু'টো পুরোপুরি মেলে রাখতে পারছিল না। বার বার জুড়ে যাচ্ছিল। হাত দিয়ে চোখ দু'টো জোর করে খুলে কাছে এসে অবাক হবার ভান করে সে বলেছিল, 'ওরে বাবা, এ যে সীতা সাবিত্রী! উঁহু, মনে হচ্ছে চার্চ থেকে 'নান্' মাসি এসে হাজির হয়েছে।'

লীলা উত্তর দেয়নি।

মাতালের জড়িত গলায় ধীরেশ আবার বলে উঠেছিল, 'পথ ছাড় মাইরি। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। পা ভীষণ টলছে। এ-অবস্থায় কোথায় যাব?'

কঠিন মুখে লীলা বলেছিল, 'যে ভাগাড়ে খুশি।'

'এখন তোমার ঘরটা ছাড়া আর কোনও ভাগাড়ের কথা ভাবতে পারছি না। বল, কত চাও।'

'বললাম তো, ভোর হলে আমি কাউকে ঘরে ঢুকতে দিই না। হাজার টাকা দিলেও না।'

লীলার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কঠোরতা ছিল যাতে সেই অবস্থাতেও খানিকটা থতিয়ে গিয়েছে ধীরেশ। হাজার টাকার প্রলোভন উপেক্ষা করার অনমনীয়তা যে পণ্যা স্ত্রীলোকটির মধ্যে রয়েছে সেই লালীকে রক্তাভ ঢুলুঢুলু চোখে বিশ্লেষণ করতে চাইছিল সে। ভেতরে ভেতরে বোধ হয় খুব খানিকটা অবাক হয়ে থাকবে ধীরেশ। বাইরে কিন্তু তার বিপরীত ভাবটাই ফুটে বেরিয়েছিল। বিরক্ত, অশ্লীল ভঙ্গিতে সে বলেছিল, 'বেশ্যাগিরি করে তো খাও। তার আবার অত! কী করবে এখন শুনি? কোন ভাগবতপাঠ?'

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল লীলা। প্রতিদিন রাত থাকতে থাকতেই শেষ খদ্দেরটিকে ঘর থেকে বার করে দেয় সে। তারপর দরজায় শেকল তুলে তালা লাগিয়ে সোজা চলে যায় গঙ্গায়।

'ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে' গোটাকয়েক ডুব দিয়ে ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে লীলা ছোটে শ্যামবাজার খালপুলের দিকে। পায়ে হেঁটে অবশ্য যায় না। মাসকাবারি রিকশা ঠিক করা আছে। তাতেই যায়। শ্যামবাজার থেকে বাসে করে যশোর রোড ধরে দমদম আর বারাসাতের মাঝামাঝি একটা জায়গায় নেমে পড়ে।

বাস রাস্তা থেকে বাঁ দিকের মাঠে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটলে অসীম নির্জনতার মাঝখানে ছোট্ট একখানি হলুদ রঙের বাড়ি চোখে পড়বে। বাড়ি আর কতটুকু, একটা মাত্র পাকা ঘর। সামনের দিকে ফুলের বাগান। বাগানের একটি নিরালা কোণ ঘেঁষে ডালপালাওলা অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় মন্দির। মন্দির সংলগ্ন জায়গাটিতে লাল সিমেন্টের বেদি।

এখানে যাঁর বাস তিনি এক সন্ন্যাসী—গৃহী সন্ন্যাসী। সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে তিনি বনবাসে যাননি। অবশ্য সংসার বলতে কি আর! স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই। তাঁর নিজেকে নিয়েই সংসার।

গৃহী, তবু গেরুয়া ধারণ করেন। বয়সও যথেষ্ট হয়েছে। সৌম্যদর্শন গম্ভীর চেহারা, গায়ের রং এত বয়সেও সুগৌর। বুক পর্যন্ত দাড়িগোঁফ। পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থলের মতো সেগুলোর বেশির ভাগই সাদা।

মহাভারতে আর্য ঋষিদের যে বর্ণনা আছে, তাঁর দিকে তাকালে সেই কথাটাই মনে পড়ে যায়। পরিচিত সবাই তাঁকে 'মহারাজ' বলে। সন্ন্যাসী মহারাজ।

লীলা যখন তাঁর কাছে পৌছয় তখনও ভাল করে সকাল হয় না। ইতিমধ্যেই চারপাশের গ্রাম থেকে দু-চারজন করে আসতে আসতে ছোটখাটো ভিড় জমে যায়। অধিকাংশই বর্ষীয়সী বিধবা। কিছু কিছু বৃদ্ধও। এর মধ্যে লীলাই যা অল্পবয়সিনী।

গৃহী সন্ন্যাসী প্রায় প্রতিদিনই এই সময়টা মুখে মুখে পুরাণের গল্প করেন। কোনওদিন ভাগবত পড়েন, কোনওদিন বা গীতা। তারপর সুললিত সহজবোধ্য ভাষায় বুঝিয়ে দেন।

জগতে কোনও কিছুর প্রত্যাশা নেই সন্ন্যাসীটির। পাঠ শোনার দক্ষিণা হিসেবে কেউ কিছু দিতে চাইলে বরং স্নিগ্ধ হেসে প্রত্যাখ্যান করেন।

কীভাবে কার কাছে লীলা এই সন্ন্যাসীটির খোঁজ পেয়েছিল সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে তাঁর আকর্ষণ এত তীব্র যে রোজ সেখানে না গিয়ে সে পারে না। সারারাতের মন্থন-করা বিষ যা লীলার শিরায়-শোণিতে আর অস্তিত্বের গহনে প্রবাহিত, এই শান্ত পবিত্র নির্জন মন্দিরটিতে এসে কিছুক্ষণের জন্য সে তা ভুলতে পারে। এখানে এসে যত সামান্য সময়ের জন্যই হোক, অমৃতের স্পর্শ পায় লীলা। নরকের ঠিক মাঝখানটিতে থেকেও এই স্পর্শটুকুই তার সান্ত্বনা, তার শান্তি।

ভোরবেলায় সেখানে যায় লীলা। ফেরে দুপুরের কিছু আগে।....

ধীরেশ আবার বলে উঠেছিল, 'কী, চুপ করে রইলে যে? বল, এখন কী করবে—'

একটু ভেবে লীলা বলেছিল, 'কী করব দেখতে চান?'

মাতালের খেয়াল। ধীরেশ পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আলবত দেখেঙ্গা।'

'তা হলে আমার সঙ্গে চলুন।

'চল।'

তেলের শিশি, গামছা, শুকনো জামাকাপড় একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে পুরে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল লীলা। আর টলতে টলতে তাকে অনুসরণ করেছিল ধীরেশ।

গঙ্গায় স্নান সেরে কাপড়চোপড় বদলে দমদমের ওপারে দূর নির্জনে সেই সংসারাশ্রমে লীলা যখন পৌঁছেছিল তখনও তার সঙ্গেই ছিল ধীরেশ।

অনেক দিন যাতায়াতের ফলে সন্ন্যাসী লীলাকে চিনতেন। চেনা আর কি। নামটাই শুধু জানতেন। কী তার জীবিকা, কোথায় সে থাকে, জানতেন না। সে-সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল না বিন্দুমাত্র। একটি মেয়ে তাঁর কাছে নিত্য আসে, তন্ময় হয়ে পাঠ শোনে, এটুকুই যথেষ্ট। মেয়েটি ভক্তিময়ী, এই পরিচয়ই যথেষ্ট। আর সব বাহুল্য।

অন্য দিন একা একা যায় লীলা। সেদিন তার সঙ্গে ধীরেশ ছিল। সন্ন্যাসী ধীরেশের ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করেননি। ধীরেশ সম্বন্ধে তাঁর চোখেমুখে কোথাও বিন্দুমাত্র কৌতূহল ফোটেনি। এই আশ্রম সবার জন্য অবারিত। একটি মানুষ এসেছে। তার সম্বন্ধে উকিলের মতো জিজ্ঞাসাবাদের কী আছে? সন্ন্যাসীর মনোভাব এই রকমই বোধ হয় ছিল।

এরপর যথারীতি শাস্ত্রপাঠ হয়েছে। লীলার পাশে বসে ঘোরের মধ্যে সব শুনে আর দেখে গিয়েছে ধীরেশ। ঘোরের মধ্যে, কেন না তখনও নেশা একেবারে ছুটে যায়নি।

পাঠ শেষ হলে একে একে অন্য শ্রোতারা চলে গিয়েছিল। ধীরেশকে নিয়ে লীলা উঠতে যাবে সেই সময় মহারাজ হাতের ইঙ্গিতে তাদের বসতে বলেছেন। লীলারা বসলে মহারাজ কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরেশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার নামটি কী বাবা?'

জড়িত স্বরে ধীরেশ নাম বলেছিল।

মহারাজ বলেছিলেন, 'তোমার কত আর বয়েস, কিন্তু এর মধ্যে এত দুঃখ কিসের?'

ধীরেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'দুঃখ!'

'হ্যাঁ।'

'কে বললে?'

'কে আবার বলবে? তোমার চোখ বলছে, মুখ বলছে। দুঃখ না থাকলে কেউ কি তোমার মতো এমন বিকারের পেছনে ছোটে। এমন করে—'

'কী?'

'কেউ কি নেশা করে বাবা?'

মহারাজ কি অন্তর্যামী? পাশে বসে লীলা চমকে উঠেছিল। হৃৎপিণ্ড আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যেন। সেটা আকারণে নয়। একটা নেশাখোর মদ্যপকে নিয়ে ঝোঁকের মাথায় এই পবিত্র স্বর্গলোকে এসেছে। মহারাজ তার সম্বন্ধে কী ধারণা করলেন?

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে নেশা অনেকখানি ছুটে গিয়েছিল ধীরেশের। সে বলেছিল, 'দুঃখ ছাড়া কেউ কি নেশা করে না নাকি? আমি কিন্তু আনন্দের জন্যে মদ খাই।'

'তোমার কথাটা আমি কিন্তু মানতে পারলাম না বাবা।'

'কেন?'

'আনন্দের জন্যে কেউ কি নিজেকে অসুস্থ, বিকৃত করে?'

ধীরেশ এবার কিছু বলেনি।

মহারাজ মৃদু হেসেছিলেন। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'তুমি এসেছ। খুব খুশি হয়েছি বাবা। সময় পেলে মাঝে মাঝে এস।'

'এখানে এসে কী হবে!' বিদ্রূপে ঠোঁটদু'টি বেঁকে গিয়েছিল ধীরেশের। বলেছিল, 'আমার বিকার ঘুচিয়ে দিতে চান নাকি? কিন্তু পারবেন না। জ্ঞান হবার পর থেকে মদ খাওয়াটা আমাদের বাড়ির রেওয়াজ।'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে মহারাজ বলেছিলেন, 'আমি খুব সামান্য মানুষ, কারও কিছু ঘুচিয়ে দেবার সাধ্য কি আমার আছে বাবা! তোমার সঙ্গে পরিচয় হল, তোমাকে ভাল লাগল। তাই আসতে বললাম।'

কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, ধীরেশই বলতে পারে। পরের দিন লীলার ঘরে রাত কাটিয়ে তার সঙ্গেই সেই সংসারাশ্রমে আবার গিয়েছিল সে। আগের দিনের মতোই মদে চুর হয়ে। তার পরের দিনও গিয়েছিল। অবশেষে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছিল।

রাতের মধ্যযামে রোজ লীলার ঘরে আসত ধীরেশ। তারপর ভোর হলেই তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত। দূর নির্জনে এক গৃহী সন্ন্যাসী কী জাদু করেছিলেন, কে জানে। তাঁর অমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করার সামর্থ্য ছিল না ধীরেশের।

লীলার সঙ্গেই যেত ধীরেশ, লীলার সঙ্গেই ফিরে আসত। লীলা লক্ষ করেছে, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকত, পলকহীন মাঝে মাঝে ধীরেশকে দেখতেন মহারাজ। কী দেখতেন, তিনিই বলতে পারেন। তবে এটুকু বোঝা যেত, উচ্ছৃঙ্খল মাতালটা তাঁর মনোজগতের অনেকখানিই দখল করে বসেছে।

মহারাজ তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতেন, কিছু বলতেন না।

প্রথম প্রথম দিনকয়েক নেশা করেই আসত ধীরেশ। তারপর ভাবান্তর শুরু হয়েছিল। সেটা সঙ্কোচে অথবা পরিবেশের প্রভাবে, কে জানে। মদ খেয়ে আর আসত না সে।

এইভাবে মাস দুই তিন কেটেছিল।

একটা দিনের কথা লীলার খুব বেশি করে মনে পড়ে। অন্য সব দিন শাস্ত্রপাঠের পর তার সঙ্গে ধীরেশ চলে আসত। সেদিন কিন্তু আসেনি। অগত্যা লীলাকেও থেকে যেতে হয়েছিল। গ্রামান্তরের বৃদ্ধবৃদ্ধারা চলে গেলে মহারাজের উদ্দেশে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

মহারাজ সাগ্রহে তাকিয়েছিলেন, 'বল।'

'জীবনে কিসে শান্তি পাওয়া যায়, বলতে পারেন?'

'শান্তি!'

'হ্যাঁ।'

'বড় জটিল প্রশ্ন করেছে বাবা। ও বস্তুটির খোঁজ অন্যে কি দিতে পারে? নিজের মনের মধ্যেই তার সন্ধান করে নিতে হয়। কিন্তু বাবা—'

'কী?'

'হঠাৎ শান্তির কথা বললে যে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়নি ধীরেশ। তার চোখে মুখে নিদারুণ অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। বিচলিত, কাঁপা সুরে একসময় সে বলেছিল, 'আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি।'

'কষ্ট!' বিচিত্র হেসেছিলেন মহারাজ, 'কিসের কষ্ট বাবা?'

'আপনাকে আমার জীবনের কিছু কথা বলতে চাই। শুনে বলুন, আমি কী করব। কেন জানি মনে হচ্ছে আমি যা চাই, আপনার কাছে পেয়ে যাব।'

'তুমি যা চাও আমি তা দিতে পারব কি না, জানি না। তবে তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনব। বল—'

বিজলীর ব্যাপারে যা-যা ঘটেছে, এরপর অকপটে সব বলে গিয়েছে ধীরেশ। সমস্ত বলা হলে একটু ভেবে আবার শুরু করেছে, 'বিজলীকে পেয়েও ধরে রাখতে পারিনি। তাই তার সঙ্গে ধ্বংসের প্রতিযোগিতায় নেমেছিলাম। দেখতে চেয়েছি সে কতদূর যায় আর আমি কোন রসাতলে গিয়ে ঠেকতে পারি। তাতে বিজলীকে ধরে রাখতে না পারি, অন্তত তার সঙ্গে একই ভাগ্যের ভাগীদার হতে পারব। সেটুকুই যা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু—'

'কী?' মহারাজ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'রসাতলের পথে খানিক দূর এগিয়েওছি। তারপর আর পারছি না।' অসহ্য যন্ত্রণায় ঠোঁটদু'টো কুঁকড়ে আসছিল ধীরেশের, 'শরীরের দিক থেকেই বেশি ক্লান্তি বোধ করছি। বিজলীকে পাইনি। ভেবেছিলাম, নেশায় ডুবে থেকে আর বাজারের মেয়েমানুষদের দুয়ারে দুয়ারে হানা দিয়ে বিজলীকে হারাবার ক্ষতি পূরণ করে নেব। কিন্তু পারছি না, পারছি না। আমার কী যে কষ্ট, আপনাকে বোঝাতে পারব না। বলুন, কী করব আমি? বিজলীকে ভুলতে চাই, আমার অতীত-বর্তমান ভুলতে চাই। সব ভোলানোর মন্ত্র আপনার জানা আছে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গভীর স্বরে মহারাজ বলেছিলেন, 'এ-অবস্থায় আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে পারি। কিন্তু সে-সব তো তোমার ভাল লাগবে না বাবা। তবে—'

'কী?'

কী উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন মহারাজ। একটু ভেবে কিছুক্ষণ পর শুধু বলেছেন, 'মনের শান্তি মানুষের নিজের হাতে। তবে তোমার মধ্যে যে বিপর্যয় চলছে তার থেকে মুক্তির জন্য অন্যমনস্কতা দরকার। তোমার সমস্ত ভাবনা অন্য দিকে ফেরাতে হবে।'

'অন্য কোন দিকে ফেরাব? বিজলী ছাড়া আমার চোখের সামনে আর যে কিছুই নেই।'

'আছে বাবা, নিশ্চয়ই আছে। একটি স্ত্রীলোকের স্মৃতি আর আত্মহত্যা করা ছাড়াও জীবনে এবং জগতে অনেক বিচিত্র এবং বড় কাজ আছে। কিন্তু বাবা, তোমার সমস্ত মন এত বিক্ষুব্ধ যে সে-সব দেখতে পাচ্ছ না।' বলতে বলতে একটু থেমেছিলেন মহারাজ। পরক্ষণেই আবার শুরু করেছিলেন, 'অন্তত একটি কাজের কথা তোমাকে বলতে পারি যার মধ্যে ডুবে গেলে শান্তি পাবে কি না, জানি না। তবে অন্যমনস্ক হতে পারবে। নিজেকে ধ্বংস করার অবকাশই পাবে না।'

ধীরেশ বলেছিল, 'কী কাজ?'

'এই মুহূর্তে তা তো বলা যাবে না। তার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন?'

'তুমি নিশ্চয়ই জানো, জমি প্রস্তুত না হলে বীজ বুনে কোনও লাভ নেই। বীজ যত ভালই হোক, মাটি ভাল না হলে সুফলের আশা থাকে না।'

'তা হলে জমি হিসেবে আমি নিকৃষ্ট বলতে চান?'

মহারাজ সে-কথার উত্তর দেননি। মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তুমি তো এখানে রোজই আসছ। আসতে আসতেই একদিন কাজের কথাটা জানতে পারবে। তবে একটা অনুরোধ আছে বাবা।'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল ধীরেশ।

'নিজেকে ধ্বংস করার ঝোঁকটা তোমাকে কমাতে হবে। চেষ্টা করলেই তা পারবে। মনে রেখ, মানুষের ইচ্ছার অসাধ্য কিছু নেই।'

আগেই কিছু কিছু পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এবার ধীরেশের জীবনের সকল দিকেই তার ঢেউ এসে লাগল। মদের মাত্রা কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত একদিন ছেড়েই দিল সে।

আগে আগে ধীরেশ মত্ত হয়ে রোজ রাতে লীলার ঘরে আসত। ধীরে ধীরে সেই আসা অনিয়মিত হতে লাগল। একদিন আসাই বন্ধ করে দিল সে।

মহারাজের সংস্পর্শে আসার জন্যই এই সব পরিবর্তন এসেছিল কি না, কে বলবে। কিংবা ধীরেশের প্রকৃতির মধ্যেই এমন কিছু ছিল যা প্রচণ্ড মত্ততাকে দীর্ঘদিন সহ্য করতে পারে না। ঈশ্বরবর্জিত ভোগীর ছেলে সে। কিন্তু তার স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি কম।

লীলার কাছে না এলেও মহারাজের কাছে নিয়মিতই যেত ধীরেশ। শেষ পর্যন্ত এমন হল, সেখানেই দিনের পর দিন পড়ে থাকত। নির্জন সংসারাশ্রমে অপার্থিব এমন কিছুর সন্ধান সে পেয়েছিল যা তার বিক্ষুব্ধ স্নায়ুগুলোকে জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

মহারাজের ওখানেই ধীরেশের সঙ্গে লীলার দেখা হত। এই ভাবে আরও কয়েকটা মাস কেটে গেল।

অবশেষে সেই দিনটা এল। সেদিন মহারাজ বললেন, 'এবার সময় হয়েছে ধীরেশ। জলপাইগুড়ির কাছে এক মঠে তোমাকে আমি পাঠাতে চাই।'

শুনে চমকে উঠেছিল ধীরেশ, 'মঠে!'

'হ্যাঁ, মঠে। সেখানে কিছু সেবার কাজ তোমাকে দেওয়া হবে।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়নি ধীরেশ। অনেকক্ষণ পর সে বলেছিল, 'জানেন, এমন লোকের ছেলে আমি যিনি মঠ-ঈশ্বর কিছুই মানেন না, যিনি ভোগবাদকেই জীবনে সব চাইতে বড় বলে জানেন—'

মহারাজ হেসেছিলেন, 'আজীবন তো ঈশ্বরহীন জগতের মধ্যেই কাটিয়ে এলে। সেখানে কী পেয়েছ, তুমিই ভাল বলতে পারবে। এবার ঈশ্বরের রাজ্যে একবার ঢুকে দেখ না। কোনওরকম বাধ্যবাধকতা নেই। সেখানে যাবার পথও খোলা। ভাল যদি না লাগে ফেরার পথও খোলা। তবে—'

'কী?'

'আমার বিশ্বাস সেখানে তুমি শান্তি পাবে।'

আর কোনও প্রশ্ন করেনি ধীরেশ। দ্বিধা যদি তার প্রাণে কিছু থাকে, তা ছিল অনুচ্চারিত। মহারাজের নির্দেশমতো সন্ন্যাস নিয়ে জলপাইগুড়ির মঠে চলে গিয়েছে সে।

ধীরেশের কথা শেষ করে একটু থামল লীলা।

আমি ললিত চৌধুরি স্তম্ভিত, হতবাক। যে ধীরেশ নিরীশ্বর, ভোগের পাঁকে আজন্ম যে নিমজ্জিত সে সন্ন্যাস নিয়েছে! আমার জন্য বাংলাদেশ এতখানি বিস্ময় যে মুঠোয় পুরে রেখেছিল তা কে ভাবতে পেরেছে? বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'ধীরেশ মঠে চলে গেল!'

'হ্যাঁ।' দূরমনস্কের মতো লীলা বলতে লাগল, 'মহারাজের কাছে নিজের সব কথা বলে ধীরেশবাবু তো মুক্তি পেল। কিন্তু আমি পারলাম না। নরকের এই জীবনটার কথা কতবার বলতে গিয়েছি, সঙ্কোচে পারিনি। এখান থেকে আমার মুক্তি নেই।'

লীলার জীবন যে ঘৃণ্য, আর সে-জন্যই যে মহারাজের কাছে নিজের প্রাণটাকে সে উন্মুক্ত করতে পারেনি, এ-সব আমার চেতনায় রেখাপাত করতে পারছিল না। ধীরেশের কথাই আমি শুধু ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে চকিতে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য! যে উদ্দেশ্যে লীলার কাছে আসা, এতক্ষণ সেটাই ভুলে ছিলাম। এবার ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'ধীরেশবাবুর ঠিকানাটা দিন।'

ঠিকানা মিলল।

লীলা ধীরেশকে নতুন জীবনের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছিল, কিন্তু নিজে সেখানে যেতে পারেনি। নরকের মাঝখানেই সে পড়ে রইল।

বিশ

বোম্বাই থেকে ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলাম। তার মধ্যে ধীরেশের সন্ধানে একটা সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। এখনও আমার হাতে রয়েছে আরও অনেকগুলো দিন।

এদিকে জলপাইগুড়ির এক মঠ থেকে মাধ্যাকর্ষণের মতো দুর্দম শক্তিতে ধীরেশ আমাকে টানতে শুরু করেছে। অতএব লীলার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আমি পর দিনই সেখানকার টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলাম।

জলপাইগুড়ির শহরতলি ছাড়িয়ে মাইল পঞ্চাশেক দূরে গেলে যতদূর চোখ যায়, যোজন যাজন চায়ের বাগান আর দিগন্তকে বেষ্টন করে ধোঁয়ার দৈত্যের মতো ধূসর পাহাড়। সেখানে মাথার ওপর অবাধ আকাশ। প্রকৃতির এই স্বদেশে ধীরেশদের মঠ।

ট্রেনে-বাসে আর পায়ে হেঁটে দেড় দিনের মতো কাটিয়ে সেখান চলে এলাম। আমি যখন পৌঁছলাম তখন খুব ভোর। মঠের প্রভাতী প্রার্থনা সবেমাত্র শেষ হয়েছে।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে বিঘে পনেরর মতো জমি ঘেরা। তার ভেতর বিশাল পুকুর, ফুল-ফল এবং আনাজের বাগান। আর আছে লম্বা লম্বা খানচারেক একতলা বাড়ি। মাঝখানের চত্বরে প্রকাণ্ড মন্দির আর নাটমণ্ডপ চোখে পড়ে। এই হল ধীরেশদের মঠ।

ভেতরে ঢুকে আর চারদিক দেখে মনে হল, অকূল সমুদ্রে এসে পড়েছি। এখানে সবাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ব্রহ্মচারী। গৃহস্থ পৃথিবীকে বহু দূরে নির্বাসন দিয়ে তাঁরা এখানে এসেছেন।

সকলেরই মাথা মুণ্ডন করা, পরনে গেরুয়া। সবাইকে একই রকম মনে হয়।

দিশেহারার মতো কী করব যখন কিছুই ঠিক করতে পারছি না, সেই সময় এক তরুণ সন্ন্যাসীকে আমার সামনে দিয়ে দক্ষিণ প্রান্তের বাড়িটার দিকে যেতে দেখলাম। তাঁকে ডাকলাম, 'দয়া করে একটু শুনবেন—'

তরুণ সন্ন্যাসী থমকে দাঁড়ালেন। তারপর পায়ে পায়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

বললাম, 'এক ভদ্রলোকের খোঁজে এসেছি—'

'কার?'

'ধীরেশ বাসুর।'

'ধীরেশ বাসু!' সন্ন্যাসীকে চিন্তিত দেখাল। একটু কী ভেবে তিনি বললেন, 'ও তো সংসারী নাম। ও-নাম বললে তো চেনা যাবে না।'

সন্ন্যাসী কী বলতে চান, বুঝতে পারলাম না। বিমূঢ়ের মতো তাঁর শেষ কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করলাম শুধু, 'চেনা যাবে না!'

আমার মনোভাব বুঝতে পারলেন সন্ন্যাসী। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বক্তব্য বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

শুধুমাত্র গৃহী জীবনকেই না, তার কামনা-বাসনা, অশন-বসন, রুচি-অভ্যাস, মোট কথা আজন্মের সমস্ত কিছু এবং যাবতীয় জাগতিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এখানে আসতে হয়। এমনকি পিতৃমাতৃদত্ত নামটাও বর্জন করতে হয়। মাথা মুণ্ডন করে নিজের সাংসারিক জীবনের সপিণ্ড শ্রাদ্ধ চুকিয়ে তবে এই সন্ন্যাসের জগতে আসার অধিকার মেলে।

কাজেই এই মঠে কেউ আর যতীন ভাদুড়ি কি অজিত মুখার্জি কি রমেন রাহা নয়। এখানে সবাই আনন্দ। কেউ ধীরানন্দ, কেউ প্রাণানন্দ, কেউ শুভানন্দ।

এ-সব তথ্য আমার জানা ছিল না। কোনওরকমে শুধু বলতে পারলাম, 'তাই তো, ভারি বিপদ হল। বহু দূর থেকে অনেক আশা নিয়ে আসছি। ধীরেশবাবুকে না পেলে—'

আমার কথা শেষ হল না। তার আগেই হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'এদিকে শুনুন।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার উলটো দিকে মন্দির সংলগ্ন উঁচু মণ্ডপ। মণ্ডপের এক প্রান্তে একজন সন্ন্যাসী চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। লক্ষ করিনি, এতক্ষণ তাঁর নিষ্পলক দৃষ্টি আমার ওপরেই নিবদ্ধ ছিল।

তাঁকে কী বলব? তরুণ? না। প্রৌঢ়? তা-ও না। তারুণ্য এবং প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি একটা জায়গায় তাঁর বয়সটা থমকানো।

সেই তরুণ ব্রহ্মচারীটি আমার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার কানের কাছে মুখ এনে সসম্ভ্রমে ফিসফিসিয়ে উঠলেন, 'সৌম্যানন্দ—আমাদের মঠের সহ-অধ্যক্ষ।'

চোখাচোখি হতেই সৌম্যানন্দ হাতের ইশারা করলেন। মন্ত্রচালিতের মতো কাছে এগিয়ে গেলাম। আর গিয়েই চমকে উঠলাম। এই তো, এই তো ধীরেশ। এরই সন্ধানে বার শ'

মাইল পাড়ি দিয়ে পশ্চিম দিগন্ত থেকে প্রথমে কলকাতায়, তারপর উত্তর বাংলার এই সুদূর প্রান্তে এসে পড়েছি।

প্রথমটা কিছুই বলতে পারলাম না। লীলার কাছে আগেই সব খবর পেয়েছি। তবু সৌম্যানন্দের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সীমাহীন অননুভূত এক বিস্ময় কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত স্নায়ু আর ইন্দ্রিয়গুলোকে অভিভূত করে রাখল যেন।

আশ্চর্য! ভোগবাদী ধীরেশ আজ সৌম্যানন্দে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর মঠগামিনী সন্ন্যাসিনী বিজলী? তাকে তো বোম্বাইতেই দেখে এসেছি। জীবনের দুই বিপরীত মেরুতে তারা আজ পৌঁছেছে। বিজলী এবং ধীরেশের পরস্পরের ঈশ্বর সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

অভিভূত ভাবটা থিতিয়ে এলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। ধীরেশ, না না, সৌম্যানন্দ বাধা দিলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

তাঁকে অনুসরণ করে মাঝারি ধরনের একখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একপাশে ছোট একটি তক্তপোশের কথা বাদ দিলে ঘরখানিকে আসবাব-বর্জিতই বলা যেতে পারে। তক্তপোশের ওপর কম্বল জড়ানো দীন একখানি বিছানা। আরেক দিকে দড়িতে তিন-চারখানা গেরুয়া চাদর ইতস্তত ঝুলছে।

তক্তপোশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সৌম্যানন্দ বললেন, 'বসুন।'

নির্দেশমতো বসলাম। খানিক দূরে বিছানার আরেক কোণে সৌম্যানন্দও বসলেন।

একটু চুপচাপ। তারপর সৌম্যানন্দই বলে উঠলেন, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

বললাম, 'আমি বোম্বাইতে থাকি। তবে আপাতত কলকাতা থেকে আসছি।'

'সোজা কলকাতা থেকেই?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রেনে এসেছেন?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'তাহলে তো দু'টো রাত না ঘুমিয়েই কাটাতে হয়েছে।' সৌম্যানন্দ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে আছেন?'

'না, তেমন আর কি।'

আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না সৌম্যানন্দ। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার স্নান খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। খেয়ে শুয়ে পড়ুন। খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

বুঝতে পারছি, সৌম্যানন্দ আমাকে চিনতে পারেননি।

বললাম, 'বিশ্রাম, খাওয়া পরে হলেও চলত। আমি কিন্তু খুব জরুরি একটা কাজে এসেছিলাম।'

'বিশ্রাম-টিশ্রামগুলোই আগে দরকার, জরুরি ব্যাপারটা ওবেলা হবে'খন।'

সৌম্যানন্দই সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। স্নান সেরে খেয়ে এই ঘরেই টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল, বিকেল হতে দেরি নেই।

বিছানা থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। অন্য সন্ন্যাসীদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সৌম্যানন্দ এখন মঠে নেই। দূরের একটা গ্রামে কলেরা লেগেছে। ওষুধ, ডাক্তার আর কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসীকে নিয়ে তিনি সেখানে ছুটেছেন। সন্ধের আগে ফিরবেন না।

আমার হাতে কাজ ছিল না। সুতরাং ঘুরে ঘুরে মঠটা দেখতে লাগলাম। সেই সঙ্গে আশ্রমিকদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, মঠের অধীনে কিছু ধানজমি আছে। সেগুলো নানা মানুষের দান হিসেবে পাওয়া গেছে। জমিগুলো থেকে যা আয় হয় তাতেই এই মঠ চলে।

এখানকার আশ্রমিকদের প্রধান কাজ হল সেবা। চারপাশে দরিদ্র ব্রাত্যদের যে অসংখ্য গ্রাম ছড়িয়ে আছে, আশ্রমিকরা সেখানে ঘুরে ঘুরে সেবা করে থাকেন। আর্তের, পীড়িতের সেবা।

সেবাটা প্রধান হলেও অশিক্ষা, অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারে গ্রামগুলো এখনও অন্ধকারে ডুবে আছে। সেই অতল গভীর পরিব্যাপ্ত আঁধার দূর করার কাজেও এই মঠটা পিছিয়ে নেই। গ্রামে গ্রামে ওঁরা স্কুল খুলেছেন। শিক্ষা এবং সেবাই শুধু নয়, ব্যবহারিক দিকেও ওঁদের লক্ষ্য আছে। মান্ধাতার আমল থেকে চাষবাসের যে প্রথা চলে আসছে সে-সব ধ্যানধারণা বদলে দিয়ে এখানে সমবায় পদ্ধতিতে ট্র্যাক্টর নিয়ে এসেছেন। ট্র্যাক্টরের আবাদে ফসল হচ্ছে প্রচুর। চাষীদের আয় হচ্ছে আগের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু হঠাৎ আয় বাড়ার ফলে নেশা জুয়া বা অন্য পথে যাতে তা খরচ না হয় সেদিকে মঠের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে।

মোট কথা, মঠটা পুরনো ঈশ্বরের দুর্গেই শুধু বন্দি হয়ে নেই। মানুষের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সময়ের উপযোগী হয়ে উঠেছে। আর এত কাজের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সৌম্যানন্দের। দিবারাত্রি এক মুহূর্ত তাঁর বিশ্রাম নেই। সেবাব্রতের মাঝখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। তার কিছু আগেই সৌম্যানন্দ ফিরে এলেন। দ্রুত স্নান সেরে হবিষ্যান্নের পালা চুকিয়ে এক টুকরো হর্তুকি মুখে দিয়ে সেই ঘরখানায় এসে ঢুকলেন। আমি সেখানেই ছিলাম।

ইতিমধ্যে রাত নেমে গিয়েছিল। উত্তর বাংলার এ-প্রান্তে এখনো বিজলী আলোর দাক্ষিণ্য এসে পৌঁছয় নি। কাজেই ঘরের মাঝখানে একটা হেরিকেন জ্বলছে।

তক্তপোশের সেই বিছানায় আমি বসে ছিলাম। সৌম্যানন্দ আমার মুখোমুখি বসলেন। একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কোথায় বিলাসী ভোগী নেশাসক্ত ধীরেশ আর কোথায় ত্যাগব্রতী এই সন্ন্যাসী! সুখাদ্য

আর মদ ছাড়া একটা দিনও যার চলত না সে আজ দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন খাচ্ছে। বসন বলতে এক টুকরো গেরুয়াতেই সে সন্তুষ্ট। হায় জীবন!

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। একসময় সৌম্যানন্দই বলে উঠলেন, 'এবার বলুন, কী দরকারে আমাদের এখানে এসেছেন—'

বললাম, 'একটি মানুষকে খুঁজতে।'

'কাকে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। তারপর সমস্ত দ্বিধা দু'হাতে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলাম, 'যদি বলি আপনাকে—'

'আমাকে!' সৌম্যানন্দের স্বরে চমক খেলে গেল।

'হ্যাঁ। আপনিই তো ধীরেশবাবু।'

এতটুকু বিচলিত হলেন না সৌম্যানন্দ। গম্ভীর সুরে বললেন, 'না, আমি সৌম্যানন্দ। আপনি হয়তো ভুল করছেন।'

কোত্থেকে খানিকটা দুঃসাহস আমার মধ্যে চারিয়ে গেল। এই মঠে বসে তার সহ-অধ্যক্ষের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আপনি সৌম্যানন্দ ঠিকই। তবে এই মঠে আসার আগে আপনার নাম ছিল ধীরেশ বাসু। মনে পড়ে?'

'এখানে আসার আগে আমি কোথায় ছিলাম, কী ছিলাম, আমার কী নাম ছিল, সে-সব ভুলে গিয়েছি।'

এই মানুষটি তাঁর সমস্ত অতীতকে অস্বীকার করতে চাইছেন। কী বলব, ভেবে পেলাম না।

সৌম্যানন্দ আবার বললেন, 'সন্ন্যাস নেবার আগে আমার যদি কোনও নাম থেকে থাকে সে-নামের মানুষ আজ মৃত। তা ছাড়া, মঠে আসার পর আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। গত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারব, এত বড় জাতিস্মর আমি নই।' বলতে বলতে একটু থামলেন। পরক্ষণেই শুরু করলেন, 'আমার কথা থাক। আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।'

সৌম্যানন্দের স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করতে শেষ চেষ্টা করলাম। বললাম, 'আমার নাম ললিত চৌধুরি। বর্ধমান জেলায় শুশুরিয়া বলে একটা গ্রাম আছে। যুদ্ধের সময় আপনি, আপনার বাবা-মা, সবাই সেখানে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় একটি মেয়ের সঙ্গে বার দুই আপনাদের বাড়ি গিয়েছি। মনে পড়ছে?'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, পূর্বজন্মের সব কিছু আমি ভুলে গিয়েছি। তার চাইতে বড় কথা, সে জীবনটার কিছু স্মরণ করার অধিকার আমার নেই।'

'অধিকার নেই!'

'না।'

'কোনও কিছুরই না?'

'না।'

'যে-মেয়েটির সঙ্গে আপনাদের শুশুরিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলাম তার কথাও না? একটু ভেবে দেখুন, সেই মেয়েটা, মানে বিজলীর কথা বলছি।'

সৌম্যানন্দ এবার অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'বিজলী!'

অনেকখানি ঝুঁকে সাগ্রহে আমি প্রতিধ্বনি করলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বিজলী।'

লক্ষ করলাম, দৃঢ় অটল সন্ন্যাসব্রতী এবার আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ভাবলেশবর্জিত উদাসীন চোখদু'টিতে এই মুহূর্তে আলোছায়ার খেলা শুরু হয়েছে। গলার কাছটা কাঁপছে। ঠোঁটদু'টি শক্তবদ্ধ। মুখখানার দিকে তাকিয়েই অনুমান করা যায়, তাঁর বুকের ভেতরে স্তব্ধ জমাট কোনও অংশে ধস নামছে। কঠিন আত্মসংযমে এতক্ষণ নিজেকে ঘিরে রেখেছিলেন। মনে হল, আর পারছেন না। একটি মেয়ের নাম তাঁর ভেতরকার অটুট দৃঢ়তা ধসিয়ে দিতে শুরু করেছে।

বেশিক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না সৌম্যানন্দ। চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দু' হাত পেছন দিকে মুষ্টিবদ্ধ করে অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ নীরবতা। শেষ পর্যন্ত আমিই বলে উঠলাম, 'কি, চুপ করে রইলেন যে? এখনও মনে পড়ছে না?'

সৌম্যানন্দ উত্তর দিলেন না।

আমি থামলাম না। সমানে প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম, 'একদিন শুশুরিয়া থেকে যাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন সে আজ কী করছে জানেন?'

এতক্ষণে স্বর ফুটল সৌম্যানন্দের। ক্লান্ত, ভাঙা গলায় কোনওরকমে বলতে পারলেন, 'জানি।'

আমি সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, 'কী জানেন? কতটুকু জানেন?'

'সবই জানি।' সৌম্যানন্দের ঘাড়টা ভেঙে ঝুলে পড়ল, 'সে এখন বোম্বাইয়ের দাদারে আছে। তার জীবন কাটছে চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে।' থেমে থেমে, ভেঙে ভেঙে বিজলীর দিন কীভাবে কাটছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে গেলেন তিনি।

শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জীবনের বিপরীত মেরুতে পৌঁছেও বিজলীকে ভুলতে পারেননি সৌম্যানন্দ। পূর্বজন্মের সবই বর্জন করেছেন, শুধু এই একটি জায়গা ছাড়া। আরব সাগরের দূর দিগন্ত থেকে তাঁর সন্ন্যাস জীবনের ওপর দীর্ঘ ছায়া ফেলে রেখেছে বিজলী। উত্তর বাংলার এই সুদূর অঞ্চল থেকেও তার গতিবিধির যাবতীয় সংবাদই রাখেন সৌম্যানন্দ।

আমি তাকিয়েই ছিলাম। হঠাৎ মনে হল, এই মানুষটি, এই সন্ন্যাসব্রতী সৌম্যানন্দই

বোধ হয় বিজলীকে আত্মহননের পথ থেকে ফেরাতে পারেন। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'বড় আশা নিয়ে এসেছি। আমার একটা কথা আপনাকে রাখতেই হবে। না বলতে পারবেন না।'

পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সৌম্যানন্দ। বললেন, 'কী কথা?'

'আপনাকে আমার সঙ্গে একবার বোম্বাই যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন সৌম্যানন্দ। তারপর সবিস্ময়ে বললেন, 'বোম্বাই যেতে হবে! কেন?'

'বিজলীকে বাঁচাতে। একদিন ভোগের মন্ত্র দিয়ে আপনিই তাকে শুশুরিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, নিজের চোখেই দেখবেন চলুন। আপনি তাকে বাঁচান।' বলতে বলতে আত্মবিস্মৃতের মতো সৌম্যানন্দের একখানা হাত ধরলাম। আর ধরেই চমকে উঠলাম। বিজলীর জন্য আমার প্রাণে এত ব্যাকুলতা কেন? এমন অসীম ব্যগ্রতা? এত কষ্ট করে ট্রেনে দু'রাত জেগে উত্তর বাংলার এই দুর্গম এলাকায় চলে এসেছি কেন? ভাবতে ভাবতে বুকের অনাবিষ্কৃত, অজানা স্তরে কোথাও একটা চমক খেলে গেল।

চিরদিনই তো মনে হয়েছে, বিজলীর কাহিনীতে আমি নায়ক নই। উপনায়ক বা খলনায়কও না। প্রধান কোনও চরিত্রই আমার জন্য নির্দিষ্ট নেই। মনে হয়েছে, আমার ভূমিকা অনেকটা নাটকের সূত্রধারের মতো। নিতান্ত খেইটুকু ধরিয়ে দিয়েই দায় থেকে আমি মুক্ত। কিংবা যোগ্যতর শব্দ দিয়ে বলা যায়, আমি দর্শক। নিরাসক্ত কি না বলতে পারব না, তবু দর্শক।

কিন্তু এই মুহূর্তে সৌম্যানন্দের হাতখানা মুঠির ভেতর ধরে থাকতে থাকতে মনে হল, আমার এতদিনের ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। কে বলে আমি দর্শক? তবে কি আমি বিজলীকে—

ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই আবেগ-রুদ্ধ স্বরে সৌম্যানন্দ বলে উঠলেন, 'বিজলী কি আমাকে যেতে বলেছে?'

বললাম, 'না। আমিই—'

আস্তে আস্তে নিজের হাতখানা আমার মুঠি থেকে মুক্ত করলেন সৌম্যানন্দ। তারপর খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'না, এখন আর আমার পক্ষে তার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'কোনও মতেই কি যাওয়া যায় না?'

'না।'

একুশ

জলপাইগুড়ির সেই মঠে দিন তিনেকের মতো ছিলাম। সৌম্যানন্দ আমাকে থাকতেও বলেননি, যেতেও বলেননি। একরকম উপযাচক হয়েই আমি থেকে গিয়েছিলাম।

থাকার একটা মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যদি কোনওরকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৌম্যানন্দকে বোম্বাই নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সে-ব্যাপারে আমাকে পুরোপুরি হতাশ হতে হয়েছে।

প্রথম দিনই সৌম্যানন্দ জানিয়ে দিয়েছিলেন, বোম্বাই যাবেন না। তারপরের দু'টো দিন অবিরত তাঁর পেছনে লেগে থেকেছি। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে তিনি অনড়। হাজার অনুনয়-বিনয় অনুরোধ-উপরোধেও তাঁকে টলানো যায়নি।

একটা মানুষকে আবিষ্কার করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিলাম। সেটা অবশ্য হয়েছে। কিন্তু তাকে দিয়ে ধ্বংসের পথে ধাবমান একটি মেয়েকে যে রক্ষা করব. তা আর হয়ে উঠল না।

অতএব কী আর করা। ব্যর্থ হয়েই আমাকে ফিরতে হল। জলপাইগুড়ি থেকে সোজা বোম্বাইয়ের দিকে পাড়ি জমালাম।

ট্রেনে বসেই ঠিক করেছিলাম, দাদার স্টেশনে নেমে প্রথমে পার্শি কলোনিতে যাব। বিজলীকে জানাব, যে-কাজের দায়িত্ব দিয়ে সে আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল তা যথাযথ পালন করেছি। এই কাজটা ছিল আমার মুক্তির শর্ত। শর্ত অনুযায়ী আমার দায়িত্ব শেষ। এবার বিজলী তার কথা রাখুক। তার চাকরি থেকে আমাকে রেহাই দিক।

মোট কথা, আমি নগদ নগদ ফল পেতে চাই। বিজলীর কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তির সনদখানা বাগিয়ে ছিন্নবাধা পাখির মতো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমি খারে ফিরে যাব।

পুরো আড়াই দিনের মতো ট্রেনে কাটিয়ে অবশেষে দাদারে এসে নামলাম। দাদার থেকে পার্শি কলোনি কতক্ষণেরই বা পথ! মুহূর্তে পৌঁছে গেলাম।

কিন্তু পশ্চিম উপকূলের এই শহর এমন একটা ভয়াবহ বিস্ময় হাতের মুঠোয় পুরে যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা কে জানত?

আমার প্রাণে ছিল আসন্ন মুক্তির আনন্দ। প্রায় উড়তে উড়তেই সেই সুবিশাল ম্যানসনটার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে এসেছিলাম। কিন্তু এ কি! বিজলীর ফ্ল্যাটটা ঘিরে অগণিত পুলিশ বসে রয়েছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনুভব করলাম, আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ক্রমশ জমাট বেঁধে যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই হঠাৎ মনে হল, ঠিক জায়গাতেই এসেছি তো? না ভুলবশত অন্য বাড়িতে ঢুকে পড়েছি! এদিকে সেদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, ফুলকাটা হলুদ

পাথরে সিঁড়িগুলো ঢাকা। দেওয়ালগুলোর গায়ে ডিস্টেম্পার-করা বাদামি রং। যে-ফ্ল্যাটটার দরজায় পুলিশেরা বসে আছে তার একধারে কালো রঙের তিনকোনো কলিং বেল। না, ভুলের অবকাশ নেই। নির্ভুল ঠিকানাতেই এসেছি।

আমি এগোতেও পারছিলাম না, পেছুতেও না। বিচিত্র এক ফাঁদে আমার পা দু'টো আটকে গিয়েছিল।

দম বন্ধ করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই। মাত্র দিন দশ-পনের আমি বোম্বাইতে ছিলাম না। এর মধ্যে কী এমন ঘটতে পারে যাতে পুলিশ বাহিনী এসে বিজলীর দরজা আগলে বসে আছে! কিছুই বুঝতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য, প্রহেলিকাময় মনে হচ্ছে।

একসময় খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে পায়ে পায়ে পুলিশের দলটার কাছে চলে এলাম। এই ফ্ল্যাটটার সঙ্গে আমার যেন বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, অথচ কী ঘটেছে সেটা না জেনেও যেতে পারছি না এমন ভঙ্গিতে বললাম, 'এখানে কী হয়েছে?'

একটা আর্মড কনস্টেবল বলল, 'খুন হো গিয়া।'

'খুন!' বিমূঢ়ের মতো শব্দটার প্রতিধ্বনি করলাম।

'হাঁ হাঁ, খুন।'

আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। শুধু মনে হল, মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বরফের একটা স্রোত দুরন্ত বেগে নেমে গেল। মনে হল, অশরীরী কেউ আমার ওপর ভর করে ঝড়ের গতিতে উলটো দিকের সিঁড়ি দিয়ে আমাকে নামিয়ে নিয়ে চলেছে। মুহূর্তে নিচে পৌছে গেলাম।

আর নিচে নামতেই রতীশ হালদারের কথা মনে পড়ে গেল। বিজলীর এই নাছোড়বান্দা প্রেমিকটি সর্বক্ষণই তো তার পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকে। নিশ্চয়ই সব খবর সে জানে।

অতএব রাস্তা পার হয়ে রতীশের সেই ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়ালাম। কি আশ্চর্য! ঘরটা বন্ধ। দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। বাড়ির দরোয়ানের কাছে তার খোঁজ করতেই জানতে পারলাম, দিন চারেক হল ঘর ছেড়ে দিয়ে রতীশ চলে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে, দরোয়ান বলতে পারল না। জেরার উত্তরে শুধু এটুকু জানালো, এখানে ফেরার সম্ভাবনা তার আর নেই।

আগেই শুনেছিলাম, রতীশ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। কাজের সূত্রে তাকে হয়তো অন্য কোথাও ট্রান্সফার করা হয়েছে। পরক্ষণে, সম্ভবত নিতান্ত অকারণেই আমার চেতনায় ভয়ঙ্কর একটা ছায়া পড়ল। বিজলীর ফ্ল্যাটের খুনের রহস্যের সঙ্গে রতীশের অন্তর্ধানের কোনও সম্পর্ক নেই তো? বিজলীর ফ্ল্যাটে কবে খুন হয়েছে আর কবে রতীশ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, এই দু'টো মিলিয়ে দেখতে পারলে হয়তো একটা সিদ্ধান্তে পৌছনো যায়। দারোয়ানের মুখ থেকে অবশ্য জানতে পেরেছি, চারদিন আগে রতীশ বাড়ি ছেড়েছে, কিন্তু

হত্যাকাণ্ডটা কবে ঘটেছে তা আমার অজানা। অবশ্য বিজলীর ফ্ল্যাটে গিয়ে পুলিশগুলোকে জিজ্ঞেস করে আসা যায়। কিন্তু ততখানি সাহস আমার নেই।

পরক্ষণেই মনে হল, বিজলীর ফ্ল্যাটের খুনের সঙ্গে রতীশের কী সম্পর্ক থাকতে পারে! রতীশ তো কোনওদিন বিজলীর কাছেই যায়নি। যে-কক্ষপথ ধরে বিজলীর চলাফেরা সেখানে রতীশের মতো মানুষের ছায়া পড়ার সম্ভাবনা নেই। বিজলীর জীবনে চিরদিনই সে অনাহূত, অপরিচিত।

এই মুহূর্তে খুন, রতীশের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া, সব মিলিয়ে আমার স্নায়ুতে অসহ্য প্রতিক্রিয়া চলছে। গুছিয়ে কিছুই ভাবতে পারছি না। তা ছাড়া, আড়াই দিন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরবার ক্লান্তি তো আছেই। খিদেও পেয়েছে সাংঘাতিক।

স্থির করলাম, আপাতত খারের হট্টমন্দিরে ফিরে যাব। সেখানে স্নান করে খেয়ে, টানা একটা ঘুম লাগিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে বিজলীর ফ্ল্যাটের খুনটা নিয়ে ভাবব। তারপর কী করণীয়, ঠিক করব।

খারে এসে স্তম্ভিত হতে হল।

এখন কত আর বেলা! সময়টা বিকেল আর দুপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থমকে আছে। এ-সময় আমার ঘরের তিন শরিককে পাওয়ার কথা নয়। যে যার জীবিকার ধান্দায় ব্যস্ত থাকে।

আমাদের চারজনের কাছেই একটা করে চাবি আছে। সুতরাং যে যখনই আসুক, ঘরে ঢুকতে অসুবিধে নেই।

আমাকে অবশ্য তালা খুলে ঢুকতে হল না। সুধাংশু ঘরে ছিল। কম্বল গায়ে দিয়ে নিজের খাটিয়ায় বসে একটা পুরনো বাসি সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। আমাকে দেখে অবাক হল, 'ললিতদা যে! এর মধ্যেই এসে পড়লে! বলে গেলে মাসখানেক পর ফিরবে। পনেরটা দিনও তো পুরো কাটেনি।'

ওদের বলে গিয়েছিলাম, এত কাল পর দেশে যাচ্ছি। গোটা একটা মাস না কাটিয়ে ফিরছি না। কিন্তু তার অর্ধেকও সেখানে থাকিনি। সুধাংশুর বিস্ময় সেই কারণে।

বিজলীর ফ্ল্যাটের হত্যা আমার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অন্যমনস্কের মতো বললাম, 'যে-কাজের জন্যে গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়িই হয়ে গেল। অনেক কাল দেশ ছাড়া। কারও সঙ্গে তেমন চেনাজানা নেই। কাজ হওয়ার পর আর ভাল লাগছিল না। চলে এলাম।' বলতে বলতেই হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম, 'তা হ্যাঁ রে, তুই আজ কাজে বেরোসনি যে?'

'তিনদিন ধরে আমার জ্বর।'

এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এবার লক্ষ করলাম, সুধাংশুর চুল উষ্কখুষ্ক, মুখখানা শুকনো, চোখ দু'টি লালচে। বললাম, 'জ্বর বাধালি কী করে?'

সুধাংশু হাসল, 'বেধে গেল।'

'রজত, গণেশ ভাল আছে?'

'আছে।'

একটু চুপচাপ। ইতিমধ্যে বিছানা-বাক্স নামিয়ে আমি জামা খুলে ফেলেছি।

সুধাংশু বলল, 'তারপর কলকাতার খবর বল।'

বললাম, 'দু' সপ্তাহের মতো ছিলাম। তার মধ্যে পাঁচ দিনের মতো ট্রেনেই কেটে গিয়েছে। বাকি আট দশ দিনে কলকাতার কতটুকু আর দেখলাম যে বলব! বাইরে বাইরে যেটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় কলকাতায় লোকজন দশগুণ বেড়েছে, গাড়িঘোড়া বেড়েছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি উঠছে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

'তা আমাদেব জন্যে কী এনেছ?' বলতে বলতে হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে উঠল সুধাংশু। তাড়াতাড়ি নিজের বালিশের তলা থেকে সাদা একটা খাম বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, 'ভাল কথা, পরশু দুপুরে একটা পুলিশ এই চিঠিটা দিয়ে গিয়েছে। বলেছে তুমি এলেই এটা যেন দিই।'

পুলিশ! খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ত্রস্ত। আতঙ্কগ্রস্ত। চোখে পড়ল, খামটার মুখ আঁটা। ওপরে আমার নাম লেখা। কাঁপা কাঁপা হাতে সেটা ছিঁড়ে ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করলাম।

খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি ঃ 'প্রীতিভাজনেষু, এই পত্রখানা পাওয়ামাত্র পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন। এখানে এসে আমার নাম বললে কেউ চিনবে না। বলবেন, মণিশঙ্কর দত্ত'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তা হলেই গেটে যে থাকবে, আমার কাছে পৌঁছে দেবে। ইতি—রতীশ হালদার।'

রতীশ হালদার, মণিশঙ্কর দত্ত, পুলিশ হেড় কোয়ার্টার্স, সব একাকার হয়ে আমার ভাবনাটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। আমার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেতে লাগল। আর তারই মধ্যে আবার জামাটা পরে ফেললাম।

সুধাংশু বলল, 'একি, ফের জামা পরলে যে! এতখানি পথ ট্রেনে ঠেঙিয়ে এলে। চান-টান কর।'

তার কথা যেন শুনতেই পেলাম না। ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

রতীশ হালদারের চিঠিতে যেমন নির্দেশ ছিল, সেই অনুযায়ী পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের গেটে এসে বলতেই একটা সেন্ট্রি আমাকে তিন তলার একখানা ঘরের সামনে নিয়ে এল। বলল, 'অন্দর যাইয়ে।'

ভেতরে পা দিতে গিয়ে চমকে উঠলাম। দরজার মুখোমুখি একটা চেয়ারে যে বসে আছে সে রতীশ হালদার। চমকটা রতীশ হালদার বলে নয়, তার পরনে পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম দেখে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মাথা নিচু করে কী যেন লিখছিল রতীশ। হঠাৎ মুখ

তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। একটা মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই উল্লসিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আসুন ব্রাদার, আসুন।'

অন্য সময় হলে রতীশের উল্লাসের জবাবে আমিও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু বিজলীর ফ্ল্যাটের খুন, রতীশকে পুলিশ অফিসার হিসেবে দেখা এবং আমাকে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে ডেকে পাঠানো, সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে আমার প্রাণে আনন্দের বান ডাকার কথা নয়। দাঁড়িয়েই রইলাম।

রতীশ আবার বলল, 'কী হল দাদা, আসুন—'

যেতেই হল। এলোমেলো পা ফেলে আচ্ছন্নের মতো টলতে টলতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে রতীশ বলল, 'বসুন।'

বসে পড়লাম। রতীশও বসল। বসতে বসতে এবার বলল, 'কলকাতা থেকে কবে ফিরেছেন?'

অবরুদ্ধ স্বরে গুঙিয়ে উঠলাম, 'আজই। আপনার চিঠি পেয়ে এখানে আসছি।'

একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কী বুঝল, রতীশই জানে। ব্যস্তভাবে বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই চান-খাওয়া হয়নি?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এখান থেকে ফিরে গিয়ে সে-সব সারা যাবে। আপনি কেন ডেকে পাঠিয়েছেন—' বলতে বলতে থেমে গেলাম।

'এখান থেকে ফিরতে দেরি হবে।' রতীশ বলতে লাগল, 'এক কাজ করুন, এখানেই হাতমুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নিন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পার্শি কলোনির সেই ঘরটিতে হলে আমার মনে সংশয়ের ছায়াও পড়ত না। কিন্তু এখানে, এই পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের মহিমাই আলাদা। তা ছাড়া যখনই জানতে পেরেছি রতীশ হালদার পুলিশ অফিসার তখন থেকেই আমার সমস্ত অস্তিত্ব সন্দিহান হয়ে উঠেছে। আমাকে এখানে ডাকিয়ে এনে কেন যে এত আপ্যায়নের ঘটা, কেন এমন মধুর ব্যবহার, সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। বললাম, 'এর জন্যে ব্যস্ত হবেন না। বরং—'

'কী যে বলেন দাদা! আমাকে এত পর পর ভাবছেন কেন? পার্শি কলোনিতে আমার ঘরে যখন যেতেন, প্রাণ খুলে কত কথা বলতেন। এখানে এসে অমন গুটিয়ে গেছেন কেন? অত ভয় কিসের? পুলিশ বলে?'

আমার আপত্তি গ্রাহ্য করল না রতীশ। একরকম জোর করেই চা এবং প্রচুর খাবার দাবার আনাল। অগত্যা হাত-মুখ ধুয়ে সে-সব নিয়ে আমাকে বসতে হল।

আমি খাচ্ছি। রতীশ হঠাৎ বলে উঠল, 'আমাকে এখানে এই বেশে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছেন, না?'

উত্তর দিলাম না।

রতীশ আবার বলল, 'অবাক হবারই কথা। আপনার কাছে একদিন নিজের পরিচয়

দিয়েছিলাম মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বলে। আসলে আমি ক্যালকাটা পুলিশের একজন অফিসার। আমার নাম মণিশঙ্কর দত্ত। আপনার কাছে যে ছলনাটুকু করেছি তা না করে উপায় ছিল না। কেন করেছি সেটা বলবার জন্যেই এখানে আপনাকে ডেকে এনেছি। পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স দেখে আপনি হয়তো ভয় পেয়েছেন। ভয়ের কারণ নেই। আপনি আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারেন।' একটু চুপচাপ। পরক্ষণে নতুন উদ্যমে শুরু করল সে, 'ছলনার কথাটা বলার আগে আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে চাই।'

এতক্ষণে আমার গলায় স্বর ফুটল, 'দুঃসংবাদ!'

'হ্যাঁ। আপনি তো আজ কলকাতা থেকে আসছেন। কাজেই আপনার জানবার কথা নয়। দিন চারেক আগে বিজলী দেবীর ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে।'

আধফোটা সুরে বললাম, 'আমি জানি।'

রীতিমতো বিস্মিতই হল রতীশ, 'জানেন!'

'হ্যাঁ। বাংলাদেশ থেকে ফিরে প্রথমে আমি বিজলীর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম।'

এরপর অনেকক্ষণ স্তব্ধতা। অবশেষে রতীশই বলে উঠল, 'বিজলী দেবী অ্যারেস্টেড হয়েছেন। অথচ—'

'কী?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

দূরমনস্কের মতো রতীশ বলতে লাগল, 'মাসকয়েক আগে যখন কেসটার দায়িত্ব নিয়ে আসি তখন কে ভেবেছিল এমন একটা ভয়াবহ পরিণতি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের কেস!'

রতীশের অন্যমনস্কতা কেটে গেল। বলল, 'আপনাকে তো কিছুই বলা হয়নি। আচ্ছা গোড়া থেকেই শুনুন।' এরপর সে যা বলে গেল, সংক্ষেপে এইরকম। কে একটি বাঙালি মেয়ে আরব সাগরের কূলে এই শহরের মক্ষিরানী হয়ে বসে আছে। আন্তর্জাতিক স্মাগলিং-চক্রের সঙ্গে নাকি সে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে বোম্বাই পুলিশ কলকাতা পুলিশের কাছে সাহায্য চায়। সেই দায়িত্ব নিয়েই রতীশের এ-শহরে আসা।

বোম্বাইতে এসে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের ছদ্মবেশ সেই বাঙালি মেয়েটির, অর্থাৎ বিজলীর বাড়ির উলটো দিকে ওত পেতে বসল সে। এবং ধীরে ধীরে জানতে পারল. বিজলী নয়, এই স্মাগলিং-চক্রের যে আসল লোক সে একটি সিন্ধি। সমস্ত প্রাচ্যজোড়া তার জাল ছড়ানো। বিজলী তার হাতের একটি পুতুল মাত্র।

নির্ভুলভাবে কিছু কিছু আভাস পেলেও এমন কিছু প্রমাণ রতীশ সংগ্রহ করতে পারছিল না যাতে বিজলীসমেত সমস্ত দলটাকে ফাঁদে ফেলা যায়। শেষ পর্যন্ত সুযোগ এসে গিয়েছিল। চারদিন আগে স্মাগলিংয়েরই ব্যাপারে বিজলীর ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়। সেই খুনের সূত্রে বিজলী এবং আরও দু'টো লোক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বিজলীর ফ্ল্যাট সার্চ করে বাথরুমের সিলিঙের ভেতর তাল তাল আফিম আর কোকেন পাওয়া গিয়েছে। আপশোশের বিষয় বিজলী ধরা পড়লেও নাটের গুরুটিকে স্পর্শ করা যায়নি। পুলিশের

ধারণা, বোম্বাই থেকে সে উধাও হয়েছে। অথচ এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, খুনের সময় সে বিজলীর ফ্ল্যাটেই ছিল।

বিষণ্ণ, গভীর সুরে রতীশ বলতে লাগল, 'নিজের কাছে আমার সঙ্কোচের শেষ নেই ব্রাদার। একটি বাঙালি মেয়েকে এমন জঘন্য ব্যাপারে দেশে ছেড়ে এতদূরে এসে অ্যারেস্ট করতে হল! কী খারাপ যে লাগছে!'

রতীশের বিষাদ আমাকেও স্পর্শ করেছিল। আমি শুধু ভাবছিলাম, বিজলীর যা জীবন তাতে এমন একটা পরিণতিই তো প্রত্যাশিত। কিছুদিন ধরেই আমার স্নায়ুগুলো অস্পষ্টভাবে জানান দিচ্ছিল, কিছু একটা ঘটবে। ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক, নিদারুণ একটা কিছু। শেষ পর্যন্ত যা অনিবার্য তা-ই ঘটল।

তীব্র উত্তেজক জীবনের খরস্রোতে দুর্দম বেগে ভাসতে ভাসতে একদিন বোম্বাই এসেছিল বিজলী। আমার ধারণা মত্ততার চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছে উত্তেজনা ছাড়া একটা মুহূর্তও তার চলত না। আর সেই টানেই স্মাগলিংয়ের মধ্যে চলে এসেছিল। এবং তার যা স্বাভাবিক পরিণতি তা-ই ঘটেছে।

হঠাৎ কী মনে পড়তে রতীশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ভাল কথা, আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি—' বলতে বলতে পাশের একটা আলমারি খুলে একখানা ফোটো বার করে আনল। সেটা আমার হাতে দিতে দিতে বলল, 'দেখুন তো, এটা চিনতে পারেন কিনা?'

ফোটোটা হাতে নিয়েই চকিত হয়ে উঠলাম। এক যুগ পর মেরিন ড্রাইভের এক হোটেলের গেটে বিজলীকে যেদিন নতুন করে আবিষ্কার করি সেদিন একে দেখেছিলাম। বিজলী বলেছিল, এ নাকি তার নতুন ঈশ্বর। বললাম, 'একবার মাত্র একে দেখেছি।'

ফোটোটা ফিরিয়ে নিতে নিতে রতীশ বলল, 'ইনিই হলেন স্মাগলিং রিংয়ের মূলাধার।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একসময় রতীশই ফের আরম্ভ করল, 'আমি জানতাম ব্রাদার, বিজলী দেবী আপনাকে স্মাগলিং-এ জড়িয়ে ফেলেছিলেন। আপনাকে দিয়ে যে-সব মাল ডেলিভারি দিতে পাঠাতেন সেগুলো নিষিদ্ধ জিনিস। তবে এ-ও জানতাম, কিছু না জেনেশুনেই আপনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। যেদিন সব ব্যাপারটা বুঝবেন সেদিন বিজলী দেবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। আপনার সেই শুভ বুদ্ধির আশায় ছিলাম। নইলে পুলিশ আপনার সম্বন্ধে যা রিপোর্ট দিচ্ছিল তাতে যে কোনও সময় আপনাকে অ্যারেস্ট করা চলত। কিন্তু আমার বিশ্বাস, না জেনে কেউ অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করা চলে।'

বিজলীর ফ্ল্যাটের দিকে যখনই যেতাম তখন কেন যে রতীশ আমার পথ আগলাত, কোথাও বিজলীর মাল ডেলিভারি দিতে গেলে কেন তাকে দেখা যেত, পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে একদিন ঝগড়া করে কেন আমাকে উদ্ধার করে সে এনেছিল, এ-সবের সঙ্গত অর্থ এই মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে হল, ইচ্ছা করেই ইগটপুরী স্টেশন থেকে

আমাকে অ্যারেস্ট করিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল সে। তার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। আমি যেন সতর্ক হই।

এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারলাম না। স্বরটা রুদ্ধ হয়ে এল যেন। ঝাপসা, কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রতীশের দিকে তাকিয়ে রইলাম শুধু।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর রতীশ ডেকে উঠল, 'ব্রাদার—'

সাড়া দিলাম।

'বিজলী দেবীর সঙ্গে একবার দেখা করবেন? উনি পুলিশ হাজতে আছেন।'

আমার মনে শঙ্কার ছায়া পড়ল। বিজলীর সংস্পর্শে গেলে যদি বিপদে পড়ি?

আমার মনোভাবটা আঁচ করতে পারল রতীশ। বলল, 'ভয় নেই। এ-সময় চেনাশোনা কাউকে দেখলে বিজলী দেবী ভরসা পাবেন।'

অভয় পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। বললাম, 'আপনি যখন বলছেন দেখা করব।'

রতীশের সঙ্গে পুলিশ হাজতে এলাম। আসাই সার। বিজলী আমার সঙ্গে কথা বলল না। এমন কি তাকাল না পর্যন্ত। মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। হাজার ডাকাডাকি করেও আমার দিকে তাকে ফেরাতে পারলাম না।

এরপরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

আইন-আদালত-জেরা-উকিল-সাক্ষী, সব মিলিয়ে নিদারুণ হুলস্থূল ব্যাপার।

আশ্চর্য! বিজলী স্বপক্ষে কোনও উকিল লাগাল না। এমনকি জামিনের ব্যবস্থা করে হাজতের বাইরেও এল না। প্রতিদিন তাকে গিয়ে বোঝাই। বলি, 'ভাল উকিল দিলে নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে। ব্যবস্থা করব?'

বিজলী নিশ্চুপ। একটি কথাও বলে না সে।

আমার সঙ্গেই শুধু না, কারও সঙ্গেই কথা বলে না বিজলী। কোনওদিন খায়, কোনওদিন খায় না। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে সে।

বিচারটা প্রায় একতরফাই হল। সরকারি উকিলের জেরার উত্তরে একটি কথাও বলল না সে। ভাবলেশহীন, উদাস দৃষ্টিতে আদালতের জানালা দিয়ে বাইরের দূর বিস্তৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

রোজই তাকে জেল হাজতে দেখতে যাই। যেদিন কেসের তারিখ পড়ে সেদিন যাই কোর্টে।

অবশেষে বিচার শেষ হল। গম্ভীর স্বরে জজ রায় দিলেন, স্মাগলিং এবং হত্যার ব্যাপারে সহায়তার জন্য সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে বিজলীর। অ্যারেস্ট হওয়ার পর থেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিজলী। রায় বেরোবার পর উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাতের ইশারায় আমাকে ডাকল।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বিজলী। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললাম, 'এ তো লোয়ার কোর্টের রায়। হাইকোর্টে আপিল করবে? আমার মনে হয়—'

কথাটা শেষ হল না। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বিজলী, 'আপিল-টাপিলের জন্যে তোমাকে ডাকিনি।'

'তবে?'

এবার গলার স্বরটাকে অতল খাদে নামিয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল বিজলী, 'আমার তো সবই গেল ললিতদা। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। শুধু একবার—একবার শুধু—'

'শুধু কী?'

'একজনকে দেখতে ইচ্ছা করে।'

'বল, কাকে দেখতে চাও।'

'যে আমাকে প্রথম এই সাংঘাতিক জীবনের মন্ত্র দিয়েছিল। সে এখন কোথায়, জানি না। যদি তাকে একবার পাই জিজ্ঞেস করে দেখব, কেন সে আমাকে এর মধ্যে টেনে এনেছিল? মানুষ আর ক'বছরই বা বাঁচে! আমার একটা জীবন শুশুরিয়ার মধ্যেই তো স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারত। কেন—কেন—'

বললাম, 'ধীরেশকে দেখতে চাও?'

বিজলী বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাকে আসার জন্যে চিঠি লিখব?'

'সে কোথায় আছে জানো?' বিজলী চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'জানি। এবার কলকাতায় গিয়ে তার খোঁজ পেয়েছি। তাকে দেখেও এসেছি।'

'আমাকে সে-কথা বলনি কেন?'

'বলবার সুযোগ তুমি দিলে কখন? বাংলাদেশ থেকে ফিরে দেখলাম তুমি হাজতে। যতবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি ততবারই মুখ ফিরিয়ে থেকেছ। একটা কথাও বলনি।'

আমার গলায় ক্ষোভের আভাস ছিল। বিজলী লক্ষ করল না। আপন মনে বলল, 'ধীরেশ এখন কোথায়?'

ধীরেশকে কোথায় কীভাবে দেখেছি বললাম।

শুনতে শুনতে বিজলীর চোখেমুখে বিচিত্র আলোছায়ার খেলা শুরু হল। দাঁতে দাঁত চেপে রুদ্ধশ্বাসে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। গলার কাছটা কাঁপছে। শুধু গলার কাছটাই নাকি, অসহ্য কাঁপুনির বেগ বুকের কোনও অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে উঠে এসে তার শরীরময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বুঝতে পারছি, তার মধ্যে নিদারুণ বিপর্যয় চলছে।

অনেকক্ষণ পর একটু সামলে নিয়ে বিজলী ফিসফিস করে উঠল, 'তাকে একবার আসতে লিখবে ললিতদা?'

ঝাপসা গলায় বললাম, 'নিশ্চয়ই লিখব।'

সৌম্যানন্দকে সেদিনই চিঠি দিলাম। সপ্তাখানেক পর উত্তর এল। তিনি লিখেছেন ঃ

'সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পেয়ে বিস্তারিত জানতে পারলাম। এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমি যাব। সাত বছর পর যখন বিজলীর চারদিক জুড়ে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াব। তার আগে নয়।

একদিন একটু শান্তির জন্য ভোগের ঈশ্বরকে ছেড়ে সর্বত্যাগের ঈশ্বরের সন্ধানে জলপাইগুড়ির এই মঠে এসেছিলাম। কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি পাইনি। ঈশ্বর আর আমার মাঝখানে বিজলী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে সরিয়ে যে এগোব, সাধ্য কি। সন্ন্যাসেও নয়, ভোগেও নয়, জীবনের এক মেরু থেকে বিপরীত মেরুতে যাবার পথে বিষুবরেখায় দাঁড়িয়ে আছি।

বিজলীকে বলবেন, একদিন তাকে আমি প্রলুব্ধ করেছিলাম। আমি পাপী নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রলোভনে পা দিয়ে সে কম দোষ করেনি। বিজলী ধর্মভ্রষ্ট। নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে সে যেখানে পৌঁছেছে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। সাত বছর প্রায়শ্চিত্তের পর আমার যাবার সময় হবে। অন্তরের সেই রকমই নির্দেশ।

ইতি—সৌম্যানন্দ।'

সৌম্যানন্দের চিঠি পাবার মাসখানেক পর বোম্বাইয়ের ক্ষণিক স্বর্গে আমার থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। তিন বছরের জন্য এখানে এসেছিলাম। সেটা পূর্ণ হতে আর দু'টো দিন মাত্র বাকি। তারপরেই রাজস্থানে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পুনশ্চ

সাত সাতটা বছর। অর্থাৎ একটি যুগের অর্ধেকেরও বেশি।

এই দীর্ঘ সময় রাজস্থানের পাতালে বসে একটি একটি করে মুহূর্তে গুনে গিয়েছি। অবশেষে সেই দিনটি এগিয়ে এসেছে। বিজলীর মুক্তির দিন।

রাজস্থানের খনিতে চলে গেলেও সুধাংশুদের সঙ্গে চিঠিপত্রে আমার যোগাযোগটা অব্যাহত রয়েছে। তাদের বলে এসেছিলাম, সময় পেলেই জেলখানায় গিয়ে যেন বিজলীর সঙ্গে দেখা করে। আমার প্রতিনিধি হিসেবে তারা দেখা করত এবং বিজলীর প্রত্যহের দিনযাপন কীভাবে চলছে তার খুঁটিনাটি বিবরণ আমাকে লিখে পাঠাত।

সুধাংশুদের চিঠিতেই জানতে পেরেছিলাম, প্রথম দিকে বছর পাঁচেক বোম্বাই সেন্ট্রাল জেলে ছিল বিজলী। শেষ দু'বছর তাকে রত্নগিরি ডিস্ট্রিক্ট জেলে নিয়ে রাখা হয়েছে। সুধাংশুরাই খোঁজখবর নিয়ে জানিয়েছে, কবে কোন তারিখে বিজলী মুক্তি পাবে।

আজ বিজলীর মুক্তির দিন।

রাজস্থানের খনি থেকে দিনতিনেক আগে ছুটি নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। ট্রেনে দু'রাত কাটিয়ে প্রথমে এসেছি কোলাপুরে। সেখান থেকে বাসে উঠে অবশেষে আজ রত্নগিরি ডিস্ট্রিক্ট জেলের সামনে এসে নেমেছি।

ঠিক সামনে নয়। বাস রাস্তা থেকে জেলখানাটা বেশ খানিকটা দূরে। আরেকটা সরু পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয়।

জেলখানা বসাবার জন্য যে এ-জায়গাটা নির্বাচন করেছিল, মনে মনে তাকে তারিফ না করে উপায় নেই। চারপাশ জনশূন্য। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, মহারাষ্ট্রের প্রান্তরগুলো টিলার টিলায় তরঙ্গিত হয়ে আছে। দূরে আকাশটা যেখানে ধনুরেখায় নেমে গিয়েছে সেখানে মোষের পিঠের মতো সারি সারি ধূসর পাহাড়। এরই পটভূমিতে পুরনো আমলের সুবিশাল দুর্গের মতো রত্নগিরি জেলটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনের দিকে তার প্রকাণ্ড লোহার ফটক।

সময়টা পৌষের শেষাশেষি। নিয়ম অনুযায়ী শীতকাল। পৌষের বাতাস প্রান্তরের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

এখন কত আর বেলা! সবেমাত্র দুপুর শেষ হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে রোদ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। মাটির তলা থেকে ধোঁয়ার আকারে হিম উঠে আসছে।

চারদিকের পরিবেশ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে জেল গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আর যেতে যেতে কিছুটা উৎকণ্ঠাও বোধ করছিলাম। যদি সকালের দিকে বিজলী মুক্তি পেয়ে থাকে? তা হলে দেখা পাবার সম্ভাবনা আছে কি?

বিজলী যদি এর মধ্যেই চলে গিয়ে থাকে, এখান থেকে কোথায় গিয়েছে সে? কে তাকে আশ্রয় দেবে? আচমকা আমার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে দুরন্ত এক চমক খেলে গেল। আমি কি তবে বিজলীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই ছুটে এসেছি? একটি একটি করে এতকাল ধরে যে তার মুক্তির দিন গুনেছি সে কি এই কারণেই? সজ্ঞানে এ-সব কথা কোনওদিন ভাবিনি, কিন্তু অবচেতনের কোথাও এই আকাঙ্ক্ষাটাই বোধ হয় ছিল।

এতক্ষণ দ্রুত পা চালিয়ে আসছিলাম। প্রাণের অতল থেকে আকাঙ্ক্ষার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই চলার গতি শ্লথ হয়ে এল।

একসময় জেলখানাটার কাছাকাছি চলে এলাম। হঠাৎ গম্ভীর ধাতব শব্দে লোহার ফটকটা খুলে গেল। চমকে তাকিয়ে দেখলাম ভেতর থেকে পিঞ্জরের পাখিটি বেরিয়ে আসছে।

পিঞ্জরের পাখি—বিজলী।

আমি চকিত হয়ে উঠলাম। এ কোন বিজলীকে দেখছি! বোম্বাই আসার পর তাকে দেখেছি যেন এক চোখধাঁধানো মোহিনী। কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপের মতো রমণীটি কে? শরীরের সেই দীপ্ত বর্ণ পুড়ে পুড়ে পাঁশুটে হয়ে গিয়েছে। চোখদু'টি কুয়োর গভীরে লীন। মাথার চুল বহুকাল তেলবর্জিত, জট পাকানো। এই দেহ অনেকদিন আগের রূপ, যৌবন আর অহঙ্কারের শ্মশান মাত্র।

যেমনই হোক, এর জন্যই তো রাজস্থানের পাতাল থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি। আমি আসার আগেই যে সে মুক্তি পায়নি সে জন্য অদ্ভুত এক শিহরন খেলে গেল আমার শরীরে। অনুভব করলাম, প্রৌঢ়ত্বের সীমা উত্তীর্ণ-হওয়া এই বয়সেও অসহ্য আবেগে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

একবার ভাবলাম, ছুটে যাই। ছুটেই যেতাম। কিন্তু তার আগেই ডানপাশের বিরাট পাকুড় গাছটার তলা থেকে দীর্ঘদেহ এক সন্ন্যাসী বিজলীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসী যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, লক্ষ করিনি। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজলীর ওপর নিবদ্ধ। সন্ন্যাসীকে দেখে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি জানি, উনি কে। জলপাইগুড়ির এক মঠে বসে আমারই মতো এই দিনটির জন্যই কি উন্মুখ হয়ে ছিলেন সৌম্যানন্দ?

যাই হোক, বিজলীকে এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। সৌম্যানন্দের দীর্ঘ শরীর তাকে ঘিরে রেখেছে। বুকের মধ্যে হঠাৎ অপরিসীম এক শূন্যতা অনুভব করলাম আর সেই শূন্যতার মধ্যে এটুকু অন্তত বুঝলাম, এবার থেকে সৌম্যানন্দই তাঁর বিপুল বাহু দিয়ে বিজলীর জীবনের সকল দিগন্তকে ঘিরে রাখবেন।

বিজলী বা সৌম্যানন্দ—কারও মুখই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে ওরা কী করছে, আমি জানি। নিঃস্ব, জরাগ্রস্ত রমণীটির দু'চোখে নিশ্চয়ই এখন প্লাবন নেমেছে।